ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

IF Journal

৬২ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা • জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ • মোহাররম-জমাঃ সানি ১৪৪৫ • শ্রাবণ-পৌষ ১৪৩০

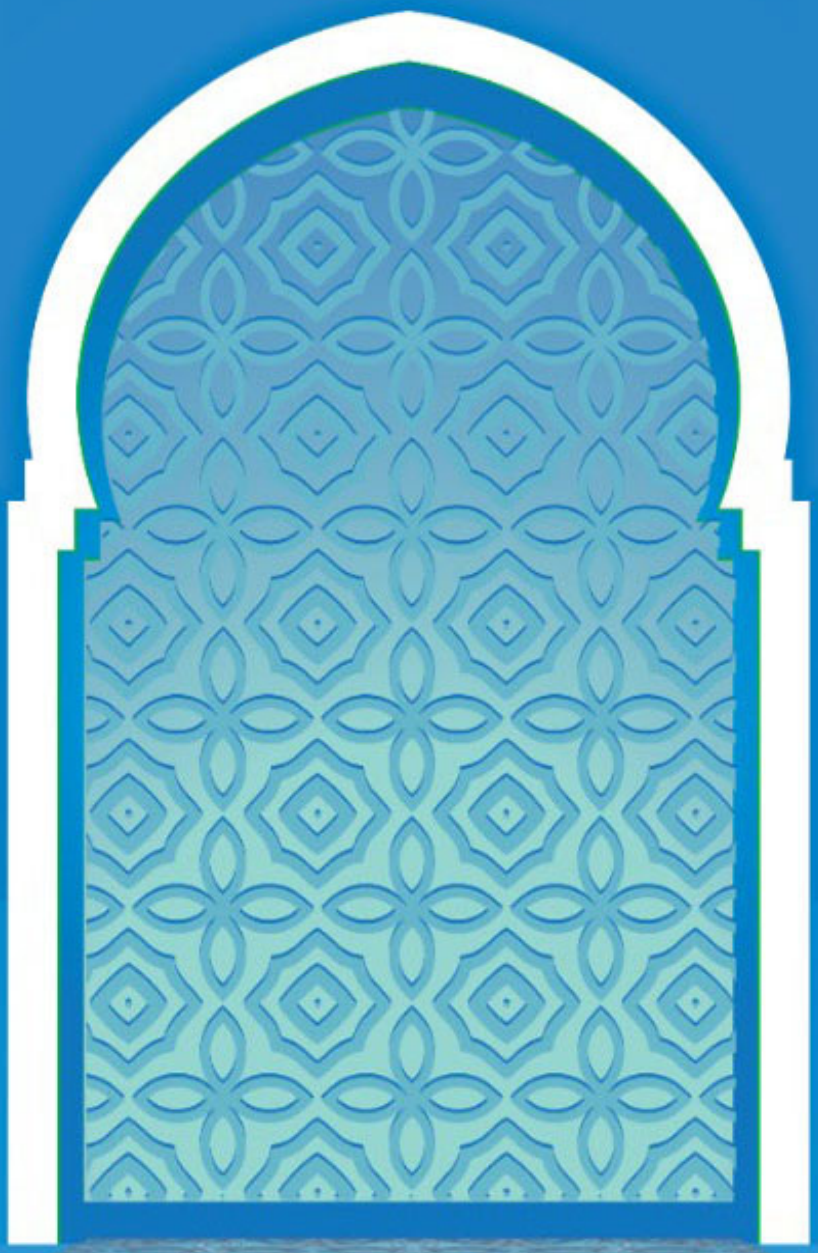

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

রেজিঃ নং - ডিএ ২০/৭৬
ISSN : 2958-5341
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩
মুহাররম - জমাদিউস সানি - ১৪৪৫
শ্রাবণ - পৌষ ১৪২৯-১৪৩০

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	ড. মহাঃ বশিরুল আলম মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ইসলামিক ফাউন্ডেশন
নির্বাহী সম্পাদক	ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
সম্পাদকমণ্ডলী	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ উপাচার্য, ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল কাদির আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. মো: মমিন উদ্দিন অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় জনাব মো: আবদুল্লাহ আল মাসুদ, পরিচালক, পরিকল্পনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ড. ওয়ালীয়ুর রহমান খান মুহাদ্দিস, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী মুফাসসির, হালাল সনদ বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
সম্পাদনা সহযোগী	মুহাম্মদ মজিব উল্লাহ ফরহাদ উপ-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন মোঃ সাইফুল ইসলাম খান গবেষণা সহকারী, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
অনলাইন সহায়তা	আইসিটি বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

গবেষণা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

THE ISLAMIC FOUNDATION JOURNAL

[A Quarterly Research Journal of Islamic Foundation]

Regd. No. DA 20/76
ISSN : 2958-5341
Year 62, Issue-3-4
July -December 2023

Editorial Board

Editor in Chief	Dr. Md. Bashirul Alam Director General (Additional Secretary) Islamic Foundation
Executive Editor	Dr. Mohammad Harunur Rashid Director, Research Department, Islamic Foundation
Editors	Prof. Dr. Muhammad Abdur Rashid Vice-chancellor, Islamic Arabic University Dr. Muhammad Abdul Kadir Professor, Arabic Department, Dhaka University Dr. MD Momin Uddin Professor, English Department, Jagannath University Md. Abdullah al Masud Director, Planing Department, Islamic Foundation Dr. Waliur Rahman Khan Muhaddis, Research Department. Islamic Foundation Dr. Abu Saleh Patwary Mufassir, Research Department. Islamic Foundation
Editorial Associates	Muhammad Mojib Ullah Farhad Deputy Director, Research Department. Islamic Foundation Md. Saiful Islam Khan Research Assistant, Research Department. Islamic Foundation
Online Support	ICT Department, Islamic Foundation

Published by Department of Research.
Printed by Islamic Foundation Press.
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh.
E-mail : ifapatrika@gmail.com
Website : www.Islamicfoundation.gov.bd

Price : Tk. 50.00
U. S. Dollar : 1

প্রচ্ছদ
মাহবুব আহমেদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
জসিম উদ্দিন
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

যোগাযোগ
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২-২২২২১৮২৬৩

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

সূচিপত্র

- আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের সু-সংবাদ : একটি পর্যালোচনা/৭
  মাসরূরুল হাসান
- সাহাবাদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আকীদা/৩২
  ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান
- ইসলামি ঐক্যদর্শন ও মুসলিম উম্মাহ : পর্যালোচনা/৬৩
  ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচার ও আর্থিক সহায়তাদান/৮২
  ড. আ. ম. কাজী হারুন উর রশীদ
- প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শারীরিক সুস্থতা ও চিকিৎসার অধিকার : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি/১০৫
  ড. মোঃ নজরুল ইসলাম
  ফারজানা আক্তার ডালিয়া
- ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা/১২৪
  ড. মুহাম্মদ রেজাউল করীম
  মাহমুদুল হাসান
- আধুনিক বাংলা কাব্যে রাসূল (সা) প্রশস্তি : একটি পর্যালোচনা/১৬৬
  ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান
- মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা/১৮২
  ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা
  জহিরুল ইসলাম
- ঐতিহ্যবাহী বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গা: ইতিহাস ঐতিহ্য ও ভূমিকা/২০০
  মোঃ আরিফুল ইসলাম
- The Perspective of Islam concerning Violence and Terrorism/২২০
  Mohammad Zafar Ullah
  Mohammad Moniruzzaman
- دور اللغة العربية في فهم الشريعة الإسلامية/২৩৬
  د. عبد الله المعروف محمد شاه عالم
- الإسلام سبيل الحضارة المثلى والمجتمع الأفضل/২৫০
  الدكتور محمد خيرالإسلام
  تنوير حسين

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা জার্নাল
গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের নিয়মাবলী

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং ডিএ ২০/৭৬) 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা জার্নাল' (Islamic Foundation Research Journal) একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল। জার্নালটি প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হয় এবং দেশের অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে গবেষণা জার্নাল হিসেবে স্বীকৃত। গবেষণা জার্নালটির ISSN নং-২৯৫৮-৫৩৪১।

১.০. জার্নালে প্রকাশিতব্য গবেষণার বিষয়সমূহ :
এ জার্নালে ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা কুরআন, হাদীস, ফিকহ, সীরাত, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিকহী পর্যালোচনামূলক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

২.০. গবেষণা প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি :

২.১. গবেষণা প্রবন্ধটি বাংলা, ইংরেজি অথবা আরবী ভাষায় লেখা হতে হবে। প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে।

৩.০. গবেষণা প্রবন্ধ রচনায় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

৩.১. অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Orginal Research) হতে হবে। গবেষণাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনে অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে।

৩.২. গবেষণাকর্মে অবশ্যই মৌলিকত্ব থাকতে হবে। গবেষণার ক্ষেত্রে পুরনো বিষয়াবলির চর্বিত চর্বন গ্রহণযোগ্য নয়। গবেষণার সুস্পষ্ট ফলাফল থাকতে হবে।

৩.৪. যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণ কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কার অবদান কতটুকু তার বিবরণ এবং এ সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৩.৫. গবেষণা প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) এর মধ্যে হতে হবে। লেখা বাংলার ক্ষেত্রে কী-কোর্ড এর Sutonny MJ ইংরেজির ক্ষেত্রে Times New Roman এর ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪.০. গবেষণা প্রবন্ধের কাঠামো

৪.১. শিরোনাম:

৪.২. লেখকের নাম:

৪.৩. সারসংক্ষেপ : প্রবন্ধের শুরুতে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে। সারাংস বাংলা ও ইংরেজি অথবা ইংরেজি ও আরবী ভাষায় (আরবী ভাষার প্রবন্ধের ক্ষেত্রে) হতে হবে। এতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী থাকবে।

৪.৪. মূলশব্দ : সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে।

৪.৫. ভূমিকা : প্রবন্ধের ভূমিকায় বিষয়ের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রবন্ধ রচনার যৌক্তিকতা সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে। **এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কারা কী কাজ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।**

৪.৬. গবেষণা পদ্ধতি : গবেষণা পদ্ধতি বর্ণনা, বিশ্লেষণ বা জরিপ/পরিসংখ্যান।

৪.৭. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণ : গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি গবেষণা প্রবন্ধের এই অংশে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সাথে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক লেখকের নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলন থাকতে হবে। তবে বিষয়ের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিক বিষয়ের বাইরে কোন মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪.৮. উপসংহার : গবেষণাটি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সম্ভাব্য ভূমিকা ও গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তুলে ধরতে হবে।

৪.৯. তথ্যপঞ্জী।

৫.০. উদ্ধৃতি উপস্থাপন :
গবেষণায় উদ্ধৃতি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ আবশ্যিক :

৫.১. হুবহু/প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের কম হলে চলমান লাইনে উভয় পাশে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে এবং ৩০ শব্দের বেশি হলে মূল লেখা থেকে এক স্পেস নিচে ভিন্ন প্যারায় দুই পাশে অতিরিক্ত মার্জিন রেখে উল্লেখ করতে হবে। কোন সূত্র থেকে একই স্থানে অর্ধ পৃষ্ঠার অধিক হুবহু উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। উদ্ধৃতি উপস্থাপনের

ক্ষেত্রে বাক্যের মধ্যকার এক বা একাধিক শব্দ বা কিছু অংশ উহ্য রাখার প্রয়োজন হলে পরপর অনধিক তিনটি বিন্দু (...) উল্লেখ করতে হবে।

৫.২. ইনটেক্সট উদ্ধৃতি : ইনটেক্সট বা টেক্সটের মধ্যে উদ্ধৃতি প্রদানের স্থানে বন্ধনীর মধ্যে গ্রন্থকার/ প্রবন্ধকারের নামের শেষাংশ ও সূত্রের প্রকাশকাল এবং পৃষ্ঠা নং ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ/গ্রন্থসূত্রের পূর্ণ বিবরণ টেক্সট বা পাদটিকায় উল্লেখ করা হবে না, বরং প্রবন্ধের শেষে তথ্যসূত্র/গ্রন্থপঞ্জি অংশে উল্লেখ করতে হবে।

৫.৩. তথ্যসূত্র/গ্রন্থপঞ্জি : প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যেসব গ্রন্থ বা সূত্র থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে প্রবন্ধের শেষে তার একটি তালিকা প্রদান করতে হবে। সর্বজন বিদিত (Well known) বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র উল্লেখ করে অযথা কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন।

৫.৪. উদাহরণ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নালে বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপনের উদাহরণ নিম্নরূপ:

১. **আল-কুরআন থেকে:** আল-কুরআন, সূরার ক্রমিক নং: আয়াত নং; যেমন: (আল কুরআন: ২:১-৫)

২. **হাদীস থেকে:** ইন টেক্সট উদ্ধৃতি (ইমামের নামের শেষাংশ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থ প্রকাশের সাল, হাদীস নং) যেমন: (আল-বুখারী, আস সহীহ ২০০৪, ১১০)

গ্রন্থপঞ্জি: ইমামের নামের শেষাংশ, নামের বাকি অংশ, প্রকাশকাল, বাঁকা অক্ষরে গ্রন্থের শিরোনাম, প্রকাশের স্থান: প্রকাশনা সংস্থা, যেমনা: *Al-Bukhari, Abu Abdullah Ibn Ismail. 2004. al-jami al-sahih. Beirut : Dar al kutub al-iiimaizzah.*

৩. **মৌলিক গ্রন্থ থেকে:** ইনটেক্সট উদ্ধৃতি: (গ্রন্থকারের নামে শেষাংশ গ্রন্থ প্রকাশের সাল, পৃষ্ঠা নং) যেমন: (Mansur 2004, 110)

গ্রন্থপঞ্জি: গ্রন্থকারের নামের শেষাংশ, নামের বাকি অংশ, বাঁকা অক্ষরে গ্রন্থের শিরোনাম, প্রকাশের স্থান: প্রকাশনা সংস্থা, যেমন: *Mansur, Mohammad Ali. 2010, Bichar Bivager Sadhinatar Itihas. Dhaka : Bangladesh Islamic Law Research Centre.*

৪. **অনূদিত গ্রন্থ থেকে:** ইনটেক্সট উদ্ধৃতি: (গ্রন্থকারের নামের শেষাংশ গ্রন্থ প্রকাশের সাল, পৃষ্ঠা নং) যেমন: *Palanpuri, Sazed Ahmad. 2009, Shariah Bishoze Siddanta daner Nitimala. Translated bz Mufti Md. Abdullah. Dhaka : Islamic Foundation.*

৫. **জার্নাল থেকে:** ইনটেক্সট উদ্ধৃতি: (প্রবন্ধকারের নামের শেষাংশ জার্নাল প্রকাশের সাল, পৃষ্ঠা নং) যেমন: (Jahangir, 2006, 55)

গ্রন্থপঞ্জি: প্রবন্ধকারের নামের শেষাংশ, নামের বাকি অংশ, প্রকাশকাল, "উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে প্রবন্ধের নাম" বাঁকা অক্ষরে জার্নালের শিরোনাম ভলিউম/বর্ষ: ইস্যু/সংখ্যা, পৃষ্ঠা থেকে-পৃষ্ঠা পর্যন্ত, যেমন : *Jahangir, Khondakar Abdullah. 2006. "Islamer Itihase Ugroponthi Dol Abong Tader Somporke Sahabade Kiramer Dristivongi' Islami Ain o Bichar 02 : 08, 09 : 36.*

৬. **দৈনিক পত্রিকা থেকে:**

৭. **ইনক্সেট উদ্ধৃতি:**

ক. নিবন্ধের ক্ষেত্রে : (নিবন্ধকারের নামের শেষাংশ পত্রিকা প্রকাশের সাল, পৃষ্ঠা নং) যেমন: (Qazzum 2015, 16)

খ. রিপোর্ট ও তথ্যের ক্ষেত্রে: (বাঁকা অক্ষরে পত্রিকার নাম, তারিখ) যেমন: New Nation, Oct. 12 2016

৮. **গ্রন্থপঞ্জি:**

ক. নিবন্ধকারের নামের শেষাংশ, নামের বাকি অংশ, প্রকাশকাল, "উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে প্রবন্ধের নাম" বাঁকা অক্ষরে পত্রিকার নাম, তারিখ যেমন: *Qazzum, Hassan Abdul. 2015. "Furfura Sharifer Pir Mujaddide Zaman Abu Bakr Siddique" Ittefaq, March 27.*

খ. বাঁকা অক্ষরে পত্রিকার নাম, তারিখসমূহ যেমন: *New Nation, Oct. 12 2016; Nov. 11, 2015; Jan. 05, 2013.*

গ. অনলাইন থেকে তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত তথ্যের সাথে তথ্য সংগ্রহের মাস তারিখ, বছর, ওয়েব ঠিকানা, যেমন: *Qazzum, Hassan Abdul. 2015. "Furfura Sharifer Pir Mujaddide Zaman Abu Bakr Siddique" Ittefaq, March 27. Accessed Feb. 18 2016. http://epaper. ittefaq. com.bd/ ?archiev=zes&arch_date=27-03-2015#*

৯. অসম্পূর্ণ তথ্য :

গ্রন্থকারের নামবিহীন : ইনটেক্সট ও গ্রন্থপঞ্জিতে গ্রন্থকারের নামের স্থানে N.A লিখতে হবে। যেমন: (ঘ.অ.২০১০,১১১)

প্রকাশের সালবিহীন : ইনটেক্সট ও গ্রন্থপঞ্জিতে সালের স্থানে ঘ.উ. লিখতে হবে। যেমন: (Parnkil N.D.22)

পৃষ্ঠা নং না থাকলে : ইনটেক্সটে পৃষ্ঠা নং এর স্থানে ঘ.চ লিখতে হবে। যেমন: (Rassel. 2001.N.P)

প্রকাশের স্থানবিহীন : গ্রন্থপঞ্জিতে প্রকাশের শহরের স্থানে N.P লিখতে হবে। যেমন :...(N.P : Bookstore.)

প্রকাশক বিহীন : গ্রন্থপঞ্জিতে প্রকাশকের স্থানে লিখতে হবে। যেমন: ...(Damascus : N.R.)

৬.০. অনুবাদ নীতিমালা : কুরআন ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলিত রীতিতে রূপান্তর করতে হবে। ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল ঞঊঢঞ সহ বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

৭.০. প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া : প্রবন্ধ কম্পিউটার কম্পোজ করে ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নালের নিজস্ব ই-মেইল: ifapatrika@gmail.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে।

ই-মেইলে প্রবন্ধ প্রেরণের ক্ষেত্রে লেখক/লেখকদেরকে এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:

ক. জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তারা;

খ. প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি;

গ. এ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর সম্পাদকের মতামত ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হবে না;

ঘ. প্রবন্ধে প্রকাশিত/বিবৃত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষকগণ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এর কোনো প্রকার দায় দায়িত্ব বহন করবেন না।

৮.০. প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:

৮.১. জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দুজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ (Review) করানো হয়।

৮.২. রিভিউয়ের জন্য প্রেরণের সময় প্রবন্ধকারের নাম পরিচয় ও রিভিউয়ারগণের পরিচিতি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয় (Double Blind Review)

৮.৩. রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

৯.০. অন্যান্য জ্ঞাতব্য:

৯.১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংস্থা। কাজেই গবেষণা প্রবন্ধে ইসলামের উদারনীতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন থাকতে হবে।

৯.২. গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/লেখকগণ জার্নালের ২ (দুই) কপি সৌজন্য পাবেন।

৯.৩. প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে গৃহীত হওয়ার পর সম্পাদক ও রিভিউয়ার যদি তাতে কোনরূপ সংশোধন বা পরিমার্জনের পরামর্শ দেন তাহলে সেই নির্দেশনা অনুযায়ী লেখককে প্রবন্ধটি প্রকাশযোগ্যভাবে সংশোধন করে দিতে হবে। নতুবা সেই প্রবন্ধ প্রকাশ করা হবে না।

৯.৪. জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিরাইট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রবন্ধের লেখক তা প্রকাশিত প্রবন্ধ অন্য কোথাও প্রকাশ করতে চাইলে সম্পাদক-এর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

৯.৫. সম্পাদনা পরিষদ প্রবন্ধে যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার অধিকার রাখেন।

৯.৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশ বা বাতিলের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করেন।

৯.৭. এ সম্পর্কে কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে www.Islamicfoundation.gov.bd সাইটে/মেইলে ifapatrika@gmail.com কিংবা ০২-২২২২১৮২৬৩/ ০১৫৫০-৬৮৭০১৮ হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৬২ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা ❑ জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ ❑ মোহাররম-জমাঃ সানি ১৪৪৫ ❑ শ্রাবণ- পৌষ ১৪৩০

সূচিপত্র

- আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের সু-সংবাদ : একটি পর্যালোচনা/৭
  মাসরুরুল হাসান
- সাহাবাদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আকীদা/৩২
  ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান
- ইসলামি ঐক্যদর্শন ও মুসলিম উম্মাহ : পর্যালোচনা/৬৩
  ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচার ও আর্থিক সহায়তাদান/৮২
  ড. আ. ম. কাজী হারুন উর রশীদ
- প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শারীরিক সুস্থতা ও চিকিৎসার অধিকার : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি/১০৫
  ড. মোঃ নজরুল ইসলাম
  ফারজানা আক্তার ডালিয়া
- ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা/১২৪
  ড. মুহাম্মদ রেজাউল করীম
  মাহমুদুল হাসান
- আধুনিক বাংলা কাব্যে রাসূল (সা) প্রশস্তি : একটি পর্যালোচনা/১৬৬
  ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান
- মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা/১৮২
  ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা
  জহিরুল ইসলাম
- ঐতিহ্যবাহী বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গা: ইতিহাস ঐতিহ্য ও ভূমিকা/২০০
  মোঃ আরিফুল ইসলাম
- The Perspective of Islam concerning Violence and Terrorism/২২০
  Mohammad Zafar Ullah
  Mohammad Moniruzzaman
- دور اللغة العربية في فهم الشريعة الإسلامية/২৩৬
  د. عبد الله المعروف محمد شاه عالم
- الإسلام سبيل الحضارة المثلى والمجتمع الأفضل/২৫০
  الدكتور محمد خيرالإسلام
  تنوير حسين

গবেষণা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের সু-সংবাদ : একটি পর্যালোচনা

মাসরূরুল হাসান*

[Abstract : Holy Prophet Muhammad (sm), the unique leader of the prophet was the best human being on earth. Allah intended it earlier that He would send, after all the prophets, the last and the greatest Prophet Muhammad (sm) to guide the people of the world of the last age. He hinted at the arrival of Prophet Muhammad (sm) in all the divine scriptures revealed before the Qur'an. Muslim biographers quoted lots of predictions regarding the arrival of Muhammad (sm) from Taurat and Injil. The amendments made to the Taurat and Injil following the era of Prophet Musa (am), Prophet 'Isa (am) are detailed in the holy Qur'an and Ḥadith. Countless distortions have been made to these scriptures since dawn of Islam till date. That is why; the latest versions of these two scriptures are not reliable. I have discussed important from the Holy Quran, Hadith and Sitat on this matter.]

ভূমিকা : ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে বলেন, যার সম্পর্কে পূর্বের নবী-রাসূলগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেনি, সে ব্যক্তি কিভাবে নবী বলে স্বীকৃতি পাবে? কিন্তু যখন একথা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং আগন্তুক নবীর নিদর্শন ও গুণাবলি সবকিছুই তাঁর মাঝে বিদ্যমান। তখনই ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা ছলচাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞ তারাই মুহাম্মদ (সা)-এর নুবুওয়াতকে পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণীর মাপকাঠিতেই যাচাই করে দ্বিধাহীনচিত্তে সত্যতার স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক প্রকাশ্য দরবারে পবিত্র ইসলামকে বরণ করে নিয়েছেন। তবে যারা দুর্বলতাবশত ইসলামকে বরণ করে নিতে পারেনি তারাও তাঁর নুবুওয়াত এবং পবিত্র ইসলামের সত্যতার স্বীকৃতি প্রদান করেছে। নিম্নে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের ভবিষ্যদ্বাণী তথা আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের যে সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে তা পর্যালোচনা করা হলো–

পবিত্র কুর'আনের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা যেসকল ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, প্রত্যেক গ্রন্থেই মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ "এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা) অর্থাৎ তাঁর বর্ণনা পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে।"[১]

প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের সময়ে পৃথিবীতে হিন্দু, পার্সী (অগ্নি উপাসনা ধর্ম), বৌদ্ধ, ইয়াহূদী এবং খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্ম প্রচলিত ছিলো। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ-পুরাণে', পার্সীদের ধর্মগ্রন্থ 'যিন্দাবেস্তা'য় এবং বৌদ্ধদের

* এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আল-কুর'আন, ২৬:১৯৬

প্রামাণিক গ্রন্থ 'দিঘানিকায়া'য়ও মুহাম্মদ (সা)-এর গুণগান এবং তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত আছে। এতে মনে হয়–যেনো কোনো একদিন এ ধর্মগুলোও আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ছিলো। সুতরাং অনেক আধুনিক লেখকই তাদের রচিত গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত শ্লোকগুলো উল্লিখিত গ্রন্থত্রয় থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু গ্রন্থত্রয় যেহেতু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণের প্রমাণিত কোনো দলীল নেই। তাই এগুলো থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণগান এবং তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করা বোকামি বৈ কিছুই নয়।

ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ '*তাওরাত*' এবং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ '*ইনজীল*' আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তা কুর'আন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উল্লিখিত কিতাবদ্বয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর গুণগান এবং আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা এ কথা সম্যকরূপে অবগত ছিলো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

"আর যখন তাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের ধর্মগ্রন্থ (তাওরাত)-এর সমর্থক কিতাব (কুর'আন) আসলো, যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের (আরবের পৌত্তলিকদের) বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করতো, তবু তারা যা জানতো তা (কুর'আন) যখন তাদের কাছে আসলো তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নাত।[২]

'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন্ সালাম (রা) ইয়াহূদী ধর্মের বিশেষজ্ঞ 'আলিম ছিলেন। তিনি পবিত্র তাওরাতের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর দুই ভ্রাতৃব্য সালামা এবং মুহাজিরকে ইসলামের আহ্বান জানালেন। তিনি তাদেরকে বললেন, "হে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়! তোমরা উভয়ে নিঃসন্দেহ অবগত আছো যে,

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র তাওরাতে বলেছেন,

إِنِّيْ بَاعِثٌ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ نَبِيًّا إِسْمُهُ أَحْمَدُ مَنْ اٰمَنَ بِهِ فَقَدِ اهْتَدٰى وَرَشَدَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَهُوَ مَلْعُوْنٌ فَأَسْلَمَ سَلَمَةُ وَأَبِيْ مُهَاجِرٌ.

"নিশ্চয় আমি ইসমা'ঈল (আ)-এর সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে একজন নবী প্রেরণ করবো। তাঁর নাম হবে আহ্‌মাদ। যে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে সে হিদায়াত ও পথপ্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি

২. আল-কুর'আন, ২ : ৮৯

তাঁর উপর ঈমান না আনবে সে হবে অভিশপ্ত। অনন্তর সালামা ইসলাম গ্রহণ করলো এবং মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো।"[৩]

এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো :

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ

"ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ (ইসলাম ধর্ম) থেকে শুধু ওই ব্যক্তি বিমুখ থাকতে পারে যে স্বভাবগতভাবেই নির্বোধ।[৪]

ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল (আ)-এর প্রার্থনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মূর্ত দু'আ এবং 'ঈসা (আ)-এর মূর্ত সুসংবাদ।"[৫] এর বিস্তারিত বিবরণ এই– ইব্‌রাহীম ও ইসমা'ঈল (আ) পবিত্র কা'বা গৃহের নির্মাণ শেষে হারাম শরীফ ও সেখানের বাসিন্দাদের জন্য ইব্‌রাহীম (আ) প্রার্থনা করেন :

رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর থেকে আপনার এক অনুগত উম্মত পয়দা করুন। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-কানূন শিক্ষা দিন এবং আমাদের প্রতি করুণা-দৃষ্টি রাখুন। আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহবীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "আমি কে, তা কি তোমাদেরকে বলবো? শুনো, আমি হলাম আমার পিতা (পিতৃপুরুষ) ইব্‌রাহীম (আ)-এর দু'আর মূর্তপ্রকাশ।"[৭]

ইব্‌রাহীম ও ইসমা'ঈল (আ) মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করার জন্য প্রার্থনা করেন:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

---

৩. মওলানা আশরাফ 'আলী থানবী, *বয়ানুল কুরআন* (লাহোর: শায়খ গোলাম 'আলী এন্ড সন্স, ১৩৭৪ হি), ১ম খণ্ড, পৃ ৭১; 'আলী ইব্‌ন্ বুরহানুদ্ দীন আল-হালাবী, *আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা* (মিসর: আল-মাত্‌বা'আতুস সা'আদাহ্, ১৩২৮ হি), পৃ ২৩৫

৪. আল-কুর'আন, ২ : ১৩০

৫. হাকিম আবূ 'আব্দিল্লাহ্ নিশাপূরী, *আল-মুসতাদরাক* (হায়দারাবাদ: দা'ইরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা, ১৩৪৫ হি) ২য় খণ্ড, পৃ ২৭৫

৬. আল-কুর'আন, ২ : ১২৮

৭. হাকিম আবূ 'আব্দিল্লাহ্ নিশাপূরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৫

"হে আল্লাহ্! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনাবেন; আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"[৮]

উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে প্রতিপন্ন হচ্ছে– এই দু'আতে ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে ইসমা'ঈল (আ) ছিলেন। তাঁরা যে রাসূলের জন্য দু'আ করেছিলেন তিনি তাঁদের উভয়ের বংশোদ্ভূত হবেন এবং মক্কায় আগমণ হবে। সুতরাং এই রাসূল যে মুহাম্মদ (সা), এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কেননা মক্কায় তিনি ছাড়া অন্য কোনো রাসূল ইসমা'ঈল (আ) -এর বংশধর থেকে আবির্ভূত হননি।

'ঈসা (আ) মুহাম্মদ (সা)-এর শুভাগমন সম্পর্কে যে সুসংবাদ প্রদান করেছেন, তা আরোও সুস্পষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ

"স্মরণ করুন, মারয়াম তনয় 'ঈসা বলেছিলেন, হে বনূ ইসরা'ঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র রাসূলরূপে আগমন করেছি। আমার পূর্বে যে তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং আমার পরে আহ্মাদ নামে যে রাসূল আগমন করবেন আমি তাঁর সুসংবাদ দিচ্ছি।"[৯]

'তাফসীর খাযিন'-এ সুনান আবূ দাউদ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে– খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে পারদর্শী পণ্ডিত হাবশার সম্রাট নাজাশী মুহাম্মদ (সা)-কে বলেছিলেন, "'ঈসা (আ) যে রাসূলের আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছিলেন বাস্তবিকই আপনিই সেই রাসূল।"[১০]

ইয়াহূদী ধর্মের বিশেষজ্ঞ 'আলিম 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম বলেছেন,

"তাওরাতে মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাবলী লিখিত আছে এবং এ কথাও লিখিত আছে যে, 'ঈসা (আ)-কে তাঁর কবরের পাশে দাফন করা হবে।"[১১]

---

৮. আল-কুর'আন, ২ : ১২৯

৯. আল-কুর'আন, ৬১ : ৬

১০. 'আলা'উদ্দীন 'আলী ইব্ন্ মুহাম্মাদ বাগদাদী, *তাফসীরুল খাযিন* (মিসর: মাত্বা'আ মুসতাফা মুহাম্মাদ, তা বি), ৭ম খণ্ড, পৃ ৭১

১১. *জামি' তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ ২০২

ইঞ্জীলের ভবিষ্যদ্বাণী : যোহনের ইঞ্জীলে আছে–

"আর আমি আমার পিতার নিকটে নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক সহায় বা সমর্থনকারী (গ্রীক) 'পারাক্লীতস' তোমাদিগকে দান করিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সাথে থাকেন।"[১২]

উক্ত ইঞ্জীলে আরোও আছে–

"কিন্তু সেই সহায় যিনি পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা (আল্লাহ্) আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা শিক্ষা দিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।"[১৩]

উক্ত ইঞ্জীলে আরোও উল্লিখিত আছে–

"কিন্তু সেই সহায়ক, যাঁহাকে আমি পিতার (আল্লাহ্র) নিকট হইতে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিবেন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।"[১৪]

"তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ, আমি না গেলে সেই সহায় (পারাক্লীত) তোমাদের নিকট আসিবে না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে আমি তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতা ও বিচারের সম্বন্ধে জগৎকে দোষী করিবেন।"[১৫]

"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু সেই সত্যের আত্মা (পারাক্লীত্) যখন আসিবেন তখন তিনি তোমাদিগকে সত্যের সন্ধান দিবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, যাহা যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন এবং ভবিষ্যতের ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"[১৬]

Paraclete শব্দের পরিবর্তন : ইঞ্জিলে বর্ণিত বাক্যগুলোতে 'ঈসা (আ) বার বার সেই রাসূলের আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাকে তিনি 'পারাক্লীত' (Paraclete) বলে অভিহিত করেছেন। এই শব্দটি 'ইব্রানী (হিব্রু) অথবা সুরইয়ানী (প্রাচীন সিরীয় ভাষা)। এই শব্দটির 'আরবী অনুবাদ 'মুহাম্মদ' এবং 'আহ্মাদ', অর্থ হলো– প্রশংসিত, পরম প্রশংসাকারী বা পরম প্রশংসিত। প্রাচীন ইউনানী (গ্রীক) ভাষায় এই শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে– 'পাইরিকিলইউটাস'। এর অর্থও অত্যন্ত প্রশংসাকারী বা প্রশংসিত (أحمد)।

---

১২. যোহন, ১৪ : ১৬
১৩. যোহন, ১৪ : ২৬
১৪. যোহন, ১৫ : ২৬
১৫. যোহন, ১৬ : ৭-১১
১৬. যোহন, ১৬ : ১২-১৪

পরবর্তীতে খ্রিস্টানরা যখন দেখতে পেলো যে, এর দ্বারা ইসলামের সত্যতা প্রতিপাদিত হচ্ছে তখন তারা শব্দটি পরিবর্তন করে 'পাইরিকিলিটাস' অর্থাৎ 'শান্তিদাতা' বানিয়ে দিলো।

খ্রিস্টান পাদ্‌রী ও মুসলিম 'আলিম পণ্ডিতগণের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ এ শব্দটি নিয়ে তর্ক-যুদ্ধ চলে আসছে। ইসলামের 'আলিমগণ প্রাচীন খ্রিস্টানদের দলীল দ্বারা বহুবার প্রমাণিত করেছেন যে, শব্দটি 'পাইরিকিল্‌ইউটাস' অর্থাৎ আহ্‌মাদ বা মুহাম্মদ। শব্দটি নিয়ে তর্ক করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না। 'ঈসা (আ)-এর এবং ইঞ্জিলের ভাষা ইউনানী (গ্রীক) ছিলো না; বরং সুরইয়ানী (প্রাচীন সিরীয় ভাষা) মিশ্রিত 'ইব্‌রানী (হিব্রু) ছিলো। সুতরাং তিনি 'পারাক্লীত' শব্দ বলিয়াছেন এবং সুরইয়ানী ও 'ইবরানী অভিধানে 'পারাক্লীত' শব্দের অর্থ আহমাদ বা মুহাম্মদ।

যোহন-এর সুসমাচারের 'পারাক্লীতস' সম্বন্ধে ড. মরিস বুকাইলি বলেন, যীশুর শেষ ভাষণটি হচ্ছে তাঁর সব ভাষণের সেরা। এই শেষ ভাষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানব জাতির যে ভবিষ্যৎ যীশুর চোখে ফুটে উঠেছিলো, তার বর্ণনাসহ শিষ্যবর্গের জন্যে তো বটেই, গোটা মানবজাতির জন্যেও যীশুর যে গভীর মমত্ববোধ ও দরদ, তাও তার এই ভাষণে ফুটে উঠেছে। এ বিষয়ে তাঁর যে নির্দেশ ও বিধান এবং তাঁর তিরোধানের পর মানবজাতিকে কোন্ দিশারী বা কোন্ পথ-নির্দেশককে অনুসরণ করতে হবে, সে ব্যাপারেও তাঁর এই ভাষণে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। যোহন-রচিত সুসমাচারে এই পথ-নির্দেশকের গ্রীক উপাধি হচ্ছে Paracletos তথা ইংরেজি বাইবেলে এসে তা হয়েছে Paraclete.

এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদগুলো : "যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞাসকল পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব, তিনি আর এক সহায় (Parakletos বা Paraclete) তোমাদিগকে দিবেন।"[১৭]

এই 'Parakletos'-'Paraclete' বা 'সহায়'-এর অর্থ কি? বর্তমান (বাংলা) বাইবেলের যোহন-লিখিত সুসমাচারে (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না, ৪র্থ খণ্ডে)-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এভাবে, "কিন্তু সেই সহায় পবিত্র আত্মা (বাংলা ইঞ্জিল শরীফে, পাক রূহ্) যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।"[১৮]

"তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।"[১৯]

"আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তাহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব। তিনি

১৭. যোহন, ১৪ : ১৫-১৬

১৮. যোহন, ১৪:২৬

১৯. যোহন, ১৫:২৬

আসিয়া দুনিয়াকে পাপের সম্বন্ধে, নির্দোষিতার সম্বন্ধে ও খোদার বিষয়ের সম্বন্ধে চেতনা দিবেন।..."[২০]

পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, যাহা যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন এবং ভবিষ্যতের ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন।..."[২১]

লক্ষণীয়, উপরে বর্ণিত কতগুলো বাণীতে গ্রীক শব্দ 'পারাক্লীতস'কে 'পবিত্র আত্মা' বা 'পাক রূহ্' বর্ণনা বা নির্দেশ করা হয়েছে। তার ফলে সাধারণ পাঠকের নিকট সেই বর্ণনা তেমন কোনো দৃষ্টি আকর্ষণ না করারই কথা। যে সকল ক্ষেত্রে বাইবেলের অনুবাদে উপ-শিরোনাম দেওয়া হয়ে থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে এই সব সত্য আরো বেশি করে প্রযোজ্য। তা ছাড়া জনসাধারণের জন্য ব্যাখ্যা বা টীকাসম্বলিত বেশ কিছু বাইবেল (ইঞ্জিল) বাজারে ছাড়া হয়েছে। টীকা ও ভাষ্যকারগণ এসব বাইবেলে এমন কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন, যা খ্রিস্টান ধর্মের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এভাবে তাঁরা ওইসব টীকা, ভাষ্য ও পরিভাষার মাধ্যমে পাঠকের নিকট নিজেদের মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যাই তুলে ধরেন। ফলে সেসব ক্ষেত্রেও এই 'পারাক্লীতস' শব্দ কিংবা তার অর্থের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না হওয়াই স্বাভাবিক। তদুপরি এ শব্দটির ব্যাপারে এ ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এতো অধিক যে, পাঠক বিভ্রান্তিতে পরে।

এ ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যার একটি উদাহরণ হচ্ছে এ. ট্রাইকট রচিত *'লিটল ডিকশনারি অব দি নিউ টেস্টামেন্ট'* গ্রন্থটি। এখানে 'পারাক্লীতস্' শব্দের ব্যাখ্যায় লেখক আলোকপাত করেছেন এভাবে : "(পারাক্লীত)[২২] এই নাম বা শিরোনামটি গ্রীক থেকে তরজমা, এটি শুধু বাইবেলের নতুন নিয়মের যোহন-লিখিত সুসমাচারে ব্যবহৃত হয়েছে। লাস্ট সাপারের পর যীশুখ্রিস্ট যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণ লিপিবদ্ধ করার সময় যোহন বার চারেক এই 'পারাক্লীতস্' শব্দের উল্লেখ করেছেন (যথা ১৪:১৬, ১৪:২৬, ১৫:২৬ এবং ১৬:৭ দ্রষ্টব্য)। এছাড়াও যোহনের প্রথম পত্রে (২:১) আর একবার 'পারাক্লীত'-এর উল্লেখ রয়েছে। যোহনের সুসমাচারে 'পারাক্লীত'কে বলা হয়েছে 'পবিত্র আত্মা বা পাক রূহ্'। কিন্তু তাঁর পত্রে এই 'পারাক্লীতস্'কে বলা হয়েছে স্বয়ং যীশুখ্রিস্ট। উল্লেখ্য যে, খ্রিস্ট-পরবর্তী প্রথম শতকে হেলেনিক ইয়াহূদীদের প্রচলিত বাগধারায় পারাক্লীত পারাক্লীতস্ শব্দটি একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হতো। এই নির্দিষ্ট অর্থ হল

২০. বাংলা ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না, ৪র্থ খণ্ড, ১৬:৭-৮

২১. বাংলা বাইবেল, যোহন, ১৬:১৩-১৪

২২. আসলে যোহন-লিখিত সুসমাচারে দেখা যায়, লাস্ট-সাপারের সময় যীশু যে দীর্ঘ ভাষণটি দিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি এই 'পারাক্লীত'-এর উল্লেখ করেছিলেন।

মধ্যস্থ, পক্ষসমর্থক (Intercessor), রক্ষাকর্তা (Defender) ... প্রভৃতি। যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "স্পিরিট বা আত্মা পিতা ও পুত্রকে যেভাবে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন, তদস্থলে পারাক্লীত বা ক্ষমতাধর পক্ষসমর্থক সেই আত্মা নিজস্ব ব্রত হিসাবে সেই ভূমিকাই পালন করবেন। এই আত্মা যীশুর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং যীশুর বিকল্প হিসাবেই কাজ করে যাবেন।"

এ ব্যাখ্যার দ্বারা লেখক 'হোলি স্পিরিট বা পবিত্র আত্মা (পাক রূহ্)'কে যীশুর তিরোধানের পর মানবজীবনের চূড়ান্ত গাইড বা দিশারী হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু যোহনের মূল বক্তব্যের সাথে এই ব্যাখ্যার মিল কোথায়?

তা ছাড়া উপরে বাইবেল থেকে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের যে অংশে বলা হয়েছে : "তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।" এখানে যে প্রশ্নটা সঙ্গত কারণেই জেগে উঠে,– তা হলো, উদ্ধৃতাংশের এই বক্তব্য 'পবিত্র আত্মা'র প্রতি প্রয়োগ করাটা বিস্ময়কর নয় কি? 'পবিত্র আত্মা' কথা বলার ক্ষমতা রাখেন, যা কিছু শোনেন তাও সাধারণ্যে ঘোষণা করতে পারেন... এ ধরনের বক্তব্য মেনে নেওয়া সত্যিই মুশকিল। যুক্তিসঙ্গত কারণে এ বিষয়ে তাই প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আমার ধারণা, বাইবেলের ব্যাখ্যাকারবৃন্দ এই প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন তাঁদের চিরাচরিত নিয়মেই।

আসলে, এ ক্ষেত্রে সমস্যাটা যে কি, তা বুঝতে চাইলে গ্রীক ভাষায় রচিত বাইবেলের মূল রচনার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, যোহন তাঁর সুসমাচার (ইঞ্জিল) অন্য কোনো ভাষায় নয় বরং গ্রীক ভাষাতেই রচনা করেছিলেন এবং তা সর্বজনস্বীকৃত। এখানে আমরা যোহনের যে গ্রীক বাইবেলটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করছি, তার নাম Novum Testumentum Grece.[২৩]

এ ধরনের যে-কোনো রচনার গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনার বেলায় প্রথমেই পাঠভিন্নতার কথা উঠতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের জানামতে, যোহন-রচিত যেসকল বাইবেল পাওয়া যাচ্ছে তন্মধ্যে সিরিয়াক ভাষায় অনূদিত বাইবেলের সুবিখ্যাত পরিম্পসেস্ট সংস্করণের কেবলমাত্র ১৪ অনুচ্ছেদের ২৬ নং বাণীতে অর্থের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[২৪]

মূল বাইবেল ও অনূদিত বাইবেলে পার্থক্য

মূল বাইবেলে দেখা যাচ্ছে, 'হোলি স্পিরিট' কথাটা লেখা নেই। শুধু 'স্পিরিট' শব্দটি আছে। তা হলে কি নকলকারী ভুল করে বাড়তি একটা শব্দ বসিয়েছিলেন, নাকি জ্ঞাতসারেই

২৩. Nestle and Aland, Pub. –United Bibles Societies, London, 1971

২৪. এই পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করা হয়েছিল খ্রিস্ট-পরবর্তী চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে। ১৮১২ খ্রি. মাউন্ট সিনাইতে এগনেস এস. লুই এটি আবিষ্কার করে। এটি এ নামে পরিচিত হওয়ার কারণ, আবিষ্কারের সময়ে এই বাইবেলটি অন্যান্য কিছু কপি দ্বারা জড়ানো ছিল। জড়ানো কপিগুলো খুলে ফেলা হলে মূল বাইবেলটি বেরিয়ে পড়ে।

এই দাবি সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যে মূল বাইবেলের লেখা কপি করছেন, সেখানেই 'হোলি স্পিরিট'কে দিয়ে 'কথা শোনানো' ও 'কথা বলানোর' কথা বলা হয়েছে? অথবা যতই উদ্ভট মনে হোক, তবুও বাস্তবে বাইবেল নকল করতে গিয়ে নকলকারী নতুন একটা শব্দ জুড়ে দেওয়ার ধৃষ্টতা বর্জন করতে পারেনি? যাহোক, আলোচ্য বাইবেলে এইপাঠ-ভিন্নতা ছাড়াও পরিশ্রম সহকারে খুঁজে দেখলে আরো দু-চারটা ভিন্ন-পাঠ বেরিয়ে পড়তে পারে। তবে সেগুলো মূলত ব্যাকরণগত, তাতে বক্তব্যের সাধারণ অর্থের তেমন কোনো হেরফের হয় না। কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'দেখা' (টু সি) ও 'কথা বলা' (টু স্পিক) এ দুটি ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং তাদের সঠিক অর্থের ব্যাপারটি। আসলে বক্তব্যের সঠিক অর্থেই 'দেখা' ও 'কথা বলা' ক্রিয়াপদ দুটির আলোচনা প্রয়োজন। কেননা, মূল গ্রীক বাইবেলে এ দু'টি শব্দ বিদ্যমান।

যোহন রচিত বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদে যে 'টু হিয়ার' বা শুনা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা আসলে গ্রীক ভাষার ক্রিয়াপদ 'acouo'-র অনুবাদ। এর অর্থ শ্রবণেন্দ্র দিয়ে ধ্বনি গ্রহণ করা। এর থেকেই 'এ্যাকুস্টিকস' শব্দটা এসেছে– যার অর্থ ধ্বনিবিজ্ঞান। অনুরূপভাবে যোহনের ইংরেজি বাইবেলের 'টু স্পিক' হলো মূল গ্রীক ভাষার ক্রিয়াপদ 'laco'-র অনুবাদ– যার সাধারণ অর্থ দাঁড়ায় 'ধ্বনি নির্গত করা'। আর এ শব্দেরই নির্দিষ্ট অর্থ হলো 'টু স্পিক' বা 'কথা বলা'। উল্লেখ্য যে, এই শেষোক্ত ক্রিয়াপদটি গ্রীক ভাষায় রচিত বাইবেলের সুসমাচারগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে এন্তার এবং এই শব্দটির দ্বারা যীশুর বিভিন্ন ভাষণে প্রদত্ত নানা বক্তব্য ও ঘোষণার কথাই বলা হয়েছে। এর দ্বারা একটা বিষয় পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ছে যে, যীশু নিজেই ওইসব ঘোষণায় মানুষের প্রতি তাঁর যা বক্তব্য, তা পেশ করেছেন এবং এতে 'হোলি স্পিরিট'-এর কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমের বক্তব্য পেশের কোনো অবকাশ থাকছে না। যীশুর ওইসব বক্তব্য নেহায়েত বাস্তবের রক্ত-মাংসের মানুষের বক্তব্য। মোদ্দাকথা এই যে, এই শব্দটির দ্বারা ধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে যীশুর বাণীর অনুরূপ বক্তব্যের কথাই গ্রীক বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে; অন্য কিছু নয়।

অতএব, এটা খুবই স্পষ্ট যে, 'এ্যাকুয়ো' এবং 'লালিও' এই দুই গ্রীক-ক্রিয়াপদ এমন দুইটি বাস্তব-কাজের নির্দেশ দিচ্ছে, যা শুধু একজন জীবন্ত মানুষ তাঁর শ্রবণ ও উচ্চারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমাধা করতে পারেন। সুতরাং ওই শব্দ দু'টি 'হোলি স্প্রিরিট', পাক রূহ বা পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে প্রয়োগ বাস্তবিকই অসম্ভব।

এ কারণেই যোহন-লিখিত সুসমাচারের গ্রীক সংস্করণের টেক্সট বা পাঠে আমরা পাচ্ছি, তার নিরিখে ১৪ নং অনুচ্ছেদের ২৬ নং বাণীর 'হোলি স্প্রিট' বা পবিত্র আত্মা শব্দটির দরুন পুরো অনুচ্ছেদটির অর্থ ও মর্ম পুরাপুরিভাবে অসঙ্গত ও অবান্তর হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য যে, এই ১৪:২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "কিন্তু সেই সহায় পবিত্র আত্মা, যাহাকে পিতা আমার নামে

পাঠাইয়া দিবেন"– ইত্যাদি। যোহন–লিখিত সুসমাচারে (বাংলা ইঞ্জিলের ৪র্থ খণ্ড) এটাই একমাত্র অনুচ্ছেদ বা বাণী, যেখানে 'পারাক্লীত'কে পবিত্র আত্মা বলে সনাক্ত করা হচ্ছে।

পক্ষান্তরে এই অনুচ্ছেদটি থেকে যদি 'পবিত্র' ও 'আত্মা'- এই শব্দ দুইটি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে যোহনের সুসমাচারে বর্ণিত এই গোটা বক্তব্যটা একটা পরিষ্কার অর্থ বহন করে। শুধু তাই নয়, বাইবেলের নতুন নিয়মে সন্নিবেশিত যোহনের প্রথম পত্রে যে অর্থে 'পারাক্লীত' শব্দের ব্যবহার রয়েছে, এর দ্বারা সেই অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, সেখানে যোহন এই 'পারাক্লীত' শব্দ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে যীশুখ্রিস্টকেই[২৫] বুঝিয়েছেন– যে যীশুখ্রিস্ট স্বয়ং ছিলেন বিধাতার নিকটে মানুষের মধ্যস্থতাকারী।[২৬]

বাইবেলের ভবিষ্যৎদ্বাণী

যোহনের সুসমাচারে দেখা যায় (১৪:১৬) যীশু বলেছেন, "আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করবো এবং তিনি আর এক সহায় (পারাক্লীতস্) তোমাদিগকে দিবেন।" এখানে যীশু স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ঠিক তেমনিভাবে 'আরো একজন' মধ্যস্থতাকারী মানবজাতির কাছে পাঠানো হবে, যেমনভাবে তিনি নিজে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন।

এখানে তর্কশাস্ত্রের নিয়ম প্রয়োগ করলে যে কেউই দেখতে পাবেন, যোহনের সুসমাচারে যীশুখ্রিস্টের মুখ দিয়ে যে 'পারাক্লীত'-এর কথা বলা হয়েছে, তিনি খোদ যীশুখ্রিস্টের মত রক্ত-মাংসের মানুষ ছাড়া আর কিছুই নন। গ্রীক ভাষায় রচিত যোহনের মূল বাইবেলে ঠিক যেভাবে উল্লেখ রয়েছে, তেমনিভাবেই সেই 'পারাক্লীত'-এরও থাকবে 'বাকশক্তি' ও 'শ্রবণশক্তি'।

অতএব এই ঘোষণা দ্বারা যীশুখ্রিস্ট এই মর্মেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, পরবর্তীতে আল্লাহ্ আরো একজন মানুষকে দুনিয়ায় প্রেরণ করবেন। তিনি হবেন যোহনের বর্ণনামতেই একজন পয়গাম্বর। তিনি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন আল্লাহ্‌র বাণী। বস্তুত যোহনের সুসমাচারে বর্ণিত শব্দাবলীর সঠিক অর্থ যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে যুক্তিবিজ্ঞানের নিরিখেই বাইবেলের এই বক্তব্যের অর্থ ও ব্যাখ্যা এটাই। এ ছাড়া আর অন্য কিছু হতেই পারে না।

---

২৫. কোনো কোনো অনুবাদক ও ভাষ্যকার, বিশেষত যাঁরা প্রাচীন তাঁরা অবশ্য এই 'পারাক্লীত' শব্দের অর্থ করেছেন 'কনসোলার' বা 'সান্তনাদাতা'। কিন্তু এই অর্থ মোটেও ঠিক নয়।

২৬. উল্লেখ্য যে, আখ্‌তার–উল–আলম, অনূদিত বাংলা বাইবেলে এই স্থানে বসানো হয়েছে, "পিতার কাছে আমাদের এক উকীল, (গ্রীক) পারাক্লীত। যোহন ১৪:১৬; তিনি ধার্মিক যীশুখ্রিস্ট" (যোহনের প্রথম পত্র ২,১) পক্ষান্তরে, বাংলা ইঞ্জিল শরীফে আছে : 'পিতার নিকটে আমাদের পক্ষ হইয়া কথা বলিবার জন্য একজন আছেন, তিনি ঈসা মসীহ, যিনি নির্দোষ।' (২৩ খণ্ড : ১, ইউহোন্না ২, ১) আরো উল্লেখ্য যে বাংলা বাইবেলে 'সহায়' শব্দের পরে তারকা চিহ্ন দিয়ে ফুটনোটে কখনো লেখা হয়েছে পারাক্লীতস্, কখনো পারাক্লীত। কিন্তু বাংলা ইঞ্জিল শরীফে 'সাহায্যকারী' কিংবা একজন ছাড়া কোথাও–এমনকি কিছু কিছু ফুটনোটে 'পারাক্লীত' শব্দের উল্লেখই নেই।

আমরা অধুনা প্রচলিত বাইবেল (ইঞ্জিল) গুলোতে 'পারাক্লীতস্' শব্দের সাথে কিংবা তার বদলে 'হোলি স্পিরিট' তথা 'পবিত্র আত্মা' বা 'পাক রূহ্' বলে যে কথাটা পাচ্ছি, তা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের সংযোজন এবং ওই দু'টি জুড়ে দেওয়া হয়েছে একান্ত ইচ্ছাকৃতভাবেই। এরদ্বারা মূল বাইবেলের যে বাণীতে যীশুর পরে আর একজন পয়গাম্বর আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছিল, তা পুরোপুরিভাবে ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টান গীর্জাসমূহের সংগঠনের সময় প্রচার চালানো হয়েছিল যে, যীশুই হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। গীর্জা-সংস্থার সেই প্রচারটা যাতে মাঠে মারা না যায়, তার জন্যই বাইবেলের বাণীতে ও অনুবাদে এ ধরনের কারসাজি ও বিকৃতি সাধন করা হয়েছে।[২৭]

মহাত্মা যোহনের লিখিত ইঞ্জিলের বর্ণিত শ্লোকসমূহে প্রতীক্ষিত রাসূলের যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তা হলো :

১) 'ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শিক্ষা লোকেরা ভুলে যাবে এবং প্রতীক্ষিত রাসূল আগমন করে তা স্মরণ করিয়ে দেবেন।

২) তিনি 'ঈসা (আ)-এর অসম্পূর্ণ বিষয়গুলো পূরণ করবেন এবং সকল সত্যের সন্ধান দেবেন।

৩) তিনি পৃথিবীতে 'ঈসা (আ)-এর মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করবেন, তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন এবং তাঁর উপর ঈমান না আনার দ্বারা পৃথিবীকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন।

৪) তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী কিছুই বলবেন না; আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা আদেশ হবে তিনি শুধু তা-ই বলবেন।

বিস্তারিত বিবরণ

খ্রিস্টানগণ 'ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শিক্ষা ভুলে তাঁকে আল্লাহ্র পুত্র এবং আল্লাহ্র এক-তৃতীয়াংশ বলে বিশ্বাস করতো, তাঁর মূর্তি বানিয়ে পূজা করতো, এছাড়া পবিত্র খ্রিস্টধর্মে যে আরও অনেক কুপ্রথা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস স্থান পেয়েছিলো, এগুলো কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে? এসকল কুপ্রথা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে 'ঈসা (আ)-এর প্রকৃত মতবাদকে একমাত্র মুহাম্মদ (সা)-ই উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুর'আন খ্রিস্টানদের 'আকীদাসমূহের মূলোৎপাটন করে এবং বিশদভাবে পাদ্রীদের কুশিক্ষা ত্রিত্ববাদের পরিবর্তে একত্ববাদের মহান পতাকা উড্ডীন করেছে। অংশীবাদ ও পুত্রত্ববাদ ভঞ্জন করে 'ঈসা (আ)-এর জীবিত থাকা ও মৃত হওয়া সম্পর্কিত জটিল সমস্যার সমাধান দিয়েছে।

---

২৭. ড. মরিস বুকাইলি (আখ্তার-উল্-আলম অনূদিত), *বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ ১৪০-১৪৬

"তিনি 'ঈসা (আ)-এর অসম্পূর্ণ বিষয়গুলো সম্পন্ন করবেন এবং সকল সত্যের সন্ধান দেবেন।" 'ঈসা (আ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীও একমাত্র মুহাম্মদ (আ)-এর উপর প্রযোজ্য হয়। কেননা তাঁর দ্বারাই পবিত্র দীন পূর্ণতা পেয়েছে। নবী-রাসূলগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই 'আকীদা, 'ইবাদত, চরিত্র, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধান, কিয়ামতের নিদর্শনাবলী, জান্নাত, জাহান্নাম, পরকালে পাপীদের শাস্তি ও পুণ্যবানদের পুরস্কার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। আর কোনো নবী-রাসূল এমন বর্ণনা দেননি। তাই তাঁকে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' বা 'সর্বশেষ নবী' উপাধি দেয়া হয়েছে।

'ঈসা (আ) বলেছেন, "তিনি পৃথিবীতে আমার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান না আনার দ্বারা পৃথিবীকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন।" এই ভবিষ্যদ্বাণীও মুহাম্মদ (সা) ছাড়া অন্য কারো উপর প্রযোজ্য হয় না। একমাত্র তিনিই 'ঈসা (আ)-এর প্রকৃত ব্যক্তিত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করে তাঁর মর্যাদা শত্রুমিত্র উভয় পক্ষের আরোপিত দোষ থেকে নিষ্কলঙ্ক করে দেখিয়েছেন এবং তাঁর নুবুওয়াতের সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইয়াহূদী সম্প্রদায় তাঁর এবং তাঁর জননী মারয়াম (আ)-এর চরিত্রের উপর যে মিথ্য অপবাদগুলো রটিয়ে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছিলো একমাত্র মুহাম্মদ (সা)-ই তা খণ্ডন করেছেন। খ্রিস্ট সম্প্রদায় ভালোবাসার আতিশয্যে অথবা পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র এবং আল্লাহ্‌র অংশী সাব্যস্ত করে। তারা তাঁর পবিত্র শিক্ষার উপর রোমী পৌত্তলিকতার ছাপ লাগিয়ে এবং তাঁর জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাসের অবতারণা করে খ্রিস্টধর্মের মুখমণ্ডলে যে কলুষ-কালিমার পর্দা করে রেখেছিলো তা মুহাম্মদ (সা)-ই ছিন্ন করে বাস্তব চিত্র ও প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। পবিত্র কুর'আনে এ সকল তথ্যের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 'ঈসা (আ)-এর নুবুওয়াতের উপর ঈমান আনাও মুসলমানদের একটি মৌলিক 'আকীদা।

'ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

'ঈসা (আ) প্রতীক্ষিত নবীর চতুর্থ নিদর্শন বলেছেন, "তিনি নিজে থেকে কিছু বলবেন না; আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা আদেশ হবে তিনি শুধু তা-ই বলবেন।"– এ তো মুহাম্মদ (সা)-এর একটি বিশেষ গুণ ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে তাঁর এই বিশেষ গুণ প্রকাশ করেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى .

"স্বীয় প্রবৃত্তি বশে তিনি কিছু বলেন না; বরং তাঁর প্রতি ওহীরূপে যা পাঠানো হয়, তিনি শুধু তাই বলেন।"[২৮]

মুহাম্মদ (সা) যা বলতেন, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) তা লিখে রাখতেন। লোকেরা তাঁকে বললো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো রাগান্বিত হলে অনেক কিছু বলে ফেলেন, তা আপনি

২৮. আল-কুর'আন, ৫৩:৪

লিখবেন না। 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিষয়টি অবগত করলেন। একথা শুনে তিনি তাঁর পবিত্র মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "এ মুখ থেকে সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতেই সঠিক ও সত্য ছাড়া আর কিছুই বের হয় না।"[২৯]

মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে যে 'ঈসা (আ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই বর্ণনার পর এতে কারোও কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۗ

"যারা বার্তাবাহক উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিল, যা তাদের নিকট আছে তা তাতে লিপিবদ্ধ পায়।"[৩০]

মহাত্মা লুকের ইঞ্জীলে আছে যে, 'ঈসা মসীহ্ আকাশে উত্থিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বলেছেন, "আর দেখ আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছি; কিন্তু যে পর্যন্ত ঊর্ধ্ব হইতে শক্তি-পরিহিত না হও, সে পর্যন্ত তোমরা এই নগরে অবস্থান কর।"[৩১]

বর্ণিত বাক্যাবলীর কয়েকটি পঙ্‌তির পরেই লুকের ইঞ্জীলের সমাপ্তি টানা হয়। কিন্তু এতে প্রতিশ্রুত নবীর আবির্ভাবের কোনো উল্লেখ নাই। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, 'ঈসা (আ)-এর পরে মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত আর কোনো নবীর আবির্ভাব হয়নি। অতএব তিনিই সেই প্রতিশ্রুত নবী। 'ঊর্ধ্ব জগতের শক্তি (প্রতিশ্রুত নবী) প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জেরুযালেমে অবস্থান কর।' এ কথার অর্থ এই নয় যে, তোমরা সেখানে বসতি স্থাপন করো, বরং মর্ম এই যে, প্রতিশ্রুত নবীর আগমন পর্যন্ত যেরুযালেমের 'বায়তুল মাকদিস' তোমাদের কিবলা নির্ধারিত থাকবে। যখন তাঁর আগমন হবে তখন পবিত্র কা'বা কিবলা হিসেবে গৃহীত হবে।

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ

"অতএব আপনি আল-মসজিদুল হারামের দিকে মুখ প্রত্যাবর্তন করুন। তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো ঐ দিকে মুখ প্রত্যাবর্তন করো; আর কিতাবীরা (ইয়াহূদ ও খ্রিস্টানগণ) নিশ্চিতভাবে জানে যে, এটি তাদের প্রভুর তরফ থেকে সম্পূর্ণ সঠিক।"[৩২]

---

২৯. *সুনান আবূ দাউদ*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৫৭-১৫৮

৩০. আল-কুর'আন, ৭:১৫৭

৩১. লুক, ২৪:৪৯

৩২. আল-কুর'আন, ২ : ১৪৪; পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে কিতাবীরা জানতো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর উম্মতের কিবলা 'আল-মসজিদুল হারাম' নির্ধারিত হবে।

ইয়াহইয়া (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

'ঈসা (আ) এরূপ সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বলেই মুহাম্মদ (সা) বলেন, "আমি আমার ভাই 'ঈসা (আ)-এর মূর্ত সুসংবাদ।"[৩৩] ইঞ্জীলে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর আবির্ভাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রতিশ্রুত নবীর আর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করা হয়েছে। 'ঈসা এবং ইয়াহ্ইয়া (আ) একই সময়ে ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া (আ) ছিলেন 'ঈসা (আ) অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে ইয়াহূদীদের প্রেরিত লোকেরা তিনজন নবী সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলো। তা ইঞ্জীলের ভাষায় এই :

"ইয়াহূদীগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া জেরুযালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আপনি কে ? তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না, তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খৃষ্ট ('ঈসা) নই। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি ? আপনি কি ইলইয়াস ? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই নবী ? তিনি উত্তর করিলেন, না। আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খৃষ্ট নহেন, ইল্ইয়াসও নহেন, সেই নবীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ[৩৪] করিতেছেন কেন ? যোহন (ইয়াহ্ইয়া) উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি জলে বাপ্তাইজ করিতেছি; তোমাদের মধ্যে একজন দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে তোমরা জান না, যিনি আমার পশ্চাতে আসিতেছেন, আমি তাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিবার যোগ্য নহি।"[৩৫]

এ কথা থেকে প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, ইঞ্জীলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইয়াহূদীগণ তিনজন নবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিলো। তাঁদের দু'জন হলেন ইল্ইয়াস ও 'ঈসা (আ) আর তৃতীয় জনকে 'সেই নবী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, 'ঈসা (আ)-এর পর একজন নবী আগমন করবেন, শুধু 'নবী' শব্দ প্রয়োগ করলেই তাঁকে বোঝাবে। এই তৃতীয় নবী মুহাম্মদ (সা) ছাড়া আর কে ? 'ঈসা (আ)-এর পরে একমাত্র তিনিই নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শুধু নবী বা রাসূল নামে একমাত্র তিনিই সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। মুসলমানগণ তাঁকেই নবী (সা) বলে এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে তিনিই 'সেই নবী' বা 'The prophet' নামে পরিচিত। ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর পরে যে একজন নবী আগমন করছেন, তাঁর সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া (আ) বললেন, "তিনি তোমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন, তোমরা তাঁহাকে জান না, আমি তাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিবার যোগ্য নহি।" এই নবী মুহাম্মদ (সা) ছাড়া অন্য কেউ নন।

---

৩৩. মুল্লা' মজদুদ্দীন, *সীরাতে মুস্তফা*, (দিল্লী : মাকতাবা 'উসমানিয়া, ১৯৫৭), পৃ ১৬

৩৪. ইয়াহ্ইয়া (আ) পাপ ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে লোকদেরকে জর্ডান নদীতে গোসল করার নির্দেশ দিতেন, এটাই হলো বাপ্তাইজ।

৩৫. যোহন, ১৯-২৭

তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী

সাহাবীদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) তাওরাত পড়েছিলেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۰ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا.

"(হে নবী,) আমি আপনাকে (আল্লাহ্র) পক্ষ থেকে সাক্ষী, (সৎপরায়ণদের জন্য) সুসংবাদদাতা এবং (অসৎপরায়ণদের জন্য) সতর্ককারী, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে পাঠিয়েছি।"[৩৬]

উপরোক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তাওরাতেও অবিকল তাঁর সম্পর্কে এই গুণগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৭]

عن عبد الله بن عمرو أنّ هذه الآية التى فى القرآن يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا قَالَ فى التو راة يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وحرز الامين أنت عبدى ورسولى وسميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا إله الا الله فيفتح بها أعينا عميا و آذانا صما وقلوبا غلفا ـ

'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর থেকে বর্ণিত : "হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।" কুরআনের এ আয়াতটি অবিকল তাওরাতেও আছে : হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও উম্মীদের আশ্রয়স্থলরূপে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দা এবং রাসূল। আর আমি আপনার নাম রাখলাম 'মুতাওয়াক্কিল' অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল। আর তিনি (অর্থাৎ আপনি) কঠোর এবং পাষাণ হৃদয় হবেন না। বাজারে হই-হল্লা করবেন না। অসদ্ব্যবহার দ্বারা অসদ্ব্যবহারের প্রতিদান দিবেন না; বরং মার্জনা ও ক্ষমা করবেন। যে পর্যন্ত না বাঁকা ধর্মকে আপনার দ্বারা সোজা করে নিবেন এবং লোকের মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করাবেন সে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মৃত্যু দেবেন না। সুতরাং আপনি এই (ইসলাম) ধর্মের সাহায্যে অন্ধ নয়নসমূহ, বধির কর্ণসমূহ এবং মেধাহীন অবোধ অন্তরসমূহ উম্মিলিত করে দিবেন।"[৩৮]

---

৩৬. আল-কুরআন, ৩৩ : ৪৫-৪৬

৩৭. *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ ৭১৭

৩৮. *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ ৭১৭

ইয়াহূদী 'আলিম কা'ব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। 'আতা নামক জনৈক তাবি'ঈ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী আছে কি ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আছে। তিনি তাওরাত থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণাবলী পড়ে শুনালেন, যা 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর বলেছিলেন।[৩৯]

বর্তমানে তাওরাতের যে কপিগুলো পাওয়া যায় তন্মধ্যে বাইবেলের 'ইসাইয়া' কিতাবে সামান্য পরিবর্তনসহ অদ্যাপি এ ভবিষ্যদ্বাণীটি দেখতে পাওয়া যায়।[৪০] ইয়াহইয়া (আ) এ ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতীক্ষিত নবীর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণাবলীর মধ্যে عبد الله বা "আল্লাহ্র দাস" তাঁর সর্বোত্তম গুণবাচক বিশেষণ, তাওরাতের উক্ত অধ্যায়ের নাম হলো **"সদা প্রভুর দাস ও তাঁহার সাধিত পরিত্রাণ"**। আমি নিম্নে অধ্যায়টি উদ্ধৃত করছি :

সদা প্রভুর দাস ও তাঁহার সাধিত পরিত্রাণ : ঐ দেখ, আমার দাস, আমি তাঁহাকে ধারণ করি, তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রাণ তাঁহাতে প্রীত; আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থাপন করিলাম, তিনি জাতিগণের কাছে ন্যায়বিচার উপস্থিত করিবেন। তিনি চীৎকার করবেন না, উচ্চ শব্দ করিবেন না, পথে আপন রব শুনাইবেন না। তিনি থেঁতলান নল ভাঙ্গিবেন না, সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না। সত্যে তিনি ন্যায়বিচার প্রচলিত করিবেন। তিনি নিস্তেজ হইবেন না, নিরুৎসাহ হইবেন না, যে পর্যন্ত না পৃথিবীতে ন্যায়বিচার স্থাপন করেন।... আমি সদাপ্রভু ধর্মশীলতায় তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, আর আমি তোমার হস্ত ধরিব, তোমাকে রক্ষা করিব; এবং তোমাকে প্রজাগণের নিয়মস্বরূপ ও জাতিগণের দীপ্তিস্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিব; তুমি অন্ধদিগকে চক্ষু দিবে, তুমি কারাকূপ হইতে বন্দীদিগকে ও কারাগার হইতে অন্ধকারবাসীদিগকে বাহির করিয়া আনিবে। আমি সদাপ্রভু, ইহাই আমার নাম। আমি আপন গৌরব অন্যকে, কিংবা আপন প্রশংসা ক্ষোদিত প্রতিমাগণকে দিব না। দেখ, পূর্ব্বকার বিষয় সকল সিদ্ধ হইল; আর আমি নূতন নূতন ঘটনা জ্ঞাত করি, অঙ্কুরিত হইবার পূর্বে তোমাদিগকে তাহা জানাই।... প্রান্তর ('আরব)ও তথাকার নগর সকল উচ্চৈঃস্বর করুক, কেদরের বসতি গ্রাম সকল তাহা করুক, পর্ব্বতগণের চূড়া হইতে মহানাদ করুক;... সদাপ্রভু বীরের ন্যায় যাত্রা করিবেন, যোদ্ধার ন্যায় উদ্যোগ উত্তেজিত করিবেন; তিনি জয়ধ্বনি করিবেন, হ্যাঁ, মহানাদ করিবেন;... যাহারা ক্ষোদিত প্রতিমাদিগতে নির্ভর করে, যাহারা ছাঁচে ঢালা প্রতিমাদিগকে বলে, তোমরা আমাদের দেবতা, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে, তাহারা নিতান্ত লজ্জিত হইবে।[৪১]

তাওরাতে বর্ণিত এ অধ্যায়ের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এর প্রতিটি কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণাবলীর সাথে খাপ খেয়ে যায়। সুতরাং এগুলো যে তাঁরই সম্পর্কে

৩৯. সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, *সীরাতুন নবী*, ৩য় খণ্ড, পৃ ৭৯৫

৪০. বাইবেল, *ইসাইয়া*, অধ্যায় ৪২

৪১. যিশাইয়, ৪২: ১-১৭

ভবিষ্যদ্বাণী, এতে কোনো সন্দেহ নাই? যে নবীর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এ অধ্যায়ের শুরুতে সর্বপ্রথমে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে :

১. তিনি আমার দাস অর্থাৎ বান্দা : 'ঐ দেখ আমার দাস'– দাস বা বান্দা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশিষ্ট বিশেষণ। বিশ্বজগতে তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল নামেই পরিচিত। এমনকি এ দুটি শব্দ উচ্চারণ না করা পর্যন্ত কোনো মুসলমানের নামাযই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। প্রত্যেককে নামাযে পড়তে হয় :

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُوْلُه

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও আল্লাহ্র রাসূল।"

বিভিন্ন নবী-রাসূলের বিভিন্ন উপাধি ছিলো; যথা– খলীলুল্লাহ্, কালীমুল্লাহ্, রূহুল্লাহ্ ইত্যাদি, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্রেষ্ঠ উপাধি হলো عبد الله বা 'আল্লাহ্র দাস'। তাঁর জীবনের গৌরবময় অধ্যায়সমূহের বর্ণনাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ নামেই উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা হলো মি'রাজ। মি'রাজে এই উপাধিতেই সম্বোধন করা হয়েছে :

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন।"[৪২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর কুর'আন অবতীর্ণ হওয়াও একটি মহান মর্যাদা। এ বর্ণনাতেও তাঁকে দাস বা বান্দা বলে সম্বোধন করা হয়েছে :

وَاِنْ كُنْتُمْ فِیْ رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا

"আর আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে।"[৪৩]

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ

"কতো মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন।"[৪৪]

২. তিনি আমার মনোনীত : এটি তাওরাতে বর্ণিত একটি বিশেষণ। 'মনোনীত' শব্দের 'আরবী হলো মুস্তাফা। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে মুস্তাফা নামে প্রসিদ্ধ এ কথা কে না জানে ? হাদীসে আছে : আল্লাহ্ তা'আলা ইসমা'ঈল (আ)-এর বংশে কিনানাকে, কিনানা গোত্রে কুরায়শকে, কুরায়শ বংশে হাশিম গোত্রকে এবং হাশিম বংশে আমাকে মনোনীত করেছেন।[৪৫]

---

৪২. আল-কুর'আন, ১৭ : ১

৪৩. আল-কুর'আন, ২ : ২৩

৪৪. আল্-কুর'আন, ২৫ : ১

৪৫. *জামি'উত্ তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ ২০১

৩. আমার প্রাণ তাঁহাতে প্রীত : এটি তাওরাতে বর্ণিত একটি বিশেষণ। তাঁর প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট ও প্রীত। শুধু তাঁর প্রতি কেনো তাঁর অনুসারীদের প্রতিও আল্লাহ্ সন্তুষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ۫

"মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল; এবং তাঁর সহচরগণ, কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ' ও সিজদায় অবনত দেখবেন।"[৪৬]

আল্লাহ্ তা'আলা আরোও বলেন,

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ

"আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।"[৪৭]

আল্লাহ্ তা'আলা আরোও বলেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট।"[৪৮]

৪. আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থাপন করিলাম : এটি তাওরাতে বর্ণিত একটি বিশেষণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ গুণটিও পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে :

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ

"আর এভাবে আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ্ তথা আমার নির্দেশ।"[৪৯]

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ

"বিশ্বস্ত আত্মা তথা জিব্রাঈল এটি (কুর'আন) নিয়ে অবতীর্ণ হলো।"[৫০]

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ

৪৬. আল-কুর'আন, ৪৮ : ২৯
৪৭. আল-কুর'আন, ৫ : ১১৯
৪৮. আল-কুর'আন, ৪৮ : ১৮
৪৯. আল-কুর'আন, ৪২ : ৫২
৫০. আল-কুর'আন, ২৬ : ১৯৩

"বলুন, আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে রূহুল কুদ্‌স জিব্‌রাঈল অবতীর্ণ করেছে।"[৫১]

৫) **তিনি চীৎকার করিবেন না, উচ্চ শব্দ করিবেন না, পথে আপন রব শুনাইবেন না :** এটি তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি বিশেষণ। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো অট্টহাসি দেননি; বরং মৃদু হাসতেন।[৫২] তিনি প্রায়শ নীরব থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না।[৫৩] জনৈক ব্যক্তি 'আয়েশা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, তিনি অশ্লীল কথা বলতেন না এবং হাটে-বাজারে কোলাহল করতেন না।[৫৪] হুসাইন (রা) 'আলী (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, তিনি হট্টগোল করতেন না।[৫৫]

৬) **তিনি খেঁতলান নল ভাঙ্গিবেন না, সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না। সত্যে তিনি ন্যায়বিচার পরিচালিত করিবেন :** এটি তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি বিশেষণ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

"অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"[৫৬]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ

"আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন; যদি আপনি কঠোর ও পাষাণ হৃদয় হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়তো।"[৫৭]

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক রাসূল আগমন করেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তোমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি উদগ্রীব। মু'মিনদের প্রতি তিনি দয়ালু ও কৃপাবান।"[৫৮]

---

৫১. আল-কুর'আন, ১৬ : ১০২
৫২. *জামি'উত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ ২০৫-২০৬
৫৩. *শামা'ইলুত তিরমিযী*, পৃ ১৪
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪
৫৬. আল-কুর'আন, ৬৮ : ৪
৫৭. আল-কুর'আন, ৩ : ১৫৯
৫৮. আল-কুর'আন, ৯ : ১২৮

'আয়েশা (রা) বলেন : তিনি কখনো কারো কাছ থেকে নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি; বরং ক্ষমা করতেন এবং অমনোযোগী ভাব প্রদর্শন করতেন। নিজ হাতে তিনি কাউকে প্রহার করেননি।[৫৯]

'আলী (রা) বলেন : তিনি সহাস্য বদন, কোমল স্বভাবী এবং দয়ার্দ্র ছিলেন। তাঁর মেজাজ কঠোর এবং অন্তর সঙ্কোচিত ছিলো না।[৬০]

৭) **তিনি নিস্তেজ হইবেন না, নিরুৎসাহ হইবেন না, যে পর্যন্ত না পৃথিবীতে ন্যায়বিচার স্থাপন করেন :** এটি তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি বিশেষণ। ন্যায়বিচার, সত্য ও ইসলামী শরী'আত সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহূর্তের জন্যও নিস্তেজ ও নিরুৎসাহিত হননি। তিনি আজীবন শরী'আত, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় পূর্ণোদ্যমে ব্রতী ছিলেন। ন্যায় ও সত্যের শাসন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি ইহজগত ত্যাগের অনুমতি পান।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا.

"যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে (অর্থাৎ মক্কা বিজিত হবে) এবং আপনি জনগণকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন তখন আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তো তাওবা কবূলকারী।"[৬১]

যিশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় এ সূরা থেকেও বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর ন্যায়শাস্ত্র ইসলাম জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করার অনুমতি পাননি। এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এক বান্দাকে ইহধামে অবস্থান করার এবং ইহধাম ত্যাগ করার ক্ষমতা দিয়েছেন; কিন্তু তিনি ইহধাম ত্যাগ করাই পছন্দ করেছেন। এ কথা শুনে আবূ বকর (রা) কাঁদতে থাকেন। কারণ, তিনি যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন।[৬২] 'উমর (রা) পরীক্ষার্থ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে এ সূরাটির মর্ম জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে বললেন, "এ সূরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের ইঙ্গিত রয়েছে।" 'উমর (রা)ও এ কথা সমর্থন করেন।[৬৩]

---

৫৯. *শামা'ইলুত তিরমিযী*, পৃ ১৫

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

৬১. আল-কুরআন, ১১০ : ১-৩

৬২. *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ ৭৪২

৬৩. *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ ৭৪৩; *জামি'উত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৭৪

৮) **আমি সদাপ্রভু ধর্মশীলতায় তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, আর আমি তোমার হস্ত ধরিব, তোমাকে রক্ষা করিব:** এটি তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি বিশেষণ। এ প্রতিশ্রুতিও আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে পূর্ণ করেছেন। সারা 'আরব যখন তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ালো, যখন এক আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনো সহায় ছিলো না তখনো তিনি তাঁকে শত্রুদের মারাত্মক ষড়যন্ত্র, প্রবল আক্রমণ এবং বিপজ্জনক অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন। যখন মক্কা নগরীতে শত্রুতার প্রবল দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছিলো তখন কুর'আন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা যিশাইয়ের কিতাবে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিটি পুনরাবৃত্তি করে বলেন,

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ

"আপনি স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার প্রভু লোকদেরকে (শত্রুদেরকে) সর্বদিক দিয়ে পরিবেষ্টন করে আছেন, যেনো তারা আপনার উপর হাত উঠাতে না পারে।"[৬৪]

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا

"আপনি ধৈর্যের সাথে স্বীয় প্রভুর নির্দেশের প্রতীক্ষা করুন; কেননা আপনি আমার চোখের সামনে (রক্ষণাবেক্ষণে) আছেন।"[৬৫]

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

"আর আল্লাহ্ তা'আলা লোকদের (শত্রুদের) থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন।"[৬৬]

সাহাবীগণ নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুস্পার্শ্বে পাহারারত ছিলেন। যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো তখন তিনি তাঁর শিবির থেকে মাথা বের করে তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমরা প্রত্যাবর্তন করো, আর পাহারার প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আমাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"[৬৭]

৯) **তোমাকে প্রজাগণের নিয়মস্বরূপ ও জাতিগণের দীপ্তিস্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিব; তুমি অন্ধদিগকে চক্ষু দিবে, তুমি কারাকূপ হইতে বন্দীদিগকে ও কারাগার হইতে অন্ধকারবাসীদিগকে বাহির করিয়া আনিবে :** তাওরাতে বর্ণিত এই সুসংবাদগুলোও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে।

কুর'আন মাজীদেও এই সুসংবাদগুলোর কথা এভাবে ঘোষণা করেছেন,

---

৬৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৬০

৬৫. আল-কুরআন, ৫২ : ৪৮

৬৬. আল-কুরআন, ৫ : ৬৭

৬৭. *জামি'উত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৩৫

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿٤٥﴾ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا

"হে নবী, আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-রূপে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।"[৬৮]

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহ্‌মতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[৬৯]

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

"হে মুহাম্মদ, এই কিতাব যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি তাতে আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রভুর নির্দেশক্রমে, বের করে আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোকে।"[৭০]

১০) আমি সদাপ্রভু, ইহাই আমার নাম। আমি আপন গৌরব অন্যকে, কিংবা আপন প্রশংসা ক্ষোদিত প্রতিমাগণকে দিব না। ... যাহারা ক্ষোদিত প্রতিমাদিগেতে নির্ভর করে, যাহারা ছাঁচে ঢালা প্রতিমাদিগকে বলে, তোমরা আমাদের দেবতা, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে, তাহারা নিতান্ত লজ্জিত হইবে : এই ভবিষ্যদ্বাণীও যে মুহাম্মদ (সা) সম্বন্ধে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা যিশাইয়ের পর একমাত্র তিনিই পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের সুস্পষ্ট ও পূর্ণতম শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই পৌত্তলিকদেরকে পরাস্ত করে পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটন করত ধরণীবক্ষে তওহীদের পতাকা উন্নত করেছেন। আর যিশাইয়ের পরে যদি কোনো রাসূল অসি ধারণ করে থাকেন তবে তিনি হলেন বদর, ওহুদ, হুনায়ন এবং খন্দকের সেনাপতি মুহাম্মদ (সা)।

১১) প্রান্তর ('আরব) ও তথাকার নগর সকল উচ্চৈঃস্বর করুক, কেদরের বসতি গ্রাম সকল তাহা করুক, পর্ব্বতগণের চূড়া হইতে মহানাদ করুক : তাওরাতের এই বাক্যটিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, প্রতীক্ষিত রাসূলের জন্মস্থান হবে মরুভূমি এবং তিনি ইসমা'ঈল (আ)-এর পুত্র কেদরের বংশদ্ভূত হবেন। আর তিনি তাঁর ধর্ম কেদর বংশীয় লোকদের (কুরায়শদের) লোকালয়ে প্রচার করবেন। এ রাসূল যদি মুহাম্মদ (সা) না হন, তবে তিনি কে? 'ঈসা (আ) কেদর বংশের নন; বরং তিনি হলেন ইস্‌রা'ঈল বংশের। যে ব্যক্তি এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি বাক্য কুর'আনে কারীম, হাদীস শরীফ এবং নবীচরিতের সাথে মিলিয়ে দেখবেন তিনি এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মুহাম্মদ (সা) সম্বন্ধেই এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো করা হয়েছে।

শায়খ 'আলী ইব্‌ন বুরহানুদ্দীন হলবী বলেন, তাওরাতে আছে :

৬৮. আল-কুরআন, ৩৩ : ৪৫-৪৬

৬৯. আল-কুরআন, ২১ : ১০৭

৭০. আল-কুরআন, ১৪ : ১

لَا يَزَالُ الْمُلْكُ فِي يَهُوْدٍ إِلَى أَنْ يَّجِيءَ الَّذِيْ تَنْتَظِرُ إِيَّاهُ الْأُمَمُ.

"বিশ্বের সব জাতি যে মহাপুরুষের প্রতীক্ষা করছে তাঁর আবির্ভাব পর্যন্ত ইয়াহূদীদের মধ্যে রাজত্ব (প্রতাপ) থাকবে।"[৭১]

বিশ্বের সব জাতি যে মহাপুরুষের আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছে, তিনি যে মুহাম্মদ (সা), এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা একমাত্র তিনিই বিশ্বজগতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এ উজ্জ্বল সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য ইয়াহূদীরা বলে যে, এ ভাবী মহাপুরুষ হলেন ইঊশা' (আ) এবং খ্রিস্টানরা বলে যে, তিনি হলেন 'ঈসা (আ)। উভয় সম্প্রদায়ের স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থই তাদের এই দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।

কেননা তাওরাতে আছে :

إِنَّ اللهَ رَبَّكُمْ يُقِيْمُ نَبِيًّا مِّنْ إِخْوَتِكُمْ مِثْلِيْ لَه تَسْمَعُوْنَ.

"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ (আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্মগ্রন্থ ও স্বতন্ত্র শরী'আত প্রাপ্ত) এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করবে।"[৭২]

ইঊশা' (আ) -এর উপর কোনো ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়নি; এমনকি তিনি স্বতন্ত্র শরী'আতপ্রাপ্তও হননি। তিনি শুধু বনী ইস্রাঈলের মধ্যে মূসা (আ)-এর শরী'আত প্রচার করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। অথচ তিনি ইস্রা'ঈল বংশের ছিলেন। তাদের ভাই ইসমা'ঈল বংশের ছিলেন না।

তাওরাতে আরো আছে :

إِنَّ اللهَ يُقِيْمُ نَبِيًّا مِّنْ إِخْوَتِكُمْ

"আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক নবীর উদ্ভব ঘটাইব এবং তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব।"[৭৩]

'ঈসা (আ) ও ইসমা'ঈল বংশের ছিলেন না; বরং তিনি ইস্রা'ঈল বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মুহাম্মদ (সা) ইস্মা'ঈল বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীও তাঁর সম্পর্কেই করা হয়েছিলো।

তাওরাতে আছে : "আর ঈশ্বরের লোক মোশি মৃত্যুর পূর্ব্বে ইস্রায়েল সন্তানগণকে যে আশীর্বাদে আশীর্বাদ করিলেন, তাহা এই।

---

৭১. শায়খ 'আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন হলবী, *আস্-সীরাতুল হালাবিয়্যা* (মিসর: মাত্বা'আতুল ইসলামিয়্যা, ১৩২৮ হি), ১ম খণ্ড, পৃ ২৩৭

৭২. *তাওরাত*, দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ : ১৫

৭৩. *তাওরাত*, দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ : ১৮

جَاءَ اللهُ مِنْ طُوْرِ سِيْنَاءَ وَظَهَرَ بِسَاعِيْرٍ وَاُعْلِنَ بِفَارَانَ

তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশিত করিলেন ...।"[৭৪]

এটি মূসা (আ)-এর শেষ অসিয়্যত এবং তাওরাতের শেষ বাণী। এ বাণীতে শেষ নবীর আবির্ভাবের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। শায়খ 'আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন বলেন, "এ বাণীতে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা, 'ঈসা (আ) এবং মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করার সুসংবাদ দিয়েছেন। মূসা (আ) তূরে সায়না পর্বতে নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সে স্থানেই তাঁর উপর তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে। 'ঈসা (আ) সা'ঈর পাহাড়ে নাসেরাত শহরে বাস করতেন। সেখানেই তাঁর উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়েছে। আর মুহাম্মদ (সা) পারণ (ফারান, মক্কার পাহাড়ে) অর্থাৎ মক্কা নগরে নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হন[৭৫] এবং সেখানেই তাঁর উপর কুর'আন মাজীদ অবতীর্ণ শুরু হয়।"[৭৬]

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আত্-তীনে তাওরাতের এ সুসংবাদের পুনরোক্তি এভাবে করেছেন :

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ * وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ * وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ *

"শপথ 'আন্জীর' ও 'যায়তূন' ফলের, শপথ সিনাই পাহাড়ের এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর।"[৭৭]

'ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান এবং তাঁর নুবুওয়াতের লীলাভূমি প্যালেষ্টাইন যে আন্জীর ও যায়তূন ফলের দেশ, একথা কারো অবিদিত নয়। প্যালেষ্টাইনের সা'ঈর পাহাড়ের নাসেরাত শহরেই তাঁর জন্মস্থান। *তূর সায়না* মূসা (আ)-এর নুবুওয়াত ও *তাওরাত* প্রাপ্তিস্থান। আর 'এই শান্তিপূর্ণ শহর' অর্থাৎ মক্কা মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মভূমি এবং নুবুওয়াত ও কুর'আন প্রাপ্তিস্থান।

এছাড়াও বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম'-এর হবক্কুক ভাববাদীর পুস্তকের ৩য় অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে বর্ণিত : "ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্ব্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। আকাশমণ্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্যশংসায় পরিপূর্ণ।"[৭৮]

J Hastings প্রণীত বাইবেল অভিধানে আছে, 'তৈমন' মদীনা মুনাওয়ারার উত্তরে অবস্থিত একটি মরূদ্যান। এ শ্লোকটির অর্থ হলো : পারণ পর্বত (অর্থাৎ মক্কা) থেকে হিজরত করে তৈমনে (অর্থাৎ মদীনায়) আগত পবিত্রতম ব্যক্তি মুহাম্মদ (প্রশংসিত) ব্যতীত আর কেউ নন যার প্রশংসায় পরিপূর্ণ।

---

৭৪. *তাওরাত*, দ্বিতীয় বিবরণ, ৩৩ : ১-২

৭৫. সুলাইমান নদবী, *সীরাতুন নবী*, ৩য় খণ্ড, পৃ ৮২৪

৭৬. শায়খ 'আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৭

৭৭. আল-কুরআন, ৯৫ : ১-২

৭৮. *হবক্কুক*, ৩ : ৩

মুসলিম চরিতকারগণ নবীচরিতের গ্রন্থগুলোতে তাওরাত ও ইঞ্জীল থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শুভাগমনের বহু ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন। হযরত মূসা ও 'ঈসা (আ)-এর পর থেকে ইসলামের অভ্যুদয় পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জীলে যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধিত হয়েছে, পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে বিশদভাবে এগুলোর উল্লেখ আছে। ইসলামের সত্যতা যেনো প্রমাণিত হতে না পারে এজন্য ইসলামের অভ্যুদয়ের পর থেকে অদ্যাবধি এ আসমানী গ্রন্থদ্বয়ে বহু বিকৃতি সাধিত হয়েছে। কাজেই বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে চরিতকারদের উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পাওয়া না-ও যেতে পারে। সুতরাং পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর প্রতি পরিষ্কার ইঙ্গিত রয়েছে তন্মধ্য থেকে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করলাম।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুর'আন একই প্রদীপের আলো।[৭৯] তাওরাত ও ইঞ্জীলের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা সম্যকরূপে সর্বশেষ নবীর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা অকপটে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো এবং তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত রাসূল কি না, তা তারা নানা উপায়ে পরীক্ষা করতো। অতঃপর বিনা দ্বিধায় তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করতেন। এতেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইয়াহূদী, খ্রিস্টানরা ইসলামের বিরুদ্ধে মনগড়া অনেক মিথ্যা কথা বলতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আসমানী গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে তাদের এ ধরনের মিথ্যাচারকে সকলের নিকট স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

৭৯. *মুসনাদ আহ্মাদ*, ১ম খণ্ড, পৃ ২০২

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

সাহাবাদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আকীদা

ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান*

[Abstract: Companions (Sahabi's) directly gether knowledge from the holy Prophet (sm) taught the religion of Islam through the Qur'an and Hadith. Angel Jibraeel (A) from Allah used to bring (Wahi) revelations (orders) to the Prophet (sm). In terms of belief in Islam the importance of the Prophet (sm) is second only to his Sahabi's. Sahabi's are second only to the Prophet (sm)in terms of righteousness and truth. The hearts of the Sahabi's were peaceful and their tongues were pure. Followed by the Sahabi's "Ahlus Sunnah wa Jamaat". The belief of "Ahlus Sunnah wa Jamaat" is hundred percent correct.]

ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যেক সাহাবীই ন্যায়পরায়ন। তাঁদের ন্যায়পরায়নতার বিষয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা') বা ঐক্যমত রয়েছে। ওহীলব্ধ জ্ঞানের কারণে সাহাবাগণের অন্তর ছিলো শান্তিপূর্ণ ও যবান পবিত্র। সাহাবাদের প্রতি ঘৃণাপোষণ করা কুফুরী, মুনাফেকি ও সীমালঙ্ঘন। সাহাবাগণ আল্লাহর বন্ধু ও তাঁর গুণেগুণান্বিত, সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং আমলের সালেহের কবুল হওয়ার কারণে সাহাবাগণও তাঁর উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ ও রাসূল (সা) তাঁদের পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়নতার প্রশংসা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যেক সাহাবী জান্নাতী। তাঁদের কেহই এক মুহূর্তের জন্যও জাহান্নামে যাবে না। নিম্নে "সাহাবাদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আকীদা" শীর্ষক শিরোনামে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হলো।

صَحَابِي (সাহাবী)-এর পরিচিতি

صَحَابِي (সাহাবী) শব্দটি صَحَابَة (সাহাবা) শব্দের এক বচন। যা صحبة (সুহবাতুন) শব্দ হতে উৎকলিত। অর্থ-সাথী, সঙ্গী, সহচর,[১] সাহচর্যে অবস্থানকারী, رفيق، صديق، ودود، حبيب Companionship, Comrade, Friend, প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১ ড. মাহমূদ আত্-ত্বহান : ***তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস,*** (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪০৩ হি.) পৃ. ১৯৭; ড. রুহী আল-বা'লাবাকী : ***আল মাওরিদ***, দারুল ইলম (বৈরুত, লেবানন, ৭ম সংস্করণ-১৯৯৫ইং), পৃ. ৬৮৭।

২ ড. রুহী আল-বা'লাবাকী : ***আল মাওরিদ***, ৭ম সংস্ক, (বৈরুত-লেবানন : দারুল 'ইলম, ১৯৯৫ইং), পৃ. ৬৮৭; ***মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা***, (পাকিস্থান : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূম আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪০১ হি.), পৃ. ২৭১।

পরিভাষায় : من لقي النبي ﷺ مؤمنا به ومات على الإسلام "যিনি ঈমানসহকারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে সাহাবী বলা হয়।"[৩] যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাত লাভ করলেও ঈমান আনেনি তারা সাহাবী নয়। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহচার্য্য লাভ করেছেন অথবা তাকে দিনের বেলা এক মুহূর্তের জন্য হলেও দেখে ঈমান এনেছেন, তিনি তাঁর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত।[৪] পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের পরিচয় এক ও অভিন্ন।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত (أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ)-এর পরিচিতি

আহল (أَهْلُ) অর্থ: পরিবার, পরিজনবিশিষ্ট, একান্নবর্তী সংসার, বসতিপূর্ণ বা বাসিন্দাপূর্ণ। আর سُنَّة (সুন্নাত) এক বচন, বহুবচনে سُـنَنٌ (সুনান)। এর আভিধানিক অর্থ: প্রথা, পদ্ধতি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র, অভ্যাস, কর্মপন্থা, তরীকা ইত্যাদি।[৫] চাই সেই পথ ও কর্মের পদ্ধতিটা উত্তম অথবা মন্দ হোক।[৬] سُنَّة 'সুন্নাত' শব্দটি নিয়ম-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, অভ্যাস ও পথ প্রভৃতি।

যে পন্থা ও রীতি মহানবী (সা) অবলম্বন করতেন, তাই سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ (রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাত)। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক প্রচারিত যে অনুপম আদর্শ, আচার-আচরণ তাই 'সুন্নাত'।[৭] কুরআন শরীফে أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'মহত্তম আদর্শ'[৮] বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে।[৯] আল-কুরআনে বর্ণিত[১০] سُنَّةُ اللهِ 'আল্লাহর সুন্নাত' বলতে, আল্লাহর আনুগত্য করার নিয়ম পদ্ধতিকে বুঝায়।[১১] এই নিয়ম পদ্ধতি বলতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আচার-আচরণ ও

---

৩ ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী : ***আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা***, খ. ১ম, ১ম প্রকাশ, (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ০৭-০৮।

৪ ইব্ন হাজার আসকালানী : ***ফাতহুল বারী***, খ. ৭, পৃ. ৫।

৫ ইব্ন মানযূর : ***লিসানুল 'আরব***, খ. ৬ষ্ঠ, ৩য় সং (বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী), পৃ. ৩৯২।

৬ ড. 'উজাজ আল-খতীব : ***'উসূলুল হাদীস***, (বৈরূত : দারুল ফিক্র ১৪২১/২০০১), পৃ. ১৩।

৭ ইমাম রাগেব আল-ইস্পাহানী, হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ফদল : ***আল-মুফরাদা'ত ফী গারীবিল কুরআন***, (মিশর : আল-মাতবা'আতুল মায়মুনিয়্যাহ, ১৩২৪ হি.), পৃ. ২৪৫।

৮ আল্লাহ বলেন : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (সূরাতুল আহ্যাব: ২১); إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (সূরা কলম :০৪)।

৯ মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ : ***মুসলিম শরীফ***, খ.১ম, ভূমিকা অংশ, ৩য় সং (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৪২৩/২০০২), পৃ. ০৯।

১০ আল্লাহ তা'আলার বাণী : سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْ مِنْ قَبْلُ সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত নং ৬২।

১১ মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম : ***সুন্নাত ও বিদ'আত***, ৭ম প্রকাশ (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭),পৃ.০৩।

আদর্শকেই বুঝায়। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ ও আনুগত্য মুসলিম জাতির জন্য 'ফরয' বা আবশ্যক।[১২] যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি নিজের বাস্তব জীবনে মেনে চলেন, তাদেরকে أَهْلُ السُّنَّةِ 'আহ্লুস্ সুন্নাহ' অথবা سُنِّيٍّ (সুন্নী) বলা হয়।[১৩]

অনুরূপভাবে Encyclopaedia of Religion গ্রন্থে বলা হয়েছে The Sunnite is the follower of the sunnah or The view and usage if the prophet (sm) "সুন্নতের অনুসারী অথবা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর রীতি-নীতির অনুসারীদেরকে 'সুন্নী' বলা হয়।"[১৪] জামা'আত প্রসংগে আল্লাহ বলেন : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু (কুরআন ও ইসলাম) দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।"[১৫] অপর আয়াতে বলেন: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ "তোমরা তাদের মতো হইও না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে।"[১৬] "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত" প্রসংগে 'আল্লামা ইরাকী তাঁর تخريج أحاديث الإحياء কিতাবে উল্লেখ করেন:

افتراق الأمة وفيه "الناجي منهم واحدة" قالوا: ومن هم؟ قال "أهل السنة والجماعة" فقيل: ومن أهل السنة والجماعة؟ قال "ما أنا عليه وأصحابي"

"রাসূল (সা)-এর উম্মত বিভিন্ন দলের বিভক্তির মধ্যে মাত্র একটি দল মুক্তি পাবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দল? তিনি বলেন: أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত'। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' কারা? তিনি বললেন: আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।"[১৭]

মূলত এ হাদীসটি 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর সূত্রে রাসূল (সা) বলেছেন:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

---

১২ যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ দ্র.- ***সূরাতুল আনফাল*** : ২০।

১৩ ইব্রাহীম মাদকূর : ***আল-মু'জামূল ওয়াসীত***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬

১৪ ***Encyclopaedia of Religion***, vol-12, P-114.

১৫ আল-কুরআন : ৩ ***সূরা আলে 'ইমরান***, আয়াত নং ১০৩।

১৬ আল-কুরআন : ৩ ***সূরা আলে 'ইমরান***, আয়াত নং ১০৫।

১৭ 'আল্লামা ইরাকী : تخريج أحاديث الإحياء , হাদীস নং ৩২২১, খ. ৭ম, পৃ. ২৯৬। হাদীসটির وأسانيدها جياد "সনদ অনেক উত্তম।"

"বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিলো। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। কেবলমাত্র একটি দল ছাড়া তাদের সবাই দোযখী হবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দল? তিনি বলেন: আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।"[১৮] আর أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীদের পদ্ধতির অনুসরণ করেন বিধায় তাঁদের এ নামকরণ করা হয়। তাঁরা ঈমান এনেছে এক আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, রেসালতের প্রতি, মৃত্যু পরবর্তী উত্থানের প্রতি আর বিশ্বাস করে তাকদীরের উপর ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়[১৯] এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শ ও কর্মপদ্ধতি নিজেদের বাস্তব জীবনে (জামা'আত) সম্মিলিতভাবে হুবহু পালন করে থাকেন। তাই তাঁদেরকে "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত" বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) যা নিয়ে এসেছেন, যা করেছেন ও যেসকল বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করে অন্তর থেকে স্বীকৃতি দিয়ে বাস্তব জীবনে 'আমল করেন। আর যা নিষেধ করেছেন তা বিনা যুক্তিতে বর্জন করেন[২০] তাঁরাই মূলত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত।[২১]

সাহাবাদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আকীদা

সাহাবা সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের 'আকীদা হলো: রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণ রাসূল (সা) কে অন্তর দিয়ে ভালো বাসতেন। আর তাঁদের কলব বা অন্তর ও যবান পাক-পবিত্র। কেননা সাহাবাগণ প্রত্যেকেই كانوا أكمل الناس إيمانا، وإحسانا "পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার ও দয়াবান ছিলেন" এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বোচ্ছ আনুগত্য ও জিহাদ করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 'সাহাবী' হিসেবে নির্বাচন করেছেন।"[২২] সাহাবীগণ পূর্ণ আদালত বা ন্যায়পরায়নতার অধিকারী ছিলেন।

---

১৮ ***সুনানুত তিরমিযী***, كِتَاب الْإِيمَانِ অনুচ্ছদ- مَا جَاءَ فِي افْتِرَاقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ, হাদীস নং ২৫৬৫; ***সুনানু ইব্ন মাজা***, كِتَاب الْفِتَنِ অনুচ্ছদ- بَاب افْتِرَاقِ الْأُمَمِ, হাদীস নং ৩৯৮৩; ***সুনানু আবী দাউদ***, كِتَاب السُّنَّةِ অনুচ্ছদ- بَاب شَرْحِ السُّنَّةِ, হাদীস নং ৩৯৮০; ***মুসনাদু আহমদ***, হাদীস নং ১৬৩২৯, খ. ৩৪, পৃ. ২৯২; ***সহীহ ইব্ন হিব্বান***, অনুচ্ছদ- ذكر افتراق اليهود والنصارى فرقا مختلفة, হাদীস নং ৬৩৫৩, খ. ২৬, পৃ. ৩৪।

১৯ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল ওহ্হাব : ***উসূলুল ঈমান***, খ. ১ম, (সৌদি 'আরব : ওয়াযারাতুস শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ০৮।

২০ ড. খোন্দকার 'আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর : ***ইহ্ইয়াউস সুনান***, ৩য় সং (ঢাকা : ইশা'আতে ইসলাম কুতুব খানা, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ৬৮।

২১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) ১ম সং, খ. ১ম, (সৌদি 'আরব : ওয়াযারাতুস শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২২ হি.), পৃ. ১২৫।

২২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح ১ম সং, খ. ১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩। মূল 'আরবী :

حُب أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبهم وأَلسنتهم تجاههم ؛ لأَنهم كانوا أكمل الناس إيمانا ، وإحسانا ، وأَعظمهم طاعة وجهادا ، وقد اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد

শরীয়তের পরিভাষায় বহুল ব্যবহৃত শব্দটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় উসূলে হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে। 'আদালাত (عَدَالَتٌ) অর্থ: ন্যায়পরায়নতা, যথার্থতা, সত্যতা ইত্যাদি। عدل শব্দটির ব্যাখ্যা হলো: প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী মুসলমান হওয়া এবং যাবতীয় পাপ ও মাহাত্ম্য বিরোধী আচরণ থেকে মুক্ত থাকবে। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায়: 'আদালাত সেই সুদৃঢ় শক্তির নাম, যার মাধ্যমে মানুষ দ্বীন ইসলামের উপর পূর্ণাঙ্গ অটল ও অবিচল থেকে তাকওয়া, আখলাক ও মুরুওয়াত আবলম্বন করতে এবং অন্যায় ও মিথ্যা আচরণ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।[২৩] আদালত বলতে শরী'আতের নিষিদ্ধ এবং ভদ্রতা ও শালীনতা বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া।[২৪]

সাবাহাগণের 'আদালাত বা ন্যায়পরায়নতা প্রসংগে ইমাম নববী (রহ) লিখেছেন:

الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ مَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ وَغَيْرُهُمْ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ.

"যে সকল সাহাবা মতবিরোধের গোলযোগে জড়িয়ে পড়েছিলেন তারা এবং অন্যরা, সকলেই 'আদেল বা ন্যায়পরায়নতার বিষয়ের উপর যাদের মাতামত গ্রহণযোগ্য তাদের সকলের ইজমা' বা ঐক্যমত রয়েছে।"[২৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا "এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি।"[২৬] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতকে وسط (ওয়াসাত) গুণ দ্বারা বিশিষ্ট করেছেন। (وَالْوَسَطُ هُوَ الْعَدْلُ) 'ওয়াসাত' এর অর্থ হলো عُدُولًا বা ন্যায়পরায়নতা।[২৭] সুতরাং সকল সাহাবীই ন্যায়পরায়ন[২৮] বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ ইজমা' বা ঐক্যমত হয়েছেন।

امتازوا بشيء لم يستطع أَن يدركه أَحد ممن بعدهم مهما بلغ من الرفعة ؛ أَلا وهو التشرف برؤية النَّبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته .

২৩ ড. সুবহী সালিহ : ***'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু***, বৈরূত : দারুল 'ইল্‌ম লিল-মালাইন, ২৫শ সং, ২০০২), পৃ. ১২৯; ড. মুহাম্মদ আদীব সালিহ : ***লামহাতু ফী উসূলিল হাদীস***, ৫ম সং, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৯/১৯৮৮), পৃ.১১১।

২৪ মুফতী 'আমীমুল ইহ্‌সান : ***হাদীস সংকলনের ইতিহাস***, অনু. মাওলানা মোঃ ইউসুফ, (ঢাকা : ইসলামী একাডেমী, ১৪১১ হি.), পৃ. ৩৯।

২৫ আবুল হাসান আল-মালেকী : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني, খ. ১ম, (প্রকাশনা অনুল্লেখ. তা.বি), পৃ. ৩৪৭।

২৬ আল-কুরআন : ২ ***সূরা বাকারা***, আয়াত নং : ।১৪৩

২৭ ***সহীহুল বুখারী***, بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى : وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ -كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ অনুচ্ছেদ- হাদীস নং ৩০৯১ ও ৪১২৭।

সাহাবীগণের ন্যায়পরায়নতার প্রসংগে মুহাম্মদ খলীল হিরাস شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية গ্রন্থে শাইখুল ইসলাম 'আল্লামা ইব্‌ন তাইমিয়া (রহ) লিখেছেন:

ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله تعالى في قوله: **وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ**.... ألآية

"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মৌল 'ইতিকাদ বা বিশ্বাস হলো : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবাগণের অন্তর শান্তিপূর্ণ (ওহীলব্ধ জ্ঞানের কারণে) ও যবান পাক-পবিত্র।[২৯]

আল্লাহ তা'আলা তাঁদের গুণের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন :

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"এবং তাদের পরবর্তী লোকেরা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আামাদের সেই ভাইদের ও যারা ঈমান গ্রহণে আমাদের পূর্ববর্তী হয়েছেন এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেনো বিদ্বেষ না থাকে।"[৩০]

সাহাবীদের সম্পর্কে আকীদা বর্ণনায় 'আলিমগণ একটি সাধারণ বাক্য ব্যবহার করেন। তা হলো:

أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ

"নিশ্চয়ই প্রত্যেক সাহাবীই ন্যায়পরায়ন।"[৩১]

সাহাবী আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) তাঁর বর্ণনায় বলেন:

أَنَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ثقات

"নিশ্চয়ই রাসূল (সা)-এর প্রত্যেক সাহাবীই ন্যায়পরায়ন বিশ্বস্ত।"[৩২]

---

২৮ মুখতার আয যমখশারী : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع খ. ৪র্থ, (প্রকাশনা অনুল্লেখ. তা.বি), পৃ.৩৪২।

২৯ মুহাম্মদ খলীল হিরাস : شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ১ম সং, খ. ১ম, (আর-রিয়াসাতুল 'আম্মাহ লি-ইদারাতিল বুহুসিল 'ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতায়ে ওয়াদ-দা'ওয়াতি ওয়াল ইরশাদ, তা.বি), পৃ. ১৩৪।

৩০ সূরা আল-হাশর, আয়াত নং ১০।

৩১ ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী : ***ফাতহুল বারী***, খ. ১১, হাদীস নং ৫০৮০, খ. ১৫, পৃ. ৪৪৫।

৩২ ***সহীহ ইব্‌ন হিব্বান***, খ. ১১, হাদীস নং ২৭৮৮, পরিচ্ছেদ- ذكر لفظة توهم غير المتبحر في صناعة العلم, পৃ. ৪৪৬।

عدول শব্দটি عدل এর বহুবাচন। عدل শব্দটি মূলত মাসদার বা ক্রিয়ামূল। অর্থ- সমান ভাগ করা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে عدل অর্থ: সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি।

عدل শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসংগে الدر المختار এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে 'আল্লামা ইব্ন আবেদীন লিখেছেন :

العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة بالغلبة أو الإصرار على الصغائر فتصير كبيرة ولذا قال غلب صوابه، قوله (سقطت عدالته) و تعود إذا تاب... إلخ

"আদল বা ন্যায়পর এমন ব্যক্তি, যে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত থাকেন। এমনকি একটি মাত্র কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলেও عدالة ও ন্যায়পরায়নতা রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ছাগীরা গুনাহের ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যের দিকটি বিবেচ্য। তবে কোন একটি ছগীরার বারংবারতা কবীরা হিসেবে গণ্য হবে। এজন্যই গ্রন্থকার غلب صوابه বলে পুণ্যকর্ম প্রবল হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। তবে আদালত বা ন্যায়পরায়নতা রহিত হওয়ার পর তাওবার মাধ্যমে তা পুনঃবহাল হতে পারে।"[৩৩]

পরকালের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ই'তিকাদ (বিশ্বাস বা অভিমত) হলো: রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যেক সাহাবী জান্নাতী। তাঁদের কেহই জাহান্নামে এক মুহূর্তের জন্যও জাহান্নামে যাবে না। এ প্রসংগে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) কিতাবে উল্লেখ করেন :

ولا يدخل النَّار أَحد من الصحابة بايع تحت الشجرة؛ بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه،

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে একজন সাহাবীও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তাঁরা (হুদায়বিয়ার সন্ধিতে)[৩৪] গাছের নীচে (রাসূলুল্লাহ্র হাতে) শপথ করেছেন। তাঁদের উপর

---

৩৩ ইবনু 'আবিদীন আশ শামী : الدر المختار (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা. বি), পৃ. ৫২২।

৩৪ হুদায়বিয়ার সন্ধি : ২২ শে মার্চ, ৬২৭ খ্রি. হতে ১১ই মার্চ ৬২৮খ্রি. পর্যন্ত সময়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে হুদায়বিয়ায় গমণ করেন এবং ১২ই যিলহজ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মদীনায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায় চৌদ্দশত সাহাবী সাথে নিয়ে মক্কায় হজ্জ করতে রওনা হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সকলকে অস্ত্র নিতে নিষেধ করলেন। কারণ, যাতে কুরাইশরা মনে করতে না পারে যে, মুসলমানগণ হজ্জের অযুহাতে যুদ্ধ করতে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা মসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) "হুদাইবিয়া" নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এস্থান হতে দূত পাঠিয়ে কুরাইশদেরকে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানাবেন যে, তাঁরা যুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে আসেন নাই শুধু পবিত্র হজ্জব্রত পালনের

অবশ্যই আল্লাহ সন্তুষ্ট।"[৩৫] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যেক সাহাবী জান্নাতী হওয়া প্রসংগে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

জাবের (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন, "যাঁরা গাছের নীচে শপথ করেছেন এমন একজন সাহাবীও জাহান্নমে প্রবেশ করবে না।"[৩৬] অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ "যাঁরা গাছের নীচে শপথ করেছেন, তাঁরা অবশ্যই অবশ্যই জান্নাতী।"[৩৭]

এ প্রসংগে ইব্ন হাযম (রহ) বলেন:

الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا قال تعالى: (لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى) وقال تعالى: (اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ) فثبت أن جميعهم من أهل الجنة.

"সকল সাহাবা নিশ্চিতরূপেই জান্নাতী। কেননা আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো, "তোমাদের মাঝে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে এবং যারা মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর পথে জান-মাল খরচ করেছে, তারা (উভয়ে) সমান হতে পারে না। বরং পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের চেয়ে মর্যাদায়

উদ্দেশ্যেই এসেছেন। উসমান (রা.)-কে পাঠান হলো। মুসলমানদের মধ্যে গুজব রটলো যে, কুরাইশরা উসমানকে হত্যা করে ফেলেছেন। এ খবরটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কানেও আসল। তিনি শুনে খুব ব্যাথিত হলেন। সাহাবাগণ উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরি হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সমস্ত লোককে একটি বৃক্ষের নিকট সমবেত করে শপথ গ্রহণ করতে লাগলেন। দ্র.- ড. মো. এমতাজ হোসেন ও ড. মোহা. জাহাঙ্গীর হোসেন : ***মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস***, (ঢাকা : মঞ্জুয়ারা খাতুন ২০০৯ খ্রি.) পৃ. ৯৬।

৩৫ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

৩৬ ***সুনানু আবী দাউদ***, كِتَاب অনুচ্ছেদ- بَاب فِي الْخُلَفَاءِ, হাদীস নং ৪০৩৪; ***সুনানুত তিরমিযী***, كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ- بَاب فِي فَضْلِ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, হাদীস নং ৩৭৯৫; ***মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল***, হাদীস নং ১৪২৫১; ১৫৭৯৩; ***আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ***, হাদীস নং ১৫০৮; ***সহীহ ইব্ন হিব্বান***, অনুচ্ছেদ- ذكر البيان ، بأن شهود الحديبية إنما كان البيعة تحت الشجرة, হাদীস নং ৪৮৮৯।

৩৭ ***সুনানুত তিরমিযী***, অনুচ্ছেদ- بَاب فِيمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ, হাদীস নং ৩৭৯৮।

মহান। তবে সকলকেই আল্লাহ উত্তম ওয়াদা দিয়েছেন।"[৩৮] অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, "যাদের জন্যে আমার পক্ষ থেকে পূর্ব হতেই উত্তম বস্তুর ওয়াদা হয়েছে নিঃসন্দেহে তাঁদেরকে জাহান্নাম হতে দূরে রাখা হবে।"[৩৯]

সাহাবাগণের মধ্যে মর্যাদাগত দৃষ্টিকোন থেকে العَشَرَةُ المُبَشَّرَةُ 'জান্নাতে সু-সংবাদপ্রাপ্তগণ' অগ্রগণ্য।[৪০] সেই দশজন সৌভাগ্যবান মর্যাদাবান সাহাবী হলেন: চার খলিফা হযরত আবূ বকর, 'উমর, 'উসমান ও 'আলী (রা), সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, সা'ঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আমর, তালহা ইব্ন 'উদায়দুল্লাহ, যুবাইর ইব্ন 'আওয়াম, 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ, আবূ 'উবায়দাহ এবং আ'মের ইব্নুল জার্‌রাহ্।[৪১] যাঁদেরকে ওহীর মাধ্যমে বিশ্বনবী (সা) বেহেস্তের সু-সংবাদ দিয়েছেন।[৪২] এরপর মর্যাদাগত দৃষ্টিকোন থেকে যে সকল সাহাবা জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাআর অধিকারী হবেন,তাঁরা হলেন: বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৌভাগ্যবান সাহাবীগণ। এ যুদ্ধে যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে[৪৩] সরাসরি আসমান থেকে ফেরেশতা (ক্রমান্নয়ে ১০০০, ৩০০০ ও ৫০০০) নাযিল করে সাহাবাগণকে সাহায্য করেছেন। এতে সাহাবীগণের মর্যাদার বিষয়টি স্পষ্ট। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জান্নাত নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে এবং মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল কিতাবসমূহের বর্ণনানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘোষণা :

اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ.

---

৩৮ আল-কুরআন : ৫৭ ***সূরা হাদীদ***, আয়াত নং ১০।

৩৯ আল-কুরআন : ২১ ***সূরা আম্বিয়া***, আয়াত নং ১০১।

৪০ ***সুনানু ইব্ন মাজা***, بَاب فَضَائِلِ الْعَشَرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ১৩০; ***মুসনাদু আহমদ***, হাদীস নং ১৫৫০।

৪১ ***সুনানু আবী দাউদ***, كِتَاب السُّنَّةِ অনুচ্ছেদ- بَاب فِي الْخُلَفَاءِ, হাদীস নং ৪০৩১; ***সুনানুত তিরমিযী***, كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ-بَاب مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, হাদীস নং ৩৬৮০,৩৬৮১; ***মুসনাদু আহমদ***, হাদীস নং ১৫৪৫। হাদীসের মূল পাঠ হলো :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ رَجُلٌ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ قَالَ فَقَالُوا مَنْ هُوَ فَسَكَتَ قَالَ فَقَالُوا مَنْ هُوَ فَقَالَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ

৪২ ড. সুবহী সালিহ : **উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু**, ২৫শ সং, (বৈরূত : দারুল 'ইল্ম লিল-মালাইন, ২০০২খ্রি.), পৃ. ১৪৯।

৪৩ ***সূরা আনফাল***, আয়াত নং ০৯; ***সূরা আলে-ইমরান*** : আয়াত নং ১২২-১২৪ ও ***সূরা আলে-ইমরান*** : আয়াত নং ১২৫।

"এখন তেমাদের যা ইচ্ছে হয় করো, তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।"[৪৪]

অনুরূপভাবে মর্যাদাগত দৃষ্টিকোন থেকে যে সকল (১৪০০) সাহাবা জান্নতের সর্বোচ্চ মর্যাদর অধিকারী হবেন, তাঁরা হলেনঃ 'বাই'আতে রেদওয়ান' অর্থাৎ, যাঁরা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে হাত রেখে শপৎ নিয়েছিলেন। এরপর অবশিষ্ট সকল সাহাবী জান্নাতের মর্যাদার অধিকারী হবেন। এভাবে সকল সাহাবী সাফল্যের সর্বশীর্ষে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে যারা তাঁদেরকে ঘৃণা করবে তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের পর্যায়ভুক্ত হবে।[৪৫]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর أَهْلِ بَيْتٍ বা পরিবারবর্গের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ই'তিকাদ (বিশ্বাস বা অভিমত) হলোঃ তাঁরা প্রত্যেকেই জান্নাতী। শুধু জান্নাতী নন, বরং ফাতিমা (রা)[৪৬] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয়তমা কন্যা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এরশাদ

---

৪৪ ***সহীহুল বুখারী***, كِتَاب الْمَغَازِي অনুচ্ছেদ- بَاب فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا হাদীস নং ৩৬৮৪; ৫৭৮৯; ৬৪২৬।

৪৫ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩। মূল 'আরবী :

ويفضلون بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم : طلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأَبو عبيدة بن الجراح أَمين هذه الأُمَّة رضي الله عنهم أَجمعين ، ثم أَهل بدر ، ثمَّ أَهل الشجرة أَهل بيعة الرضوان ، ثمَّ سائر الصحابة رضي الله عنهم ؛ فمن أَحبهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم كان من الفائزين ، ومن أَبغضهم وسبهم فهو من الهالكين .

৪৬ ফাতিমা (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রথমা স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদ ইবন আসাদ (রা.)-এর গর্ভে এবং মহানবী (সা.)-এর ঔরষে নবুওয়াতের ০৫ বছর পূর্বে মতান্তরে নবূওয়াতের এক বছর বা নবূওয়াতের কিছুকাল পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। আওলাদে রাসূল (সা.) বা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বংশধর বলতে ফাতিমা (রা.)-এর বংশধারাকেই বুঝানো হয়েছে। খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এরপর ফাতিমা যাহরা (রা.) ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.)-এর সংগে পনের বছর সাড়ে পাঁচ মাস বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি 'আয়শা (রা.) থেকে বয়সে ৫ বছরের বড় ছিলেন। ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভে পাঁচজন সন্তান ভুমিষ্ট হয়। তারা হলেন : হাসান, হুসাইন, মুহ্‌সিন, উম্মু কুলসূম এবং যয়নাব (রা.)। ফাতিমা (রা.)-এর যোগ্যতা ও পবিত্র ফযীলতের জন্য ইসলামে তাঁর এ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাতিমা (রা.) ছিলেন খলীফাতুল মুসলেমীন মদীনাতুল 'ইলম আসাদুল্লাহ 'আলী (রা.)-এর স্ত্রী, ইমাম হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর মাতা। রাসূল (সা.)-এর ইন্‌তিকালের ছয় মাস পর ১১হিজরী রমযান মানের ৩ তারিখ মঙ্গলবার ২৯ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। দ্র. হাফেয ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালামী : ***আল-ইসাবাতু ফী তাময়ীযিস্ সাহাবা***, খ. ৮ম, (আল-কাহেরা : মুসতাফা মুহাম্মদ, ১৩৫৮/১৯৩৯), পৃ. ১৯-২৫।

করেছেন, فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي "ফাতিমা (রা) আমার শরীরের একটি টুকরা।"[৪৭] তিনি বেহেশতের নারীদের নেত্রী এবং তাঁর ছেলে হাসান ও হুসাইন বেহেশতের যুবকদের নেতা।[৪৮]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : إنما سميت فاطمة لان الله تعالى فطم محبيها عن النار "ফাতিমা (রা) কে এ নামে এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে; কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এবং তাঁর ভক্তদেরকে জাহান্নাম হতে পৃথক করেছেন।"[৪৯]

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এরশাদ করেন: إِنَّ فَاطِمَةَ حَصَّنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَهَا اللهُ وَذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ "নিশ্চয় ফাতিমা (রা) তাঁর চরিত্রের আচঁল পবিত্র রেখেছেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ও বংশধরদেরকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দিলেন।"[৫০]

হযরত 'আলী (রা)-এর প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এরশাদ করেন: ان الله تعالى قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এবং তাঁর আওলাদ হতে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের আগুনকে দূরীভূত করেছেন। এ জন্য তাঁর নাম ফাতিমা রাখা হলো।"[৫১]

রাসূলুল্লাহ (সা) একদা হাসান ও হুসাইনকে দেখে বলেন: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا "হে আল্লাহ! আমি এ দু'জনকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাদেরকে ভালোবাস।"[৫২]

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ ادْعِي لِيَ ابْنَيَّ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ.

"আনাস ইব্ন মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার আহলে বাইত-এর সদস্যগণের মধ্যে কে আপনার সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলেন: আল-হাসান ও

---

৪৭ ***সহীহুল বুখারী***, بَاب مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام : كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ, হাদীস নং ৩৪৩৭; ***সহীহ লি-মুসলিম***, بَاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ كِتَاب فَضَائِلِ অনুচ্ছেদ : فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلَاة وَالسَّلَامُ, হাদীস নং ৪৪৮৩।

৪৮ ইমাম তিরমিযী : ***জামে' আত-তিরমিযী***, (কুতুবখানা, রাশিদিয়্যা, দেওবন্দ, তা.বি), بَاب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﷺ হাদীস নং ৩৭১৪।

৪৯ ইমাম হাকেম আন্ নাইসাপূরী : ***আল-মুস্তাদরাক্ব 'আলাস্ সহীহাইন***, (বৈরূতঃ আল্-মাকতাবাতুল হিলাল' ১৯৮৯ খ্রি.) পৃ. ১৫২।

৫০ ইমাম আত্ তিবরানী : ***আল-মু'জামুল কাবীর***, খ. ১৬, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), পৃ. ২৬০।

৫১ আত্-তাবারী, ইবনে জারীর, ***যাখায়িরুল 'উকবা*** (কায়রো: মাকতাবা ওয়াহাবা' তা.বি.) পৃ.২৫-২৬।

৫২ ***সহীহুল বুখারী***, بَاب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﷺ -كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ হাদীস নং ৩৪৬৪।

আল-হুসাইন। তিনি ফাতিমা (রা) কে বলতেন: আমার দুই সন্তানকে আমার কাছে ডাকো। তিনি তাদেরকে শুঁকতেন এবং নিজের কলিজার সাথে লাগাতেন।"[৫৩]

কুরআন মজীদের কিছু সংখ্যক আয়াত (Ahl al-Bayt) ফাতিমা (রা) ও তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যগণের উচ্চ মর্যাদার শানে অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও আয়াতগুলোতে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এর মধ্যে দুটি আয়াত হলো :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

"হে আহলে বাইত! আল্লাহ তো চান তোমাদের অপবিত্রতা দূর করত ভালভাবে তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"[৫৪]

সূরা আল্-আহযাবের উক্ত আয়াতের শানে নুযূলে তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত 'আলী (রা),[৫৫] ফাতিমা (রা), হাসান ও হুসাইন (রা) বলা হয়েছে 'নবীর পরিবার' (আহলে বায়ত)। এ আয়াত দ্বারা সাধারণভাবে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) ফাতিমা (রা) ও তাঁর স্বামী 'আলী (রা) এবং তাঁদের দুই পুত্রগণ একই পরিবারভুক্ত।[৫৬] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চার ছেলে (তৈয়্যব,

---

৫৩ ***সুনানুত তিরমিযী***, অনু. মুহাম্মদ মূসা, হাদীস নং ৩৭১১, খ. ৬ষ্ঠ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২।

৫৪ আল-কুরআন : ৩৩ ***সূরা আল্-আহযাব***, আয়াত নং ৩৩।

৫৫ 'আলী (রা.)-এর প্রকৃত নাম আলী, উপাধি আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুরতাযা, উপনাম আবূল হাসান ও আবূ তুরাব। পিতার নাম আবূ তালিব এবং মাতার নাম ফাতিমা। তিনি নবুওয়াতের দশ বছর পূর্বে (৬০০ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন। বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ 'আলী (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতৃব্য আবূ তালিবের পুত্র। দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অভিভাবক ছিলেন আবূ তালিব। 'আলী (রা.)-এর ডাকনাম ছিলো আবূ তুরাব। বানু হাশিম গোত্রে তাঁর জন্ম হয়। যেই গোত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)ও জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম। তিনি ছিলেন নবী (সা.)-এর আপন চাচাত ভাই এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ মহান খলিফা। হিজরী দ্বিতীয় সনে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তম কন্যা ফাতিমা (রা.)-এর সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি ছিলেন সৎচরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ। উসমান (রা.)-এর শাহাদাত বরণের পর তিনি ৩৫ হিজরী ২৪ জিলহজ্জ মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ৬৫৬ খ্রি. থেকে ৬৬১ খ্রি. পর্যন্ত খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি হিজরী ৪০ সনের ১৭ রমজান 'আবদুর রহমান ইব্ন মুলযিমের হাতে শাহাদত বরণ করেন। চার বছর নয় মাস ছিলো তাঁর খিলাফতকাল। তাঁর শাসনামল অবসানের মাধ্যমে খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। তাঁকে কুফার জামে মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়। দ্র.- ইব্ন হাজার : **বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া**, খ. ৪র্থ (আল-কাহেরা : দারুল ফিকর আল-আরাবী, তা.বি), পৃ-১০৬।

৫৬ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ***সহীহ লি-মুসলিম*** কিতাবে (অনুচ্ছেদ- بَاب فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ, হাদীস নং ৪৪৫০) এসেছে:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

তাহের, কাসেম ও ইব্রাহীম) ও চার মেয়ের (যয়নব, উম্মু কুলসূম, রুকাইয়্যা ও ফাতিমা) মধ্যে শুধু ফাতিমা (রা)ই জীবিত ছিলেন। তাই 'নবীর পরিবার' (আহলে বায়ত) বলতে তাঁকে, তাঁর সন্তান এবং স্বামীকেই বুঝানো হয়।

সূরা আল্-আহযাবের উক্ত আয়াতের শানে নুযূলে তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত 'আলী (রা), ফাতিমা (রা), হাসান ও হুসাইন (রা) বলা হয়েছে 'নবীর পরিবার' (আহলে বায়ত)। এ আয়াত দ্বারা সাধারণভাবে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) ফাতিমা (রা) ও তাঁর স্বামী 'আলী (রা) এবং তাঁদের দুই পুত্রগণ একই পরিবারভুক্ত।[৫৭]

উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) কী করেছিলেন ?

এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে:

فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ إِلَى خَيْرٍ

"তখন নবী (সা) হাসান ও হুসাইন (রা) কে ডাকেন এবং তাঁদেরকে একখানা চাদরে ঢেকে নেন। আলী (রা) তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি তাঁকেও চাদরে ঢেকে নেন, অতঃপর বলেন 'হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত। অতএব তুমি তাঁদের থেকে অপবিত্রতা দূর করো দাও এবং তাঁদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র করো।' তখন উম্মু সালামা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমিও কি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন : তুমি স্বস্থানে আছ এবং কল্যাণের মধ্যেই আছ।"[৫৮] এ সম্পর্কে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) মাটির উপর চারটি রেখা টানেন এবং লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা জান এটা কি? সকলেই আরয করলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, মারইয়াম বিনতে 'ইমরান এবং 'আসিয়া বিনতে মুযাহিম। জান্নাতবাসী মহিলাদের মধ্যে এঁদের ফযীলাত সবার উর্ধ্বে।[৫৯]

---

৫৭ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ***সহীহ লি-মুসলিম*** কিতাবে (অনুচ্ছেদ- بَاب فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ, হাদীস নং ৪৪৫০) এসেছে:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا .

৫৮ ***সুনানুত তিরমিযী***, كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ হাদীস নং ৩৭১৯।

৫৯ ***আল্-ইস্তিয়াব***, প্রাগুক্ত, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৮৯৫।

আল-কুরআনের অপর বর্ণনায় ফাতিমা (রা)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রসংগে আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ

"অতঃপর হে নবী! যে ব্যক্তি আপনার সাথে ঈসা (আ) সম্পর্কে বিতর্ক করে এরপর যে, আপনার নিকট ওহী এসেছে, তবে তাঁদেরকে বলে দিন, এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে এবং আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদেন নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে! অতঃপর মুবাহালা করি। তারপর মিথ্যাবাদীর উপর অভিসম্পাত দিই।"[৬০]

মুবাহালার আয়াত নাযিলের সেই সংকটজনক সময়ে আল্লাহ তা'আলা যাঁদেরকে বিশেষ মানুষ হিসেবে প্রদর্শন করেন এবং অন্য সকলের ধবংস হবার বিপরীতে তাঁদের নিরাপত্তার জামিনদার হন তাঁদের একজন ছিলেন ফাতিমাতুয-যাহরা (রা)। সুতরাং আল-কুরআনের বর্ণনায় এবং আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীসের বিশ্লেষণে আহলে বাইত ফাতিমা (রা)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অনেক উঁচুস্তরের। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي "ফাতিমা আমার দেহের একাংশ। সুতরাং, যে তাঁকে নারাজ করবে, সে আমাকে নারাজ করবে।"[৬১] রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ "ফাতিমা (রা) হলেন জান্নাতবাসী মহিলাদের নেত্রী।[৬২]

'আয়শা (রা) বলেন, "আমি ফাতিমার তুলনায় স্পষ্টভাষী ও সত্যবাদী কাউকে দেখিনি। তবে তাঁর পিতার কথা স্বতন্ত্র্য।"[৬৩] সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর أَهْلِ بَيْتٍ বা পরিবারবর্গকে ভালোবাসা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ।[৬৪]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা একজন মু'মিন ব্যক্তির কেমন হওয়া উচিত এবং সাহাবী বিরুদ্ধাচারণকারী ব্যক্তির চিত্র তুলে ধরে ইমাম আবূ জা'ফর আত-তাহাভী

---

৬০ আল-কুরআন : ***সূরা আলে 'ইমরান,*** আয়াত নং ৬১।

৬১ ***সহীহুল বুখারী***, بَاب مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام -كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ- بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ, হাদীস নং ৩৪৩৭, ৩৪৮৩।

৬২ ***সহীহুল বুখারী***, بَاب مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام -كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ-; হাদীস নং ৩৪৮৩; ***সুনানুত তিরমিযী***, بَاب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﷺ -كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ-, হাদীস নং ৩৭১৪।

৬৩ ***আল্-ইস্তিয়াব***, প্রাগুক্ত, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৮৯৭।

৬৪ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

(রহ. ২৩৯হি.-৩২১হি./৮৫৩খ্রি.-৯৩৩খ্রি) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية গ্রন্থে[৬৫] আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম'আতের ' আকীদা-বিশ্বাস প্রসংগে বলেন:

ونُحِبُّ أصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ولا نُفْرِطُ في حُبِّ أحَدٍ مِنْهُم، ولا نَتَبَرَّأُ مِنْ أحَدٍ مِنْهُم، ونُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُم وبِغَيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُم، ولا نَذْكُرُهُم إلاَّ بِخَيْرٍ، وحُبُّهُم دِيْنٌ وإِيمَانٌ وإِحْسَانٌ، وبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُغْيَانٌ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকল সাহাবীকে ভালবাসি। তাদের কারো ভালবাসায় আমরা অতিরঞ্জিত বাড়াবাড়ি করি না। আমরা তাদের কারো কোন বিষয়ে দায়মুক্ত হই না। আর যারা সাহাবীদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে সমালোচনা করে তাদের প্রতি আমরা প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করি। আমরা সাহাবীদের কেবল উত্তম ও ভাল আলোচনাই করি। মূলত সাহাবীদের ভালবাসাই দীন, ঈমান ও ইহসান। আর তাঁদের প্রতি ঘৃণাপোষণ করা কুফুরী, মুনাফেকি ও সীমালঙ্ঘন।"[৬৬]

অনুরূপভাবে ومن أَهل بيته أَزواجه رضي الله عنهُن "আহলে বাইতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র স্ত্রীগণও অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা প্রত্যেকেই أُمهات المؤمنين "মু'মিন বান্দাগণের মা।"[৬৭] তাঁরা অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। তাঁদের 'পবিত্রতা'-র কথা আল-কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوْفًا ، وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

"হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে পর-পুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলিও না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে। আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং

---

৬৫ সদর উদ্দিন 'আলী ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী আল-আয্য আল-হানাফী : شرح الطحاوية في العقيدة السلفية, (সৌদি 'আরব : ওয়াযারাতু আস-শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৭) খ. ৩য়, পৃ. ১২৮; খ. ২য়, ২৯৯ এবং খ. ৩য়, পৃ. ১৩৮।

৬৬ আহমদ ইব্ন 'আবদুর রাজ্জাক আদ-দাওসী : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, (রিয়াদ : আল-ইদারাতুল 'আম্মাহ, ১৪১৭/১৯৯৬) খ. ১৪, পৃ. ৪৭০।

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

প্রাচীন যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করিবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"[৬৮] এ আয়াত দ্বারা উম্মুল মু'মিনীন 'পবিত্র' বলে আল্লাহর স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ আয়াত দ্বারা উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, আয়েশা বিনতে আবী বকর, হাফসা বিনতে উমর ইব্ন খাত্তাব, উম্মে হাবীবা বিনতে আবী সুফিয়ান, উম্মে সালমা বিনতে আবী উমাইয়্যাহ ইব্ন মুগীরা, সাওদাহ বিনতে যাম'আহ ইব্ন কায়েস, যয়নব বিনতে জাহাশ, মাইমূনা বিনতে হারেস, জুওয়াইরাহ বিনতে আল-হারেস ইব্ন আবী দারার এবং সুফিয়াহ বিনতে হায়ী ইব্ন আখতাব (রা) উদ্দেশ্য।[৬৯] আহলুস সুন্নাত ওয়াত জামা'আতের ই'তিকাদ হলো তাঁরা প্রত্যেকেই পবিত্রতার দিক থেকে সমান এবং তাঁরা প্রত্যেকেই দুনিয়াতেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রী ও আখেরাতেও। তবে তাঁদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং আয়েশা বিনতে আবী বকর (রা) মর্যাদা স্বতন্ত্র ও সর্বশীর্ষে।[৭০]

উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা)-এর মর্যাদার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ "নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হলেন খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা)।"[৭১] আর জিবরাঈল (আ) তাঁকে يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ "জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।"[৭২]

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর মর্যাদার ব্যাপারে ইরশাদ করেন :

فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ

"নারী জাতীর উপর 'আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা তেমন, যেমন খাদ্য সামগ্রীর উপর সারীদের মর্যাদা।"[৭৩] আনাস (রা) থেকে বর্ণিত।

নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সা)-এরশাদ করেন,

حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

---

৬৮ আল-কুরআন : ৩৩ ***সূরা আল-আহযাব***, আয়াত নং ৩২-৩৩।

৬৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

৭০ প্রাগুক্ত।

৭১ ***সহীহুল বুখারী***, بَاب تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ وَفَضْلِهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا অনুচ্ছেদ- كِتَاب أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ, হাদীস নং ৩৫৩১।

৭২ পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৩৫৩৩।

৭৩ পূর্বোক্ত, بَاب فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, হাদীস নং ৩৪৮৬, ৩১৫৯, ৩১৭৯, ৪৯৯৯ ও ৫০০৮।

"তোমার অনুসরণের জন্য জগতের মহিলাগণের মধ্যে মারইয়াম বিনতে 'ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (সা) এবং ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়াই যথেষ্ট।"[৭৪] তাই মহিলাদের মধ্যে তাঁদের ফযীলাত সবার উর্ধ্বে।[৭৫]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সকল (আদেশ-নিষেধ) বিষয় ন্যায়সঙ্গতভাবে আন্তরিকতার সাথে পালন করার কারণে والصحابة الكرام كلهم عُدولٌ "সাহাবায়ে কেরাম ন্যায়পরায়ন"; وخيرته من خلقه "তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ"; وهم أَولياءُ الله وأصفياؤه "এবং তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহর বন্ধু ও তাঁর গুণেগুণান্বিত"; وهم أَفضل هذه الأُمة بعد نبيها "এবং তাঁরা নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পরে এ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।"[৭৬]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করবে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার পাদদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত। যাতে তারা চিরকাল থাকবে। ইহা মহা সাফল্য।"[৭৭]

আয়াতে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ এর ব্যাখ্যায় 'তাফসীরে খাযেন'[৭৮], '(তাফসীর) বাহরুল 'উলূম' ও 'আত-তাফসীর আল-ওয়াসীত'[৭৯]

কিতাবে বলা হয়েছে:

ورضوا عنه رضي الله عنهم يعني رضي الله عن أعمالهم ورضوا عنه بما جازاهم عليها من الثواب وهذا اللفظ عام يدخل فيه كل الصحابة.

"আল্লাহ তা'আলা সাহাবাগণের উপর সন্তুষ্ট। অর্থাৎ আমলের সালেহের প্রতিদানে সাওয়াব অর্জনের কারণে সাহাবাগণও তাঁর উপর সন্তুষ্ট। আর এ বাক্যটি সকল সাহাবা অন্তর্ভুক্ত।" এর

---

৭৪ ***সুনানুত তিরমিযী***, بَاب فَضْلِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ- হাদীস নং ৩৮১৩।

৭৫ ***আল্-ইস্তিয়াব***, প্রাগুক্ত, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৮৯৫।

৭৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী: الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة), পূর্বোক্ত।

৭৭ আল-কুরআন : ৯ ***সূরা আত-তাওবা***, আয়াক নং ১০০।

৭৮ আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-খাযেন : ***তাফসীরে খাযেন***, খ. ৩য়, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩২।

৭৯ মুহাম্মদ সাইয়্যেদ তানতাভী : ***আত-তাফসীর আল-ওয়াসীত,*** খ. ১ম, পৃ. ৪৫৫১; আস-সমরকান্দী : ***বাহরুল 'উলূম***, খ. ১ম, পৃ. ২৭৮।

ব্যাখ্যায় 'মা'আনিল কুরআন'[৮০] ও মুখতাসার আশ-শাসাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ[৮১] কিতাবে বলা হয়েছে- أى رضي الله أعمالهم ورضوا مجازاته عليها "সাহাবাগণের 'আমলের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও সন্তুষ্ট, যা রূপক অর্থে ব্যবহৃত।"

আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব আল-বাসরী আল-বাগদাদী তাঁর النكت والعيون কিতাবে তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তাহলো-

১. সাহাবাগণ ঈমান আনার বিষয়ে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং সাওয়াব অর্জনের কারণে সাহাবাগণও তাঁর উপর সন্তুষ্ট।

২. সাহাবাগণের একনিষ্ঠ 'ইবাদতে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং প্রতিদানে সাহাবাগণও তাঁর উপর সন্তুষ্ট।

৩. সাহাবাগণ রাসূলের আনুগত্যের কারণে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং আমলে সালেহের কবুল হওয়ার কারণে সাহাবাগণও তাঁর উপর সন্তুষ্ট।"[৮২]

সাহাবা সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের 'আকীদা প্রসংগে মুহাম্মদ খলীল হিরাস شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية গ্রন্থে শাইখুল ইসলাম 'আল্লামা ইব্ন তাইমিয়া (রহ) লিখেছেন: "আর সাহাবীগণ তাওহীদের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলো অত্যন্ত দৃঢ় অন্তরের বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা দ্বীন ইসলামকে জরুরী ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সরাসরি অবগত হয়েছেন। তাই দ্বীন ইসলাম ও ঈমানের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ছিলো চূড়ান্ত। অনুরূপভাবে তাঁরা কুফর ও কপটতাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত সাহাবীগণের ভালো দিক ছাড়া অন্য কোন দিক (সমালোচনা) আলোচনা করেন না। কেননা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে নিঃসার্থ ভালোবাসতেন এবং তাঁদেরকে ভালোবেসে ওহী ভিত্তিক চমৎকার উপদেশ দিতেন।"[৮৩]

এ প্রসংগে সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা) এরশাদ করেন :

اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

---

৮০ আন-নুহাস : ***মা'আনিল কুরআন***, খ. ৩য়, পৃ. ২৪৮।

৮১ ইমাম তিরমিযী : ***মুখতাসার আশ-শাসাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ***, খ. ৯ম, (উমান : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ২৬৪।

৮২ আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব আল-বাসরী আল-বাগদাদী : النكت والعيون খ. ২য়, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), পৃ. ১৩৭।

৮৩ মুহাম্মদ খলীল হিরাস : شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

"তোমরা আমার সাহবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর! তোমরা আমার পরে তাদেরকে কটুক্তির লক্ষ্যবস্তু বানিও না, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসে সে যেনো আমার ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসে। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে ঘৃণা করে, সে যেনো আমাকে ঘৃণা করার কারণে তাদেরকে ঘৃণা করে। যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিলো, সে আমাকে কষ্ট দিলো। আর যে আমাকে কষ্ট দিলো সে অবশ্যই আল্লাহকে কষ্ট দিলো। আর যে, আল্লাহকে কষ্ট দেয়, অতি সত্ত্বর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে গ্রেফতার করবেন।"[৮৪]

এ হাদীসটি আল-জামি'উত তিরমিযী,[৮৫] মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল (তিন স্থানে),[৮৬] মুসান্নাফু 'আবদির রাজ্জাক,[৮৭] আস সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ,[৮৮] শু'আবূল ঈমান লিল-বাইহাকী[৮৯] ও সহীহ ইব্ন হিব্বান[৯০] হাদীসের কিতাবসমূহে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, সাহাবীদের ব্যাপারে কোন প্রকারের কটূক্তি বা মন্দ কথা বলা বা খারাপ ধারণাপোষণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আকায়েদ বিষয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ شرح السير الكبير কিতাবে বলা হয়েছে : فِي الْكَفِّ عَنْ الصَّحَابَةِ إلَّا بِخَيْرٍ "(সাহাবীদের বিষয়ে ইসলামী আকীদা এই যে,) তাঁদের সমালোচনা থেকে নিজকে বিরত রাখবে। তাঁদের কেবল উত্তম এবং ভালো আলোচনাই করবে।"[৯১]

অনুরূপভাবে سير أعلام النبلاء কিতাবে বলা হয়েছে : لا نذكر أحدا من الصحابة إلا بخير "তোমরা কেহই সাহাবাগণের ব্যাপারে ভালো আলোচনা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে উল্লেখ করবে না।"[৯২] আর যে ব্যক্তি সাহাবাগণকে ঘৃণা করে, সে যেনো স্বয়ং রাসূল (সা) কে ঘৃণা করলো।[৯৩] সুতরাং কোন অবস্থাই সাহাবীগণের সমালোচনা করা যাবে না। কোন ঈমানদার

---

৮৪ ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ "হাদীসটি হাসান ও গরীব।" দ্র. ***সুনানুত তিরমিযী***, হাদীস নং ৩৭৯৭।

৮৫ ***সুনানুত তিরমিযী***, كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ- بَاب فِيمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ হাদীস নং ৩৭৯৭।

৮৬ ***মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল***, অনুচ্ছেদ : حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ হাদীস নং ১৬২০১, ১৯৬৪১, ১৬৬৯।

৮৭ ***মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক***, অনুচ্ছেদ : باب في فضائل الانصار হাদীস নং ১৯৯০৬।

৮৮ ***আস সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ***, হাদীস নং ৮৩৩০।

৮৯ ***শু'আবূল ঈমান লিল-বাইহাকী***, অনুচ্ছেদ : فصل في براءة نبينا ﷺ في النبوة হাদীস নং ১৪৮৩।

৯০ ***সহীহ ইব্ন হিব্বান***, অনুচ্ছেদ : ذكر الزجر عن اتخاذ المرء أصحاب رسول الله ﷺ غرضا بالتنقص হাদীস নং ৮৬৭৯।

৯১ আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আবী সাহল আস-সারাখসী : شرح السير الكبير, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), খ. ১ম. পৃ. ১৬৬; আস-সারখাসী : شرح كتاب السير الكبير, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), খ. ১ম. পৃ. ৫৩; আশ-শায়বানী : السير الكبير, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), খ. ১ম. পৃ. ১৫৭ ।

৯২ কামসুদ্দীন আয-যাহবী : ***সিয়ারু আ'লরামিন নুবালা***, খ. ৮ম. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

৯৩ ***সুনানুত তিরমিযী***, كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ- بَاب فِيمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ হাদীস নং ৩৭৯৭।

ব্যক্তি তা করতে পারে না। তাঁদের কেবল উত্তম এবং ভালো আলোচনাই করাই ঈমানের দাবী।[৯৪] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীকে গালমন্দ কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

"তোমরা আমার সাহাবীকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করো, তবে তাদের একমুদ বা অর্ধমুদ এর পরিমাণের সাওয়াব হবে না।" এ প্রসিদ্ধ হাদীসটি সহীহুল বুখারী,[৯৫] সহীহ লি-মুসলিম,[৯৬] সুনানু আবী দাউদ[৯৭] ও সুনানুত তিরমিযী[৯৮] কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সাহাবীদের গালি দেয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ এবং দণ্ডযোগ্য অপরাধ। মুশরিক বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিদ্রোহী ছাড়া কেহই সাহাবাগণের গালি দিতে পারে না। আর সাহাবীদের গালি প্রদানকারীর উপর আল্লাহর লা'নত।[৯৯]

মূলত সাহাবাগণ ওহীর ধারক-বাহক ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে অবস্থান করায় (أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ) তাঁদের পুরো জীবনই 'আমলে সালেহের কারণে প্রত্যেকেই সর্বোত্তম স্থরে উপণিত হয়েছেন।[১০০] সুতরাং সাহাবীদের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ধারণা যে, তাঁরা প্রত্যেকেই সর্বোত্তম ব্যক্তি। আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ويوكلون أمرهم إلى الله "তাঁদের সার্বিক কাজ আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই উচিত। আল্লাহ রাব্বুল'আলামীন তাঁদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১০১]

---

৯৪ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : **الوجيز في عقيدة السلف الصالح**, পূর্বোক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৩৬।

৯৫ ***সহীহুল বুখারী***, بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ -অনুচ্ছেদ- كِتَاب الْمَنَاقِبِ, হাদীস নং ৩৩৯৭।

৯৬ ***সহীহ লি-মুসলিম***, بَاب تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ ﷺ عَنْهُمْ-অনুচ্ছেদ- كِتَاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ , হাদীস নং ৪৬১০ ও ৪৬১১।

৯৭ ***সুনানু আবী দাউদ***, بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -অনুচ্ছেদ- كِتَاب السُّنَّةِ হাদীস নং ৩০৩৯।

৯৮ ***সুনানুত তিরমিযী***, بَاب فِيمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ-অনুচ্ছেদ- كِتَاب الْمَنَاقِبِ হাদীস নং ৩৭৯৬।

৯৯ পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৩৮০১।

১০০ ***সুনানু ইব্ন মাজা***, بَاب فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ -অনুচ্ছেদ- كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ হাদীস নং ১৫৮।

১০১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح, পূর্বোক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৩৬। মূল 'আরবী :

ويوكلون أمرهم إلى الله ؛ فمن كان منهم مصيبا كان له أجران ، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد ، وخطؤه مغفور له إن شاء الله .

আর যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল'আলামীন সাহাবাগণের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, সেহেতু তাঁদের সাহাবার সাধুতা ও ন্যায়পরায়নতা বিশ্বাস করে সমালোচনা সর্বোতভাবে পরিহার করা ঈমানের দাবী। যেমন ইসলামী আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা দা'ঈ 'আল্লামা কামাল ইব্ন হোমাম তাঁর 'আল-মাসায়েরাহ' কিতাবে এ প্রসংগে লিখেছেন :

واعتقاد أهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة وجوبا بإثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم و الثناء عليهم ، كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم سرد الآيات والروايات .

"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা মতে সকল সাহাবার পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়নতা বিশ্বাস করা, তাঁদের সমালোচনা সর্বতোভাবে পরিহার করা এবং তাঁদের প্রশংসা করা। যেভাবে আল্লাহ ও রাসূল (সা) তাঁদের প্রশংসা করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর কথার সমর্থনে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস থেকে বিভিন্ন বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।"[১০২] অনুরূপভাবে সা'ঈদ ইব্ন 'আলী ইব্ন ওহাব আল-কাহতানী তাঁর فقه الدعوة في صحيح الإمام البخارى কিতাবে সাহাবীগণের পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়নতার বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[১০৩]

অনুরূপভাবে 'আল্লামা মুহাম্মদ 'আবদুর রউফ আল-মানাওয়ী তাঁর فيض القدير شرح الجامع الصغير কিতাবে উল্লেখ করেছেন, "সকল সাহাবী হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মুহাজির ও আনসারসহ সকল সাহাবীর সমালোচনা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা। কেননা তাঁদের প্রশংসা কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।"[১০৪] সাহাবাগণের দোষারোপ করা حرام شديد التحريم 'জঘন্যতম হারাম।'[১০৫]

ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ ইসলামী আকায়েদ সাহাবীদের বিষয়ে هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى গ্রন্থে লিখেছেন : সাহাবাগণের অন্তরে আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চূড়ান্ত আদর্শ বিরাজমান। তাঁরা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মেনে জীবনবাজি রেখে অনেকগুলো জিহাদের সম্মুক্ষীণ হয়েছিলেন এবং অনেক শহরও বিজয় অর্জন করেছেন। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের বিভিন্ন মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন।"[১০৬]

---

১০২ 'আল্লামা কামাল ইব্ন হোমাম : ***আল-মাসায়েরাহ***, খ. ১ম, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), পৃ. ১৩২।

১০৩ সা'ঈদ ইব্ন 'আলী ইব্ন ওহাব আল-কাহতানী : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري খ. ২য়, ১ম সং. (আর-রিয়াসাতুল 'আম্মাহ লি-ইদারাতিল বুহুসিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪২১হি.), পৃ. ১১৫।

১০৪ 'আল্লামা মুহাম্মদ 'আবদুর রউফ আল-মানাওয়ী : فيض القدير شرح الجامع الصغير, খ. ২য়, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), পৃ. ৫৭৫।

১০৫ পূর্বোক্ত।

১০৬ ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى খ. ১ম, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), পৃ. ১০৩।

আবু বকর আস-সারাখসী ইসলামী আকায়েদ সাহাবীদের বিষয়ে أصول السرخسي গ্রন্থে লিখেছেন: "রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতেকালের পর সাহাবাগণ যে (خير الناس) 'সর্বোত্তম মানুষ' এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করা আবশ্যকিয় জ্ঞান। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের মর্যাদা ও সম্মানের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের বিভিন্ন মর্যাদার কথা হাদীসে বর্ণনা করেছেন।"[১০৭] অনুরূপভাবে ইব্ন বাতুতাহ (রহ) ও তাঁর رحلة ابن بطوطة গ্রন্থে[১০৮] এবং ইব্ন যুবাইর (রহ) তাঁর رحلة ابن جبير গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১০৯]

সাহাবাগণের আনুগত্য করা মুসলিম উম্মাহর জন্য ওয়াজিব। এ প্রসংগে الفصول في الأصول কিতাবে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের জন্য দো'আ করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের মর্যাদা ও সম্মানের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই আহ্বান করেন। তাই তাঁদের আনুগত্য করা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য ওয়াজিব।"[১১০]

সকল সাহাবীকে ভালোবেসে সম্মান করা এবং তাঁদের সমালোচনা পরিহার করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। (অতঃপর সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন,) আর রাসূলুল্লাহ (সা)ও তাঁদেরকে অবশ্যই ভালবেসেছেন এবং তাঁদের প্রশংসা করেছেন।[১১১]

এ প্রসংগে فتاوى الرملي কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে : "সকল সাহাবীকে ভালোবেসে সম্মান করা এবং প্রতিটি মুসলমান তাঁদেরকে ভালোবাসা ওয়াজিব। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন।"[১১২] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

১০৭ আবু বকর আস-সারাখসী : أصول السرخسي খ. ১ম, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), পৃ. ৩১৩।

১০৮ ইব্ন বাতুতাহ : رحلة ابن بطوطة খ. ১ম, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), পৃ. ৭৪।

১০৯ ইব্ন যুবাইর : رحلة ابن جبير খ. ১ম, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), পৃ. ৪২।

১১০ ***আল-ফুসূলু ফীল উসূল***, খ. ২য়, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), পৃ. ৩২৪। মূল 'আরবী :

فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَا لَهُمْ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ ، وَمَدَحَهُمْ - وَجَبَ اتِّبَاعُهُمْ ، لِأَنَّهُ لَا يَدْعُو لَهُمْ وَلَا يَمْدَحُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُؤْمِنُونَ .

১১১ ইবরাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ : التدرج في دعوة النبي, খ. ১ম, ১ম সং. (ওয়াযারাতু আশ-শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৭হি.), পৃ. ১৩৩।

১১২ ফাতওয়া আর-রামালী, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৮৭। মূল 'আরবী :

(سُئِلَ) هَلْ مَحَبَّةُ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَاجِبَةٌ أَمْ لَا ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَحَبَّتَهُمْ وَاجِبَةٌ إذْ يَجِبُ تَعْظِيمُهُمْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَظَّمَهُمْ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ كَقَوْلِهِ : وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করবে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[১১৩]

সাহাবাগণের জামা'আত অপরাধ থেকে মুক্ত বিধায় তাঁরা নিঃস্পাপীদের পর্যায়ভুক্ত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অভিমত হলো :

"নিশ্চয়ই সাবাহাবাগণের জামা'আত অপরাধ থেকে মুক্ত বিধায় তাঁরা মা'সূম বা নিঃস্পাপ হিসেবে আমাদের ই'তিকাদ বা বিশ্বাস। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রেসালত বিশ্ববাসীর নিকট তাবলীগ[১১৪] তথা ইসলাম প্রচার প্রসারের কাজের জন্য নির্বাচিত

الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَقَوْلِهِ : يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ، وَقَوْلِهِ : وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ، وَقَوْلِهِ : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايِعُونَك تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى عِظَمِ قَدْرِهِمْ وَكَرَامَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ ، وَالرَّسُولُ قَدْ أَحَبَّهُمْ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ

১১৩ আল-কুরআন : ৯ ***সূরা আত-তাওবা***, আয়াত নং ১০০।

১১৪ ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই মহানবী (স.) ইসলামের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় সাহাবাগণ তাবলীগ করেছেন।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

ادْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

"আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায় (১৬ সূরা নাহাল, আয়াত: ১২৫)।" অপর আয়াতে তিনি বলেন :

اُبَلِّغُكُمْ رِسَالٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

"আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের নসিহত করছি (০৭ সূরা আরাফ, আয়াত: ৬২)।" রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : الدِّينُ النَّصِيحَةُ "দ্বীন হলো নসিহত।"

দ্র. ***সহীহ লি-মুসলিম***, অনুচ্ছেদ- بَاب بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ, হাদীস নং ৮২। রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَي أَنْ يُّبْلَغَ مَنْ هُوَ أَوْعَي لَهُ مِنْهُ

"প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট আমার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, কোনও কোনও 'মুবাল্লাগ' শ্রবণকারী থেকে কখনও কখনও অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে।"

ছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সাবাহাবাগণের সামগ্রিক জামা'আতকে অপরাধমুক্ত রেখেছেন।"[১১৫]

এ প্রসংগে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ

"ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন: আল্লাহ আমার উম্মাতকে অথবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতকে কখনও গোমরাহীর উপর সমবেত করবেন না। আর জামা'আতের[১১৬] উপর আল্লাহর হাত (সাহায্য) প্রসারিত। যে ব্যক্তি (মুসলিম সমাজ থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই দোযখে যাবে।"[১১৭]

এ হাদীসটি তিরমিযী,[১১৮] আল-মুসনাদুল জামে',[১১৯] সহীহু ওয়া দা'ঈফু সুনানুত তিরমিযী[১২০] এবং আত-তাকরীরু ওয়াত তাহ্বীরু[১২১] কিতাবের বর্ণনায় এসেছে। নাসির উদ্দিন আলবানী তাঁর

দ্র. ***সহীহুল বুখারী***, অনুচ্ছেদ- بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ, হাদীস নং ৬৫। দ্র. আল-মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং ২৪৫৩, খ. ৩য়, পৃ. ৩৩। সুতরাং ইসলাম প্রচার তথা দাওয়াতে তাবলীগের গুরুত্ব অপরিসীম।

১১৫ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح , পূর্বোক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৩৬। মূল 'আরবী :

وأَهل السنة والجماعة : يعتقدون بأن الصحابة معصومون في جماعتهم من الخطأ ، وأما أَفرادهم فغير معصومين ، والعصمة عند أَهل السُّنة من الله تعالى لمن يصطفي من رسله في التبليغ ، وأَن الله تعالى حفظ مجموع الأمة عن الخطأ ؛ لا الأَفراد .

১১৬ ইমাম তিরমিযী আবূ 'ঈসা বলেন- وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ "হাদীস বিশারদগণের মতে 'আল-জামা'আত' বলতে ফিক্হ ও হাদীসসহ অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণের জামা'আতকে বুঝায়" (জনগণকে তাদের সাথে সংঘবদ্ধ থাকতে হবে)। দ্র. ***সুনানুত তিরমিযী***, পরিচ্ছেদ بَاب مَا جَاءَ فِي الرِّضَا بِالْقَضَاءِ এর ১ম হাদীস (হাদীস নং ২০৭৭)-এর ব্যাখ্যা অংশ, প্রাগুক্ত।

১১৭ ***সুনানুত তিরমিযী***, পরিচ্ছেদ- كِتَاب الْفِتَنِ بَاب مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ এর ৩য় হাদীস, হাদীস নং ২০৯৩।

১১৮ ***সুনানুত তিরমিযী***,, অনু. মুহাম্মদ মূসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২১১৩, খ. ৪র্থ, পৃ. ৮৪।

১১৯ আবুল ফাযল আস-সাইয়্যেদ আবুল মা'তী আন-নববী : ***আল-মুসনাদুল জামে',*** হাদীস নং ৮১৬৯, খ. ২৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪।

১২০ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী : ***সহীহু ওয়া দা'ঈফু সুনানুত তিরমিযী***, খ. ৫ম, হাদীস নং ২১৬৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।

১২১ ***আত-তাকরীরু ওয়াত তাহ্বীরু***, খ. ৯ম, পৃ. ৪৯।

صحيح وضعيف سنن الترمذي গ্রন্থে এ হাদীসটির সনদ বিশ্লেষণ করে صحيح বা বিশুদ্ধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।[১২২]

"খুলাফায়ে রাশেদা চার খলীফা হযরত আবূ বকর, 'উমর, 'উসমান ও 'আলী (রা)-এর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ই'তিকাদ বা বিশ্বাস হলো: "নিশ্চয়ই তাঁরা প্রসিদ্ধ চারজন সাহাবী এবং তাঁরা নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পরে এ উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা ধারাবাহিকভাবে হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফা এবং তাঁরা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। হাসান ইব্ন 'আলী (রা)সহ খেলাফতের সময়কাল ছিলো ত্রিশ বছর (১১/৬৩২-৪০/৬৬১)।"[১২৩] কেননা নবী করীম (সা) পূর্বেই জানিয়েছিলেন :

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ

"আমার উম্মতের মাঝে খিলাফতের মেয়াদ ত্রিশ বছর। তারপর রাজত্বের আর্বিভাব হবে।"[১২৪]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় সাফীনা (রা)[১২৫] বলেন, আমরা খিলাফতকালকে গণনা করে দেখলাম, তার মেয়াদ ত্রিশ বছর ছিল।[১২৬]

নিম্নে এক নজরে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কাল উপস্থাপন করা হলো:

খলিফা	খেলাফাতের সূচনা	সমাপ্তি	সময়কাল
আবূ বকর (রা)	১৩ই রবিউল আউয়াল ১১ হি.	২২শে জমাদিউল উখরা ১৩হি.	২ বছর ৩ মাস ৯ দিন
উমর (রা)	২৩ শে জমাদিউল উখরা ১৩হি.	২৬শে যিলহজ্জ ৩৫ হি.	১০ বছর ৬ মাস ৪ দিন
উসমান (রা)	১লা মুহার্‌রম ২৩ হি.	১৮ই যিলহজ্জ ৩৫ হি.	১১ বছর ১১ মাস ১৭ দিন
আলী (রা)	২৪শে যিলহজ্জ ৩৫ হি.	১৭ই রমযান ৪০ হি.	৪ বছর ৮ মাস ২৩ দিন
হাসান (রা)	২৫শে যিলহজ্জ ৩৫ হি.	১৮ই রমযান ৪০ হি.	৬ মাস

---

১২২ নাসির উদ্দিন আলবানী : صحيح وضعيف سنن الترمذي , খ. ৫ম, হাদীস নং ২১৬৭, পৃ. ১৬৭।

১২৩ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح , পূর্বোক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৩৬।

১২৪ ***সুনানুত তিরমিযী***, كِتَاب الْفِتَنِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي الْخِلَافَةِ, হাদীস নং ২১৫২; ***সুনানু আবী দাউদ***, كِتَاب السُّنَّةِ অনুচ্ছেদ- بَاب فِي الْخُلَفَاءِ, হাদীস নং ৪০২৮ ও ৪০২৯।

১২৫ তাঁর প্রকৃত নাম মিহরান, তাঁর উপনাম আবূ 'আবদির রহমান। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আযাদকৃত দাস এবং খাদিম ছিলেন। তিনি বহু বোঝা একসাথে বহন করতে পারতেন, তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে 'সাফীনা' উপাধি প্রদান করেন। খুলাফায়ে রাশিদূন (রা.)-এর যুগের পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্র. আহমাদ : ***সফওয়াতুস সাফাওয়া***, ১ম খ. পৃ. ৬৭১।

১২৬ ***সুনানুত তিরমিযী***, كِتَاب الْفِتَنِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَا جَاءَ فِي الْخِلَافَةِ, হাদীস নং ২১৫২; ***সুনানু আবী দাউদ***, كِتَاب السُّنَّةِ অনুচ্ছেদ- بَاب فِي الْخُلَفَاءِ, হাদীস নং ৪০২৮ ও ৪০২৯।

রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং খুলাফায়ে রাশিদূন (রা)-এর বিশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করে বলেছেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে অত্যধিক দয়ার অধিকারী আবূ বকর। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের মাঝে অত্যধিক কঠোর উমর (রা)। তাদের মাঝে অত্যধিক লাজুক প্রকৃতির উসমান। আর তাদের মাঝে অত্যধিক ন্যায়বিচারকারী 'আলী (রা)।"[১২৭]

খলীফাগণ ছিলেন সদাসতর্ক এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রদর্শিত নীতির উপর অটল ছিলেন। এজন্য তাঁদেরকে রাশিদূল বা Righty Guided or Perfect অর্থাৎ সঠিক পথে পরিচালিত বা যথাযথ কাজ সম্পন্নকারী বলা হয়।[১২৮] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশিদূন (রা) উম্মতের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'Encyclopedia Rashidun' গ্রন্থে বলা হয়েছে- "The rule of the Rashidha was Islam's first experience without the leadership of the Prophet Muhammad (sm). His example, however, in both private and public life, came to be regarded as the norm (sunnah) for his successors, and a large and influential body of ansar (companions of the Prophet) kept close watch on the caliphs to insure their strict adherence to divine revelation (the Quran) and the sunnah. the Rashidun:has assumed all of Muhammad's duties except the prophetic: as imam's they led the congregation in prayer at the mosque; as khatibs, they delivered the Friday sermons; and as umara al-muminin (commanders of the faithful) they commanded the army. the caliphate of the Rashidun, in which virtually all actions had religious import."[১২৯]

এ কথা সত্য যে 'খুলাফায়ে রাশেদীনগণই' (১১/৬৩২-৪০/৬৬১) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শকে শুধু টিকিয়েই রাখেননি বরং ফুলে ফলে সুশোভিত করে তোলেন। তাঁরা একাধারে ছিলেন ন্যায়বিচারক, যোগ্যতম প্রশাসক, রণাঙ্গনে সুদক্ষ সেনাপতি এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সত্যিকার সার্থক উত্তরাধিকারী। তাঁদের ত্রিশ বছরের খিলাফতের[১৪৬] প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এ বিষয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিশ্ব ইতিহাসে তাঁরা ছিলেন সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ খলিফা বা রাষ্ট্র প্রধান। তাঁদের শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বিশ্বের ইতিহাসে তা সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করেছে। শুধু মুসলিম ঐতিহাসিকগণই নন, অমুসলিম এমনকি ইসলাম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণও খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকালকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলে

---

১২৭ ***সুনানু ইব্ন মাজা***, আল-মুকাদ্দিমা অংশ, كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ অনুচ্ছেদ- بَاب فَضَائِلِ خَبَّابٍ ﷺ, হাদীস নং ১৫১।

১২৮ Editors : ***Encyclopedia RASHIDUN*** শিরোনাম, England, 2004.

১২৯ পূর্বোক্ত।

আখ্যায়িত করেছেন।[১৩০] তন্মধ্যে বিশ্ববিজেতা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থপতি উমর (রা) তাঁর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা মানুষের অধিকার, মর্যাদা, সম্পদের নিরাপত্তা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা, সমান অধিকার, যুলুমের প্রতিবাদ, সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং মানবাধিকার-সমূহ পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সকল নজীরবিহীন কর্মকাণ্ডের জন্য বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে সকল ধর্মের মানুষের নিকট অনন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে চিরভাস্বর হয়ে আছে।

আবূ হামেদ ইমাম গাযালী তাঁর إحياء علوم الدين কিতাবে লিখেছেন:

واعتاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত অভিমত হলো: রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকল সাহাবা দোষমুক্ত বা অন্যায় করা থেকে পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা (কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে) তাঁদের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন এবং স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁদের প্রশংসা করেছেন।"[১৩১]

সাহাবীগণের আদালত ও ন্যায়পরায়ণতার স্বীকৃতি, দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয় এবং তাঁদের সমালোচনা পরিহার পরিহার করে প্রশংসা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। এ প্রসংগে খতীব আল-বগদাদী তাঁর 'আল-কিফায়াতু ফী 'ইলমির রিওয়াইয়াহ" কিতাবে এবং 'আল্লামা সাফারেনী শামছুদ্দীন আবুল 'আওন মুহাম্মদ হাম্বলী (রহ. মৃ. ১১৮৮হি) তাঁর 'লাওয়ামি'উল আনওয়ারিল বাহিয়্যা' কিতাবে লিখেছেন:

والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة ، بإثبات العدالة لهم ، والكف عن الطعن فيهم ، والثناء عليهم ، فقد أثنى الله سبحانه عليهم في عدة آيات من كتابه العزيز ، على أنه لو لم يرد عن الله ولا عن رسوله فيهم شيء لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة ، والجهاد ، ونصرة الدين ، وبذل المهج والأموال ، وقتل الآباء والأولاد ، والمناصحة في الدين ، وقوة الإيمان واليقين ، القطع بتعديلهم ، والاعتقاد لنزاهتهم ، وأنهم أفضل جميع الأمة بعد نبيهم ، هذا مذهب كافة الأمة ، ومن عليه المعول من الأئمة

"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মতিক্রমে অভিমত হলো: সাহাবাগণ অন্যায় করা থেকে মুক্ত। তাঁদের আদালত ও ন্যায়পরায়নতা স্বীকৃত, সমালোচনা পরিহার

---

১৩০ মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম : ***খিলাফাতে রাশেদা***, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৪২১/২০০০), পৃ. ২৯।
১৩১ আবূ হামেদ ইমাম গাযালী : إحياء علوم الدين খ. ১ম, পৃ. ১২৪।

পরিত্যাজ্য এবং তাঁদের জন্য আন্তরিক প্রশংসা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। কেননা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁদের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। এমনকি তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের কোন প্রশংসা নাও করতেন, তবুও তাঁদের হিজরত-সহযোগিতা ও জিহাদ, আল্লাহর পথে জান-মাল ব্যয় ও পিতা-পুত্রদের ইসলামের জন্য ত্যাগ, দ্বীনের ব্যাপারে পরস্পরের কল্যাণ কামনা এবং ঈমানীশক্তি ও কর্মের দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়নতার ও শক্তিশালী বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণাবলীর কারণে নবীর পরেই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে স্বীকৃত। যা ইমামদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং এর উপর উম্মতের সার্বজনীন আকীদা ও বিশ্বাস।"[১৩২]

অনুরূপভাবে 'আল্লামা মুহাম্মদ 'আবদুর রউফ আল-মানাওয়ী তাঁর فيض القدير شرح الجامع الصغير কিতাবেও উল্লেখ করেছেন।[১৩৩]

খতীব আল-বগদাদী তাঁর 'আল-কিফায়াতু ফী 'ইলমির রিওয়াইয়াহ" কিতাবের বর্ণনায় ইমাম মুসলিম (রহ)-এর বিশিষ্ট উস্তাদ ইমাম আবূ যুরআহ (রহ) বলেন:

عن محمد بن سليمان التستري ، يقول: سمعت أبا زرعة ، يقول: " ذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن القرآن حق ، والرسول حق ، وما جاء به حق ، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة ، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة ، فيكون الجرح به أليق ، والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق"

"কাউকে তুমি যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সাহাবীর অবমাননা করতে দেখো তাহলে ধরে নিও যে, লোকটি যিন্দিক বা ধর্মহীন। কেননা কুরআন সত্য, রাসূল সত্য, তাঁর আনীত শিক্ষা ও আদর্শ সত্য। কিন্তু সাহাবাগণের মাধ্যম ছাড়া সেগুলো আমাদের হাতে আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং সাহাবা চরিত্রে কলঙ্কলেপন করা কুরআন সুন্নাহকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। তাই এ নরাধমটার গায়ে কলঙ্ক মেখে ভ্রষ্ট ও যিন্দিক আখ্যা দেয়াই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত।"[১৩৪]

মোটকথা হলো, সাহাবীদের বিষয়ে আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আকীদার সংক্ষিপ্তের বিবরণ :

---

১৩২ খতীব আল-বগদাদী : ***আল-কিফায়াতু ফী 'ইলমির রিওয়াইয়াহ***, খ. ১ম, পৃ. ১১৮।

১৩৩ 'আল্লামা মুহাম্মদ 'আবদুর রউফ আল-মানাওয়ী : فيض القدير شرح الجامع الصغير , খ. ২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৫।

১৩৪ খতীব আল-বগদাদী : ***আল-কিফায়াতু ফী 'ইলমির রিওয়াইয়াহ***, باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة, খ. ১ম, হাদীস নং ১০৪, পৃ. ১১৯।

০১. সাহাবাগণের ঈমানীশক্তির দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়নতার কারণে নবীর পরেই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে স্বীকৃত।[১৩৫]

০২. আল্লাহ পাক সাহাবীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 'সাহাবী' হিসেবে নির্বাচন করেছেন।"[১৩৬]

০৩. সাহাবীগণ রাসূল (সা)-কে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন, তিনি তাঁদেরকে ওহী ভিত্তিক উপদেশ দিতেন।"[১৩৭]

০৪. ওহীলব্ধ জ্ঞানের কারণে সাহাবাগণের অন্তর শান্তিপূর্ণ ও যবান পবিত্র।[১৩৮]

০৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁদের গুণের প্রশংসা করেছেন।[১৩৯]

০৬. প্রত্যেক সাহাবীই ন্যায়পরায়ন।[১৪০] আল্লাহ ও রাসূল (সা) তাঁদের পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়নতার প্রশংসা করেছেন।[১৪১] যে ব্যক্তি সাহাবীদের অবমাননা করে সে যিন্দিক বা ধর্মহীন।

০৭. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যেক সাহাবী জান্নাতী। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁরা জাহান্নামে যাবে না।[১৪২]

০৮. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর أَهْلِ بَيْتٍ ফাতিমা (রা) বেহেশতের নারীদের নেত্রী[১৪৩] এবং হাসান ও হুসাইন বেহেশতের যুবকদের নেতা।[১৪৪]

০৯. যারা সাহাবাদেরকে ঘৃণা করবে তারা ধ্বংসপ্রপ্তদের পর্যায়ভুক্ত হবে।[১৪৫]

১০. সাহাবাদের প্রতি ঘৃণাপোষণ করা কুফুরী, মুনাফেকি ও সীমালঙ্ঘন।"[১৪৬]

---

১৩৫ সাফারেনী, শামছুদ্দীন আবুল আওন মোহাম্মদ হাম্বলী : ***লাওয়ামি'উল আনওয়ারিল বাহিয়্যা***, খ. ২, পৃ. ৩৮৮।

১৩৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) ১ম সং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

১৩৭ মুহাম্মদ খলীল হিরাস : شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

১৩৮ প্রাগুক্ত।

১৩৯ সূরা আল-হাশর, আয়াত নং ১০।

১৪০ ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী : ***ফাতহুল বারী***, খ. ১১, হাদীস নং ৫০৮০, খ. ১৫, পৃ. ৪৪৫।

১৪১ সা'ঈদ ইব্ন 'আলী ইব্ন ওহাব আল-কাহতানী : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري খ. ২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

১৪২ সূরা আম্বিয়া: ১০১।

১৪৩ ***সহীহুল বুখারী***, كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ- بَاب مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ ﷺ; ***সুনানুত তিরমিযী***, অনুচ্ছেদ- بَاب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﷺ হাদীস নং ৩৭১৪।

১৪৪ ***সুনানুত তিরমিযী***, بَاب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ হাদীস নং ৩৭১৪।

১৪৫ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

১৪৬ আহমদ ইব্ন 'আবদুর রাজ্জাক আদ-দাওসী : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৪৭০।

১১. মুহাম্মদ (সা)-এর প্রত্যেক স্ত্রী (أُمهات المؤمنين) "মু'মিন বান্দাগণের মা।"[১৪৭] তাঁরা অপবিত্রতা থেকে মুক্ত।[১৪৮] খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং আয়েশা বিনতে আবী বকর (রা) মর্যাদা স্বতন্ত্র ও সর্বশীর্ষে।[১৪৯]

১২. সাহাবাগণ আল্লাহর বন্ধু ও তাঁর গুণেগুণান্বিত, সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ[১৫০] এবং নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পরে এ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরকালে চূড়ান্ত সাফল্য নিশ্চিত।"[১৫১]

১৩. আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট এবং আমলে সালেহ কবুল হওয়ার কারণে সাহাবাগণও তাঁর উপর সন্তুষ্ট।[১৫২]

১৪. যে ব্যক্তি সাহাবীদেরকে ঘৃণা করে, সে যেনো আল্লাহ ও রাসূল (সা)-কে ঘৃণা করে।[১৫৩] এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে পাকড়াও করবেন।[১৫৪] ঘৃণা পোষণ করা হারাম এবং কুফুরী।

১৫. সাহাবাদের ব্যাপারে অবশ্যই উত্তম এবং ভালো আলোচনাই করতে হবে।[১৫৫]

১৬. সাহাবাগণ خير الناس 'সর্বোত্তম মানুষ'।[১৫৬] সাহাবীকে গালমন্দ বা কটূক্তি না করার নির্দেশ।[১৫৭]

১৭. সাহাবাগণের দোষারোপ বা সমালোচনা করা করা التحريم شديد حرام 'জঘন্যতম হারাম।'[১৫৮]

১৮. সাহাবাগণ প্রত্যেকেই সর্বোত্তম ব্যক্তি। আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১৫৯]

---

১৪৭ প্রাগুক্ত।

১৪৮ আল-কুরআনুল কারীম : ৩৩ ***সূরা আল-আহযাব***, আয়াত নং ৩২-৩৩।

১৪৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

১৫০ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) পৃ. ১৪৩।

১৫১ আল-কুরআনুল কারীম : ***সূরা আত-তাওবা***, আয়াক নং ১০০।

১৫২ আন-নুহাস : ***মা'আনিল কুরআন***, খ. ৩য়, পৃ. ২৪৮।

১৫৩ ***আল-জামি'উত তিরমিযী***, كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ- بَاب فِيمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ হাদীস নং ৩৭৯৭।

১৫৪ প্রাগুক্ত।

১৫৫ কামসুদ্দীন আয-যাহবী : ***সিয়ারু আ'লরামিন নুবালা***, খ. ৮ম. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

১৫৬ আবূ বকর আস-সারখাসী : أصول السرخسي খ. ১ম, (প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি), পৃ. ৩১৩।

১৫৭ ***সহীহুল বুখারী***, كِتَاب الْمَنَاقِبِ অনুচ্ছেদ- بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ, হাদীস নং ৩৩৯৭।

১৫৮ পূর্বোক্ত।

১৫৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح , খ. ১ম, পৃ. ১৩৬।

১৯. সাহাবাগণের অন্তরে আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চূড়ান্ত আদর্শ বিরাজমান।[১৬০]

২০. সাবাহাবাগণের জামা'আত অপরাধ থেকে মুক্ত।[১৬১]

২১. সাহাবাগণের ন্যায়পরায়নতার বিষয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা') বা ঐক্যমত রয়েছে।"[১৬২]

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যেক সাহাবীই ন্যায়পরায়ন ছিলেন। সাহাবাগণের ঈমানীশক্তির দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়নতার কারণে নবীর পরেই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে স্বীকৃত। আল্লাহ তা'আলা সাহাবাগণের জামা'আতকে অপরাধ থেকে মুক্ত রেখেছেন। তাঁদের অন্তরে আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চূড়ান্ত আদর্শ বিরাজমান ছিলো। তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অনেক আয়াতে এবং রাসূল (সা)-এর বহু হাদীসে তাঁদের পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়নতার প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট বিধায় প্রত্যেক সাহাবী জান্নাতী। নবী ও রাসূলগণের পর পৃথিবীতে তাঁরা যেমন خير الناس 'সর্বোত্তম মানুষ' পরকালেও তাঁরা 'সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী'। সাহাবীগণকে ঘৃণা পোষণ, তাঁদের দোষারোপ, সমালোচনা, গালমন্দ বা কটূক্তি করা জঘন্যতম হারাম, মুনাফেকি, সীমালঙ্ঘন এবং স্পষ্ট কুফুরী। এমন ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্তদের পর্যায়ভুক্ত হবে। অনেক ইতিহাসবেত্তা না বুঝে কোন কোন সাহাবীর সমালোচনার স্পর্ধা দেখান। যা মোটেও ঠিক নয়। আধুনিক সমাজ ও তথ্য প্রযুক্তির যুগে "সাহাবাদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আকীদা" প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম।

---

১৬০ ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى, খ. ১ম, পৃ. ১০৩।

১৬১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল হামীদ আল-আসারী : الوجيز في عقيدة السلف الصالح, খ. ১ম, পৃ. ১৩৬।

১৬২ আবুল হাসান আল-মালেকী : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني, খ. ১ম, পৃ. ৩৪৭।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

ইসলামি ঐক্যদর্শন ও মুসলিম উম্মাহ : পর্যালোচনা

ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল*

[**Abstract:** About one third of the total population of the world is a follower of this (Islam). The main principle of Islam is unity. To form a united nation based on faith in religion, that nation is called the Muslim Ummah. There are clear instructions in this regard in the Quran and Hadith. On the basis of all these principles and guidelines, the unity philosophy of Islam has been developed. The last prophet of Islam, Hazrat Muhammad (sm) and his followers set an example in establishing a united Muslim Ummah according to the philosophy of Islam. But the Muslim Ummah in today's world does not follow the unity of Islam. Today they are divided into numerous factions in the country. The poison of disunity and division exists in the veins and blood cells of Muslim society. The existence, prosperity and development of the Muslim Ummah depend on removing this disorder. The Muslim Ummah can regain its lost glory and lost heritage through dedicated practice and adherence to the unity philosophy of Islam.]

Key words: Islam, Unity, Philosophy, Ummah, Development

১. ভূমিকা

মুসলিম উম্মাহ এক অভিন্ন মানবগোষ্ঠী, যার অভিন্নতা ও একতার মূলভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান। পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান এনে এ উম্মাতের সদস্য হয়ে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। সৎ কাজের আদেশ দিয়ে, অসৎ কাজের নিষেধ করে মানবিক বিশ্ব গড়ে তুলতে পারে। অতীতে মুসলিম উম্মাহ ঈমানের একতায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষপূর্ণ শান্তিময় এক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্র, অভ্যন্তরীণ অনাচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিমূখতা এবং বিশেষভাবে ঐক্যের কেন্দ্র ঈমানের ব্যাপারে উদাসীনতা মুসলিম উম্মাহকে পতনের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। তৈরি হয় ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, অঞ্চল, মতবাদ ইত্যাদি নানা কেন্দ্রীক দল-উপদল। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিদ্যমান 'সুদৃঢ় প্রাচীরের'[১] ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন স্বার্থ ও দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত এই দল-উপদলগুলো একে অন্যের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। পরিণতিতে

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১ "যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।" *আল-কুরআন*, ৬১ : ৪

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রান্তের এক সময়ের শাসকগোষ্ঠী মুসলিমরা সহসাই পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমরের ধ্বংসময়তা সাম্রাজ্যবাদী ধারায় কিছুটা পরিবর্তন আনে। পৃথিবীর অসংখ্য দেশের পাশাপাশি অনেকগুলো মুসলিম দেশও স্বাধীন স্বকীয় সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে আর কাঙ্ক্ষিত ঐক্য গড়ে ওঠে না। দেশে দেশে তো বটেই বরং একই দেশের মুসলিমদের মধ্যে এখনো শীআ, সুন্নী, মাযহাবী, লা মাযহাবী, সালাফী, ওহাবী, সুফী, তরীকতপন্থী ইত্যাদি বহুবিধ দল-উপদলের বিভক্তি মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক উন্নয়নের পথে এক প্রবল অন্তরায় হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। এ অবস্থা অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত এবং অবশ্যই ইসলামের ঐক্য দর্শনের পরিপন্থী বিষয়। নিজেদের কল্যাণের স্বার্থে মুসলিম উম্মাহকে এ অবস্থার নিরসন করতে হবে। মুসলিম হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ও শান্তিপূর্ণ মহাবিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে তাদেরকে আবারও ইসলামের ঐক্য দর্শন ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ প্রবন্ধে ইসলামের ঐক্যদর্শন এবং তার আলোকে মুসলিম উম্মাহর করণীয়সমূহ নির্দেশ করা হয়েছে।

২. গবেষণা পদ্ধতি

মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণা প্রবন্ধটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে গুণাত্মক, বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত ফলাফল যথাবিধি উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. সাহিত্য পর্যালোচনা

ইসলামি মুসলিম জাতির ঐক্য নিয়ে অনেকগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ইবন তাইমিয়ার *মুসলিম উম্মাহর ঐক্য* (ভূমিকা ও টীকা: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, অনুবাদ: সালমান মাসরুর), মুফতি মুহাম্মদ শফীর *উম্মাহর প্রতি ঐক্যের আহ্বান* (অনুবাদ: আবদুল্লাহ আল মাসউদ), মুহাম্মদ আবদুল মালেকের *উম্মার ঐক্য : পথ ও পন্থা*, ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরের *কুরআন সুন্নাহর আলোকে জামায়াত ও ঐক্য*, এমামুদ্দীন মোঃ ত্বহার *ইসলামী ঐক্য*, আশরাফ আলী থানবীর *উম্মতের ঐক্য*, ডা. জাকির নায়েকের *মুসলিম উম্মাহর ঐক্য* প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থগুলোতে বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যের কারণ ও তা প্রতিকারের উপায় বলা হয়েছে। ঐক্যদর্শন বা ঐক্যের দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি।

৪. গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

ইসলামি ঐক্যদর্শন ও মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক দিক নিয়ে গবেষণা বর্তমান সময়ের একটি অত্যাবশ্যক কাজ। সারাবিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানরা আজ অসংখ্য দল ও মতে বিভক্ত। তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন বিষয়ের মতদ্বৈততায় তারা পরস্পরের ভাইয়ের পরিবর্তে শত্রুতে

পরিণত হয়েছে। ইসলামের ঐক্যদর্শন ও মুসলিম উম্মার ঐক্যের ভিত্তিগুলো নিয়ে গবেষণা করলে এ অবনতি রোধের উপায় উদ্ভাবন সম্ভব হবে।

৫. উম্মাহ পরিচিতি

'উম্মাহ' একটি তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এটি শব্দগতভাবে একবচন হলেও অর্থগতভাবে বহুবচন।[২] এর অর্থ দল, গোষ্ঠী, জাতি, জনসমষ্টি, নবীর অনুসারী প্রভৃতি। এছাড়া কল্যাণকর, মর্যাদা, সময়, শরীআত ইত্যাদি অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[৩] উম্মাহর ইংরেজি অর্থ Community যা বিশ্বাস বা ভৌগোলিকভাবে অভিন্ন একটি জাতিকে বুঝায় যাকে 'a super-national community with a common history' বলা যায়।[৪] আল-কুরআনে পশু, পাখি, জিন ও মানুষ প্রমুখের জাতি বুঝানোর জন্যে উম্মাহ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণ পরিভাষায় উম্মাহ হলো একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে বংশীয় ঐক্য, ধর্মীয় একাত্মতা কিংবা ভৌগোলিক সহঅবস্থানের জন্য যেকোনো ধরনের অভিন্ন সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। আল-কুরআনে তিনটি পারিভাষিক অর্থে উম্মাহ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। **প্রথমত,** উম্মাহ অর্থ একটি অপরিহার্য অভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা। এ অভিন্নতা ধর্মীয় বা বংশীয় বা ভৌগোলিক ঐক্যের ভিত্তিতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই বা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোনো পাখি ওড়ে না, যা তোমাদের মতো উম্মাহ নয়।"[৫] **দ্বিতীয়ত,** উম্মাহ অর্থ পৃথিবীর সকল মানুষ। এ অর্থে জাতি হিসেবে পৃথিবীর সকল দেশ ও কালের মানুষের মধ্যে অভিন্ন সম্পর্ক বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা মানুষ আদি মাতাপিতা হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ)-এর সন্তান। এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মাহ।[৬] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মাহ করতে পারতেন।"[৭] **তৃতীয়ত,** উম্মাহ অর্থ এমন মানবগোষ্ঠী যাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা কোনো নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন। এ অর্থে অভিন্ন অঞ্চল ও সময়ে বসবাসকারী লোকদের উম্মাহ বলা হয়েছে। এ উম্মাহর সবাই সংশ্লিষ্ট নবী বা রাসূলের অনুসরণ না করলেও তারা এ পর্যায়ের উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত। এ অর্থে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "প্রত্যেক উম্মাতের জন্য রয়েছে একজন রাসূল।"[৮] আল-কুরআনের অন্যত্র রয়েছে, "আল্লাহর ইবাদত করার ও

---

২ সম্পাদনা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৭, পৃ. ২১৩

৩ ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *ইসলামী পরিভাষা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৩০৩

৪ M. Houtsma, *The Encyclopaedia of Islam,*Brill: 1987 pp. 125–126

৫ আল-কুরআন, ৬:৩৮

৬ আল-কুরআন, ২:২১৩

৭ আল-কুরআন, ৪২:৮

৮ আল-কুরআন, ১০:৪৭

তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক উম্মাহর মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি।"[৯] তবে কখনো কখনো শব্দটি প্রেরিত নবী-রাসূলের অনুসারীদের জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা হিদায়াতের ডাকে সাড়া দিয়েছে।[১০] আল-হাদীসেও উম্মাহ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন বলা হয়েছে, "বনু আউফের ইহুদিরা মুমিনদের সাথে একটি উম্মাহ।" এর তাৎপর্য হলো, বনু আউফের ইহুদিরা সন্ধিচুক্তির দরুন রাজনীতির দিক দিয়ে মুসলমানদের দলভুক্ত, যদিও তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী নয়।[১১] ঐতিহাসিক মদীনা সনদের প্রস্তাবনায় লিখা হয়েছিল, "এটা হচ্ছে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ হতে চুক্তি। কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুমিন ও মুসলমানদের মধ্যে এবং যারা তাদের অধীনে, তাদের সাথে শামিল হবে বা তাদের সাথে জিহাদে মিলেমিশে কাজ করবে। অন্যদের মুকাবিলায় তারা এক উম্মাহ বলে গণ্য হবে।[১২] এ সনদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদেরকে সম্মিলিত উম্মাহ বলা হয়েছে।[১৩] তবে আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যে সকল হাদীসে নবী করীম (সা)-এর উম্মাতের সংখ্যার উল্লেখ আছে[১৪] কিংবা নিজের উম্মাতের জন্য নবী করীম (সা)-এর দুআর উল্লেখ রয়েছে[১৫] অথবা সকল উম্মাতের চেয়ে তাঁর উম্মাতের অধিকতর মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে[১৬] অথবা উম্মাতের ভ্রান্তির উপর সংঘবদ্ধ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে[১৭] অথবা যেখানে জান্নাতের অধিবাসীদের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ তাঁর উম্মাহ হওয়ার কথা রয়েছে[১৮] এ সকল হাদীসে

---

৯ আল-কুরআন, ১৬:৩৬

১০ আবূ আব্দিল্লাহ্ মাহমূদ ইবন উমার আল-জামাখশারী, *আল-কাশ্শাফু আন হাকায়িকিল গাওয়ামিজিত তানযীল ওয়া উয়ূনুল আকাবীল ফী উজুহিত তা'বীল*, মিশর: মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৩৮ খ্রি.,১খ, পৃ. ৯১

১১ ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়া*, বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী, ১৩৯২ হি, ১খ, পৃ. ৫৩

১২ ইবন হিশাম, *সীরাতুন নবী (সা.)*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০১৩, ২খ, পৃ. ১৭৫-৭৬

১৩ ReuvenFirestone, *Jihād: The Origin of Holy War in Islam*, New York: Oxford University Press, 1999, p. 118

১৪ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, বৈরুত: ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, ১৪০২ হি, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৩৭৬

১৫ প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২৯

১৬ আবূ আব্দিল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ আহমদ*, কায়রো : মুয়াস্সাসাতু কুরতুবা, তাবি ৫খ, পৃ. ৩৮৩

১৭ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *জামে আত- তিরমিযী*, বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত্-তুরাছিল আরাবী, ১৪২১হি কিতাবুল ফিতান

১৮ আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরাহ আল-বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ আল-মুসনাদ মিন উমূরি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি*, বৈরূত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., খ. ১ কিতাবুল আম্বিয়া

উম্মাহ দ্বারা একান্তভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সে সকল উম্মাতের কথাই বলা হয়েছে, যারা তাঁর দাওয়াহ কবূল করেছে।

৬. আল-কুরআনে ইসলামের ঐক্যদর্শন

কুরআনুল কারীম মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী, অবিনাশী মহাগ্রন্থ। হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে এ মহাগ্রন্থ তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উপর নাযিল করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিধি ও নীতি প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী পৃথিবীর সকল দেশ ও কালের মানুষের জন্য তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন এবং এর মধ্যদিয়ে উম্মাহ বিশ্বজনীন রূপ লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।"[১৯] এ কারণেই মহান আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেছেন: "বলুন, হে মানবমণ্ডলি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।"[২০] এভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পর তাঁর শিক্ষা ও দর্শনের ভিত্তিতে'উম্মাতে মুহাম্মদী' গঠিত হলো। বংশ ও দেশ নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষকে এতে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হলো। ফলে উম্মাতে মুহাম্মদী বিশ্বব্যাপী এমন একটি জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সমর্থ হলো যাতে আরব ও অনারব, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকলো না। নবী করীম (সা) যখন মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন, তখন তিনি এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মীয় পার্থক্য থাকার পরও অমুসলিম-মুসলিম সকল লোকই সে সমাজের সদস্য হলো। ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক, নাস্তিক, যাযাবর - কারো মধ্যে পার্থক্য করা হলো না। মানবজাতির ঐক্যের ধারণাকে বাস্তবরূপ দেয়ার প্রচেষ্টা এর মাধ্যমে শুরু হলো। পরবর্তীতে নবী করীম (সা)-এর এ আদর্শ সমাজ তিনটি মহাদেশে বিস্তৃত হলো। অমুসলিম-মুসলিম, আরব-অনারব সকলে এ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলো। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে স্ব স্ব ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতাসহ এ সমাজের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হলো। এ সমাজব্যবস্থা বিশ্বমানব সমাজের ধারণার দিকে নিঃসন্দেহে ছিল সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ। মুসলিম উম্মাহর একতাবদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা, উপযোগিতা ও কারণ বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এভাবে

---

১৯ *আল-কুরআন*, ২১:১০৭

২০ *আল-কুরআন*, ৭:১৫৮

আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎ পথ পেতে পার।"[২১] মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,"তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।"[২২] মহান আল্লাহ আরো বলেন, "তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[২৩] উপরোক্ত আয়াতগুলোর আলোকে বলা যায় যে, ঈমান আনার অর্থ হলো ঐক্যবদ্ধ থাকার ঘোষণা দেয়া, আল্লাহ তা'আলা ও নবী করীম (সা)-এর অনুগত থাকার ঘোষণা দেয়া, ঐক্যবদ্ধ থাকার দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করা। একটি চমৎকার দৃশ্যকল্প দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ঈমান আনার পরের অনৈক্যমূলক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা সেই নারীর মত হয়ো না, যে তার সূতা মযবুত করে পাকানোর পর এর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়।"[২৪]

মুসলিম উম্মাহ একতাবদ্ধ থাকলে তারা পৃথিবীর মালিক হবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধ পক্ষ তা কখনো চায় না। এ কারণে তারা মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য বিদ্যমান রাখতে চায়। তাদের মধ্যে মতবিরোধ জিইয়ে রেখে তাদেরকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করতে চায়। কারণ এতে মুসলিমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন অন্যদের পক্ষে তাদেরকে পদানত করা সম্ভব হবে। ফেরাউন হযরত মূসা (আ)-এর সময়কালে এ কাজই করেছিল। আল-কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল। তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং কন্যাদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।"[২৫] ইসলামের সর্ববাদী ঐক্য ও সমন্বিত জীবন দর্শনের জন্য যারা বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠোর হুমকি রয়েছে। তিনি বলেছেন, "যারা তাদের দীন সম্পর্কে নানা মত তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের কোন দায়িত্ব আপনার নয়। তাদের ব্যাপার আল্লাহর অধিকারভুক্ত। এরপর তারা যা করতো সে সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিবেন।"[২৬] আল্লাহর আদেশ অনুসারে ঐক্যবদ্ধ না থেকে নিজ নিজ বুঝ অনুসারে দীনকে আলাদা করে নেয়া এবং সে হিসেবে জীবনযাপন করাকে আল্লাহ তা'আলা বিভ্রান্তি হিসেবে

---

২১ *আল-কুরআন*, ৩:১০৩
২২ *আল-কুরআন*, ৩:১০৪
২৩ *আল-কুরআন*, ৩:১০৫
২৪ *আল-কুরআন*, ১৬:৯২
২৫ আল-কুরআন, ২৮:৪
২৬ আল-কুরআন, ৬: ১৫৯

আখ্যায়িত করেছেন। আখিরাতে ভয়ঙ্কর পরিণতির পূর্ব পর্যন্ত এ জাতীয় লোকদের তাদের বিভ্রান্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের উম্মাহ নিশ্চয় একই উম্মাহ। আমি তোমাদের প্রতিপালক। তাই আমাকেই ভয় কর। কিন্তু তাদের অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। তাদের প্রত্যেক দলই তাদের নিজ নিজ আচরণ, রীতি ও বিশ্বাস নিয়ে সন্তুষ্ট আছে। সুতরাং কিছু সময়ের জন্য তাদেরকে নিজ নিজ বিভ্রান্তির মধ্যে ছেড়ে দিন।"[২৭] দীনে বিভ্রান্তি ও মতদ্বৈততা সৃষ্টির এ কাজকে আল্লাহ মুশরিকদের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের দীনে নানারকম মতবিরোধ তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল ও আনন্দিত রয়েছে।"[২৮]

মানুষের মধ্যে মানবিক ঐক্যকে আবশ্যক ঘোষণার জন্য আল্লাহ তা'আলা ওহীর ধারাবাহিকতার এক মনোরম বিবরণ দিয়েছেন। এতে তিনি ইসলামকে এক অনাদি জীবনব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোনো মতবিরোধ ব্যতীত একে প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য সে দীনকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন যে দীনের আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। যে ওহী আমি আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি। যে ওহী আমি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসার নিকট প্রেরণ করেছিলাম এই বলে যে, 'তোমরা আমার দীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে কোনো মতভেদ করো না।' আপনি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন, তা তাদের নিকট দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি মমতা দান করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অভিমুখী হয় আল্লাহ তাকে দীনের পথে পরিচালিত করেন। তারা (অবিশ্বাসীরা) কেবল তাদের নিজেদের মধ্যকার হিংসা–বিদ্বেষের কারণে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও পরস্পর মতবিরোধ করে। যদি আপনার প্রতিপালকের পূর্বনির্ধারিত সময় অনুসারে তাদেরকে সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত না থাকত, তাহলে তাদের মতবিরোধের ফায়সালা এখনই হয়ে যেতো। তাদের পরে যাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তারাও এ (কুরআন) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছে, যা তাদেরকে দ্বিধাগ্রস্ত করে রেখেছে।"[২৯] মুসলিমদের অনৈক্য তাদের ধ্বংস ও পরাজয়ের মূল কারণ। এটিই মুসলিম উম্মাতের বর্তমান দূরাবস্থার জন্য দায়ী। এ অবস্থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ যারা মতবিরোধ-অনৈক্য তৈরি করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যালিম হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং তাদের জন্য

২৭ আল-কুরআন, ২৩:৫২-৫৪

২৮ আল-কুরআন, ৩০:৩১-৩২

২৯ আল-কুরআন, ৪২:১৩-১৪

মহাশাস্তির অঙ্গীকার করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "এরপর লোকেরা বিভিন্ন মতভেদ তৈরি করলো। তাই যালিমদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর দিনের ভয়াবহ শাস্তি ভোগের দুর্ভাগ্য।"[৩০]

৭. সুন্নাহর ঐক্যদর্শন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বজাহানে মহাঐক্যের প্রতীক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশ্বজাহানের জন্য 'রহমত'[৩১] হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে মনোনীত করেছেন পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য 'উসওয়াতুন হাসানা' বা সর্বোত্তম আদর্শ[৩২] হিসেবে। সুন্নাহ হলো তাঁর মহাজীবনের আদ্যান্ত মহাকাব্য – তাঁর জীবনাচার, বক্তব্য, নীতি ও কর্মকাণ্ড সমগ্র - যা তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও নির্দেশনাক্রমে নিজ জীবনে ও সমাজে বাস্তবায়ন করেছেন। ঐক্যের মহাপ্রতীক আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সুন্নাহে ঐক্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ রয়েছে, যা থেকে ঐক্য সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা ও দর্শনের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন আর তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। তিনি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন ১. তোমরা যদি একমাত্র তাঁরই 'ইবাদত কর, ২. তাঁর সাথে কাউকে শরীক না কর এবং ৩. আল্লাহর রশিকে সবাই মিলে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর ও বিভক্ত না হও। আর তিনি তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হন ১. এর-ওর কথা এখানে-সেখানে বলাবলি করলে, ২. বেশি-বেশি লাগামহীন প্রশ্ন করলে এবং ৩. ধন-সম্পদ নষ্ট করলে।"[৩৩] হযরত হারিছ আল-আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো হলো: ১. শুনতে হবে, ২. আনুগত্য করতে হবে, ৩. জিহাদ করতে হবে, ৪. হিজরত করতে হবে এবং ৫. ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, কেননা যে ব্যক্তি ঐক্যবদ্ধতা থেকে এক বিঘত পরিমাণ সরে যায়, সে ইসলামের বন্ধনকে তার গলা থেকে খুলে ফেলে যতক্ষণ না সে আবার ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়্যাতের ধ্বনি তুলে আহ্বান জানায় সে জাহান্নামের জ্বালানি হবে। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি সে নামায আদায় করে আর রোযা পালন করে (তার পরেও কি সে জাহান্নামের খড়ি হবে)? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যদিও সে নামায আদায় করে এবং রোযা পালন করে। সুতরাং তোমরা আহ্বান কর আল্লাহর দেয়া নামে যিনি

---

৩০ আল-কুরআন, ৪৩:৬৫

৩১ আল-কুরআন, ২১:১০৭

৩২ আল-কুরআন, ৩৩:২১

৩৩ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, পূর্বোক্ত, আল-আক্যিয়াহ, হাদীস নং ৪৪৫৬

তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিমীন, মুমিনীন, ইবাদাল্লাহ্ (ইত্যাদি)।[৩৪] আল-'ইরবায বিন সারিয়াহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন ফজরের নামাযের পর হৃদয়স্পর্শী ওয়ায করলেন, যাতে চোখগুলো থেকে অশ্রু ঝরে পড়লো আর অন্তরগুলো ভীত-বিগলিত হয়ে গেল। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এ তো বিদায়ী ভাষণ, (হে আল্লাহর রাসূল)! অতএব, আমাদেরকে আপনি কি নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন? তিনি (সা) বললেন, তোমাদেরকে ওছিয়ত করে যাচ্ছি, আল্লাহকে ভয় করার এবং হাবসী দাস (নেতা) হলেও তার কথা শোনার ও আনুগত্য করার জন্য, কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যে বেঁচে থাকবে সে অনেক বিরোধ দেখতে পাবে। তোমরা বিদ'আতী কর্মকাণ্ডসমূহ থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকবে, কেননা তা পথভ্রষ্টতা। আর আমার পর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ ঐ অবস্থা পাবে সে যেন আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরে এবং তোমরা তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থেকো।[৩৫]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তিনজন লোক যদি সফরে বের হয় তাহলে তারা যেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করে নেয়।[৩৬] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আল্লাহর সাহায্য ও নিরাপত্তা ঐক্যবদ্ধতার সাথে।"[৩৭]

হযরত আবূ দারদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, "কোন গ্রাম-শহর বা মরুভূমিতে যদি তিনজন মানুষ থাকে আর সেখানে নামায কায়েম না হয়, তাহলে তাদের উপর শয়তান জেঁকে বসে। সুতরাং তোমাদেরকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে কেননা নেকড়ে বাঘ দল-বিচ্ছিন্ন ছাগলকেই ধরে খায়।"[৩৮]

খলীফা 'উমর (রা) দামেস্কের জনপদ জাবিয়া'র ভাষণে বলেছেন, হে লোকেরা! আমি তোমাদের সামনে এমন অবস্থানে দাঁড়িয়েছি যেমন অবস্থানে নবী (সা) আমাদের সামনে দাঁড়াতেন। আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবীগণকে ধারণ করার জন্য বলছি, অতঃপর তাঁদের পর যারা আসবেন তাঁদের, অতঃপর তাঁদের পর যারা আসবেন তাঁদের ...। তোমরা অবশ্যই ঐক্যবদ্ধতাকে আঁকড়ে ধরবে আর বিভক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা শয়তান

---

৩৪ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *জামে আত- তিরমিযী*, পূর্বোক্ত, আবওয়াব আল-আমসাল, হাদীস নং ৩০২৩

৩৫ প্রাগুক্ত, আবওয়াব 'ইলম, হাদীস নং ২৮১৫

৩৬ আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশ, *সুনান*, রিয়াদ: দারুস্সালাম, ১৪২০হি, আল-জিহাদ, হাদীস নং. ২৬০৮

৩৭ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *জামে আত- তিরমিযী*, পূর্বোক্ত, ফিতান, হাদীস নং ২২৫৬

৩৮ আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশ, *সুনান*, পূর্বোক্ত, আস-সালাহ, হাদীস নং ৫৪৭

একজনের সাথে অবস্থান করে আর সে দুইজন থেকে বহুদূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের উত্তম স্থান চায় সে যেন ঐক্যবদ্ধতাকে আঁকড়ে ধরে।[৩৯]

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্(সা) বলেছেন, তোমরা কুধারণা পরিহার কর, কেননা কুধারণা হলো বড় মিথ্যা কথা, আর তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়িও না, পরস্পর গুপ্তচরবৃত্তি করো না, আড়াল থেকে ইঙ্গিত করে একে অপরের জিনিসের দাম বাড়িও না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ করো না, পরস্পর ঘৃণা করো না, একজন আরেকজন থেকে পিঠ ফিরিয়ে নিও না আর তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হিসাবে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও।[৪০]

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই এক মুমিনের সাথে আরেক মুমিনের সম্পর্ক ইমারত স্বরূপ, এরা একজন আরেক জনকে সুদৃঢ় করে। অতঃপর নবী (সা) তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলি আরেক হাতের আঙ্গুলগুলির ফাঁকে ঢুকিয়ে মিলিয়ে দিলেন।)[৪১]

হযরত নু'মান বিন বাশীর (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ভালোবাসা, দয়া-মায়া ও মনের আকর্ষণের দিক থেকে মুমিনদের পরস্পরের উদাহরণ হলো এক দেহের মত। ঐ দেহের একটি অঙ্গ যদি অসুস্থ হয়, তাহলে সারা দেহ ঘুমহীন ও জরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।[৪২] আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে হাত সরিয়ে নিবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ'র সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করবে যে, তার পক্ষে কোন দলিল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মারা যাবে অথচ তার কাঁধে বাই'য়াত বা আনুগত্যের শপথ নেই, তাহলে সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করবে।"[৪৩]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার আমীরের কোন কিছুকে অপছন্দ করে তাহলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে, কেননা যে ব্যক্তি শাসনকর্তার কর্তৃত্ব থেকে এক বিঘত পরিমাণ বেরিয়ে যায় ও মারা যায় সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করে।"[৪৪]

---

৩৯ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *জামে আত- তিরমিযী*, পূর্বোক্ত, আবওয়াব আল-ফিতান, হাদীস নং. ২২৫৪

৪০ আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরাহ আল-বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, আল-আদব, হাদীস নং ৬০৬৬

৪১ প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং. ৪৮১

৪২ প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৬০১১

৪৩ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, পূর্বোক্ত, আল-ইমারাহ, হাদীস নং ৪৭৭০

৪৪ আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরাহ আল-বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ৭০৫৩

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল আর ঐক্যবদ্ধ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হল, এরপর মারা গেল সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি ক্রোধান্ধ পতাকার তলে যুদ্ধ করে, গোত্রীয় জোটের জন্য অন্যায়ভাবে উত্তেজিত হয়, কিংবা অন্যায়গোত্রীয় জোটের সাথে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান করে অথবা গোত্র-জোটকে অত্যাচারে সহযোগিতা করে, আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপর চড়াও হয় আর ভাল মন্দ সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করে; তাদের মুমিনদেরকেও রেহায় দেয় না আর ওয়াদাকৃতের সাথে ওয়াদা পুরণ করে না, তাহলে সে আমার উম্মাতের অন্তর্গত নয়, আমিও তার অন্তর্গত নই।"[৪৫]

৮. ইসলামে ঐক্যের কেন্দ্র

ঐক্য ও মৈত্রী প্রশংসনীয় এবং কাম্য, এতে জগতের জাতি, ধর্ম, দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল মানুষ একমত। জগতের কোথাও এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদ-বিসংবাদকে উপকারী এবং উত্তম মনে করে। এ কারণে বিশ্বের সকল জনপ্রতিনিধি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ঐক্য উপকারী ও অপরিহার্য জানার পরও এবং এ ব্যাপারে সবাই একমত হওয়ার পরও মানবজাতি বিভিন্ন দল, উপদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এ কারণে আল্লাহ কেবল মৈত্রী, একতা, শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ হওয়ার নির্দেশই প্রদান করেনি, বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখার জন্য একটি ন্যায়ানুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে। মূলনীতিটি হলো, কোনো মানুষের চিন্তাজাত বা কিছু সংখ্যক লোকের তৈরি ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা যে, তারা এতে একতাবদ্ধ হয়ে যাবে, এটি বিবেক ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী আত্মপ্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সব মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক। কারণ ঐক্যের একটি বিশেষ কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা আবশ্যক। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে। কোথাও বংশগত সম্পর্ককে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। উদাহরণত আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কুরাইশকে এক জাতি ও বনু তামিমকে অন্য জাতি মনে করা হতো। কোথাও বর্ণগত পার্থক্যই ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের এক জাতি এবং শ্বেতাঙ্গদের অন্য জাতি মনে করা হয়েছে। কোথাও দেশগত ও ভাষাগত একত্বকে কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়েছে। ফলে কুয়েতের অধিবাসীরা একজাতি আর ইরানের অধিবাসীরা আরেকজাতি বলে গণ্য হয়েছে। কোথাও আবার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু নিয়ম-প্রথাকে ঐক্যের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। যারা এসব নিয়ম-প্রথা পালন করে না, তারা ভিন্নজাতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যেমন ভারতের

৪৫ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, পূর্বোক্ত, আল-ইমারাহ, হাদীস নং ৪৭৬৩

হিন্দুজাতি ও আর্যসমাজ। মহান আল্লাহ ঐক্যের এ সকল কেন্দ্রবিন্দুকে বাদ দিয়ে তাঁর দেয়া জীবনব্যবস্থা ইসলামকে ঐক্যের কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছে এবং দ্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীরা সবাই মিলে এক জাতি, যারা আল্লাহর রজ্জুর সাথে জড়িত এবং কাফিররা ভিন্ন জাতি, যারা এ রজ্জুর সাথে জড়িত নয়। তাই মুসলমানদের জন্য ঐক্যের পথে দুটি নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। প্রথমত, আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত জীবনব্যবস্থার অনুসারী হয়ে যাও। আর দ্বিতীয়ত, একে সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ করো, যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সুশৃঙ্খল ঐক্যবন্ধন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। হযরত নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় এমন ঐক্য প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে।

মুসলিমদের ঐক্যের প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলার পর আল্লাহ তা'আলা বিভেদ সৃষ্টি না করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কোনোভাবেই যেনো এ ঐক্য বিনষ্ট না হয় সে জন্য অবিরাম হিদায়াত প্রদান করেছেন। কারণ জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনের জন্য একটি শক্তিশালী ঐক্য-সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। এ কারণে দীনের মূলনীতির ব্যাপারে মুসলমানদের মতবিরোধ করার কোনো অবকাশ নেই। দীনের মূলনীতির কিছু কিছু শাখা-প্রশাখাও এমন সুস্পষ্ট যে, সে ব্যাপারে স্বার্থপরতা ও স্বার্থান্ধতা না থাকলে মতবিরোধের অবকাশ নেই। কিন্তু যে সকল শাখা-প্রশাখা অস্পষ্ট, সে সম্পর্কে কোনো আয়াত ও হাদীস না থাকার কারণে অথবা আয়াত ও হাদীসের বক্তব্য অস্পষ্ট থাকার কারণে যদি ইজতিহাদগত মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা ঐক্য বিনষ্টের কারণ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে না। মুসলমানদেরকে এ জাতীয় মতবিরোধ আত্মস্থ করতে হবে। কেননা হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন, "যদি কেউ ইজতিহাদ করে এবং সঠিক নির্দেশ প্রকাশ করে, তবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আর যদি ইজতিহাদে ভুল করে, তবুও একটি সওয়াব পাবে।"[৪৬] এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ফুটে ওঠে। তা হলো, শরীআত সম্মত ইজতিহাদী মতবিরোধে ইমাম যে পক্ষ অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে এক পক্ষ ভুল ও অপরপক্ষ সঠিক হলেও তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। তিনি হাশরের ময়দানে সঠিক ইজতিহাদকারী আলেমকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন এবং যার ইজতিহাদ ভুল হয়েছে, তাকে একটি সওয়াব দান করবেন। ইজতিহাদী মতবিরোধের কারণে এটি বলার অধিকার নেই যে, নিশ্চিতরূপে এ পক্ষ সঠিক এবং অন্য পক্ষ ভ্রান্ত। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে এক পক্ষকে কুরআন ও সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী মনে করে তবে সে এমন বলতে পারে যে, আমার মতে এ পক্ষটি সঠিক, কিন্তু ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আর এ পক্ষটি ভ্রান্ত, কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এ নীতিকথাটি ইমাম ও ফিকহবিদগণের নিকট স্বীকৃত। তাই যা অসৎ নয়, তাকে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আজকাল অনেক আলেমকে এবং মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এ

৪৬ প্রাগুক্ত

ব্যাপারে গাফেল দেখা যায়। তারা বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারীদের নিন্দা ও গালি-গালাজ করতেও দ্বিধা করে না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে যত্র-তত্র দ্বন্দ্ব, কলহ, বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। যা কোনক্রমেই দীনি আবেগ ও নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৯. ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মুসলিম উম্মাহর করণীয়

মুসলিম উম্মাহ এক আদর্শিক জাতি। ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে এ জাতির উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। ইসলামের শিক্ষা, নীতি, দর্শন ও মূল্যবোধ এ জাতির মূলীভূত চেতনার উৎস। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান ঐক্যহীন অবস্থায় নিজেদের অবস্থার সংশোধন, সম্পর্কের উন্নতি এবং পৃথিবীতে কাম্য ভূমিকা পালনের জন্য মুসলিম উম্মাহর জন্য নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করা আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়।

৯.১ ঈমান পোষণ : মানুষের শান্তি মানব রচিত বিধানে আসবে না। আল্লাহ তা'আলার বিধান ও নির্দেশনা মেনে নিলেই মানুষ শান্তি পাবে। পৃথিবীর সব প্রান্তে সুখ নেমে আসবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা হলেন স্রষ্টা। সৃষ্টির রহস্য এবং প্রকৃতি জানেন তিনি। সে জন্যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মাহের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও ক্ষমতায় ঈমান আনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "রাসূল তার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মুমিনরাও ঈমান এনেছে। তারা প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে, রাসূলগণের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না। তারা আরো বলে, আমরা শুনেছি এবং অনুগত হয়েছি। কাজেই হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আর ফিরে যাওয়া তো আপনার কাছেই।"[৪৭] রাসূলুল্লাহ (সা) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "বল আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, তারপর ঈমানের ওপর সুদৃঢ় থাকে।"[৪৮] তাই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মাহভুক্ত সকলের প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহর রাসূল (সা) যেভাবে ঈমান আনার আদেশ দিয়েছেন, সেভাবে ঈমান আনতে হবে।

৯.২ রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুসরণ: বিশ্বজনীন উম্মাহ মুসলিমদের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শ ও হিদায়াতের অনুসরণ করা। জীবনে তাঁর আদর্শের বাস্তবায়ন করা। কেননা তিনি সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বনবী। তাঁর জীবনদর্শন ও নীতি আদর্শের মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বশান্তির মূল নির্দেশনা। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন,"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে অনুসরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।"[৪৯] মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) হলেন

৪৭ আল-কুরআন, ২:২৮৫

৪৮ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, পূর্বোক্ত

৪৯ *আল-কুরআন*, ৩২:২১

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের বাতিঘর। তাই তারা যদি তাঁকে সঠিকভাবে অনুসরণ করে, তাঁর আদর্শ জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে তাহলে সর্বোতভাবে এক সুমহান ঐক্যের বন্ধনে তারা গ্রন্থিত হতে সক্ষম হবে।

৯.৩ সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করা: মুসলিম জাতির মধ্যে অন্যায় আচরণ অসৎকর্ম অব্যাহত থাকলে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। বিশ্বশান্তি ও সংহতি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে। এ অবস্থা নিরসনের জন্যে প্রয়োজন সৎকর্ম প্রবর্তন এবং অসৎকর্ম বন্ধ করা। তাহলে বিশ্ববাসী সুখে থাকবে। শান্তির প্রকৃত আলোয় তাদের জীবন উদ্ভাবিত হবে। উম্মাহর মধ্যে একতা ফিরে আসবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন উম্মাহ মুসলিমদের দায়িত্ব সীমাহীন। তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের কাছে সত্য ও সুন্দর উপস্থাপন করা। অসৎকজের ক্ষতিকর ও খারাপ দিকগুলো তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা। সম্ভব হলে মানুষকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা উত্তম জাতি। মানুষের কল্যাণের জন্যে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে আর ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর।"[৫০] আল্লাহর আদেশ মেনে মুসলিম উম্মাহ যদি সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের এ ধারা প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেদের মধ্যে এবং সবশেষে সকল মানুষের মধ্যে চালু করতে সক্ষম হয় তাহলে উম্মাহ কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের পথে যথাবিধি অগ্রসর হতে সক্ষম হবে।

৯.৪ ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা: মানুষের পারস্পরিক অসহিষ্ণু ও শত্রুতামূলক সম্পর্কই বিশ্বে অনৈক্য সৃষ্টির মূল কারণ। মুসলিম উম্মাহ এ অবস্থা নিরসনে বাস্তব পদক্ষেপ নেবে। তারা সর্বসাধারণের সাথে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আওতায় ভাইয়ের মতো সম্পর্ক স্থাপন করবে। আর মুসলিমদের সাথে প্রতিষ্ঠা করবে সুদৃঢ় ঈমানি ভ্রাতৃত্ব। এর ফলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নত হবে। কাজেই মুসলিম উম্মাহ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল, দেশ, কাল নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে সবেচেয় বেশি তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।[৫১]

৯.৫ সহানুভূতি ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা: মুসলিম উম্মাহ দায়িত্বশীল উম্মাহ। তাদের যেমন নিজেদের প্রতি দায়িত্ব আছে তেমিন দায়িত্ব আছে অন্যদের প্রতিও। পারস্পরিক সহানুভূতি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা মুসলিম উম্মাহর এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ কাজ যাতে নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়। এর অনিবার্য সুফল হলো বিশ্বের সকল মানুষের

---

৫০ আল-কুরআন, ৩:১১০

৫১ আল-কুরআন, ৪৯:১৩

মধ্যে বিশেষত মুসলিম জাতির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে ওঠা। কেননা সৌহার্দ্যপূর্ণ সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয় ঐক্যের আহ্বানে। এতে কেউ কারো প্রতিপক্ষ হয় না। বরং প্রত্যেকে প্রত্যেকের দুঃখ-ব্যথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,"তুমি মুমিনদেরকে তাদের পরস্পরের প্রতি দয়া ও ভালবাসা প্রদর্শনে এবং পারস্পরিক সহানুভুতি দেখানোর ব্যাপারে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। যখন দেহের কোনো একটি অংশ কষ্ট অনুভব করে তখন এর জন্য পুরো দেহই নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।"[৫২]

৯.৬ মানবিক মর্যাদা ও অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠা: মানুষের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার সমান। মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই, পার্থক্য নেই। মানুষে মানুষে জন্মগত বা আদর্শগত কোনো ভেদাভেদ রাখা হলে তারা এক হতে পারে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে কোনো বিভেদ তৈরি করেননি। সুবিধাবাদী শাসক ও অভিজাতশ্রেণী নিজেদের স্বার্থের জন্যে এ বৈষম্য তৈরি করেছে। মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব হলো মানুষে মানুষে বিরাজমান এ বিভেদ বৈষম্য দূর করে দিয়ে মানবিক মর্যাদা ও অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এতে তারা সকলে সুদৃঢ় ঐক্যে উজ্জীবিত হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আরবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই অনারবদের ওপর এবং আরবদের ওপরও অনারবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি।"[৫৩]

৯.৭ ইনসাফপূর্ণ মিত্রতা-মীমাংসা প্রতিষ্ঠা: পারস্পরিক শত্রুতা, ঝগড়া-কলহ, যুদ্ধ ও সংঘাত বিশ্বশান্তির সবচেয়ে বড় বাঁধা। সংঘাতপূর্ণ ও অরাজক বিশ্ব পরিস্থিতি নীরবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ মুসলিম উম্মাহর নেই। তাদের দায়িত্ব হলো ইনসাফের সাথে ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়া এবং সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুমিনদের দুটি দল যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। তাদের একদল যদি অপর দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে তাহলে যারা বাড়াবাড়ি করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। আল্লাহ তা'আলা সুনিশ্চিতভাবে সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।"[৫৪] বস্তুত মুসলমানদের দু'পক্ষের মধ্যে কোনো কারণে যদি বিবাদ বা সংঘাত তৈরি হয় তাহলে সে বিবাদ ও সংঘাত মিটিয়ে দেয়া অবশিষ্ট মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে ব্যক্তি পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। আর এটি করা সম্ভব হলে ঐক্য প্রক্রিয়া সংহতরূপ ধারণ করবে।

---

৫২ আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরাহ আল-বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত

৫৩ প্রাগুক্ত

৫৪ *আল-কুরআন*, ৪৯:৯

১০. মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের উপাদান ও ক্ষেত্র

বিভিন্ন কারণ ও পরিস্থিতি মুসলমানদের মধ্যে বিশাল অনৈক্য তৈরি করে রাখলেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার উপাদানেরও অভাব নেই। এ উপাদানগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এর অধিকাংশই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সক্রিয় হিসেবে কার্যকর রয়েছে। বিষয়গুলোকে সামনে এনে মুসলিম উম্মাহর মিল ও ঐক্যের দিকগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে অন্যান্য দূরত্ব দূর করার উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হলে এ উপাদানগুলো আগের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ ঐক্য গড়ে উঠবে। যেমন,

১০.১ তাওহীদে বিশ্বাস: মুসলিম উম্মাহর সকল বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ও কেন্দ্র হলো তাওহীদে বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের স্বীকৃতি, ধারণ ও অনুশীলন ব্যতীত কোনো মানুষ মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কাজেই পৃথিবীতে যত মানুষ নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়, মুসলিম হিসেবে জীবন যাপনের দাবী করে এবং নিজেদেরকে মুসলিম উম্মাহর সদস্য হিসেবে গণ্য করে তারা সকলেই আবশ্যিকভাবে এই বিশ্বাসের সাথে একাত্ম যে, আল্লাহ তা'আলা এক এবং একক। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। তাঁর মতো কেউ নেই। তিনি চিরঞ্জীব। কুরআন মজীদে আল্লাহর যেমন পরিচয় দেয়া হয়েছে তেমন পরিচয়ের উপর সকল মুমিন নিঃশর্ত ঈমান পোষণ করেন। বিশ্বাসের এমন প্রচণ্ড একটি অভিন্ন শক্তিকে যথাযথভাবে পরিচর্যা করা গেলে এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল মুসলিম একটি অনিবার্য ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

১০.২ রিসালাতে বিশ্বাস: পৃথিবীর সকল মুসলিম একান্তভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য পৃথিবীর শুরু থেকে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। যারা যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবশেষ হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা)। তিনি আল্লাহর নবী এবং রাসূল। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত ও রিসালাতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও মুসলিমরা এক এবং অভিন্ন। এ বিশ্বাসের অর্থ হলো, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর দেখানো পথ ও নীতি অনুসরণের ব্যাপারে অভিন্নতা। তাঁর আদর্শ অনুশীলনের ব্যাপারে অবিসংবাদিত ঐক্য। বস্তুত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাতে বিশ্বাসের এ প্রত্যয়টি মুসলিম উম্মাহকে একটি অনন্য ঐক্যবদ্ধতায় উদ্দীপ্ত করতে পারে।

১০.৩ আখিরাতে বিশ্বাস: ইসলামের সকল কর্মদর্শন, নীতিদর্শন ও জীবনদর্শনের মূলীভূত চেতনা, প্রধান প্রাণপ্রবাহ হলো আখিরাতে বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাসের অর্থ হলো, পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবনে মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এরপর মানুষ তাদের পাপ ও পুণ্যের আলোকে চিরস্থায়ী সুখ বা চিরস্থায়ী দুঃখের ঠিকানা জান্নাত ও জাহান্নাম লাভ করবে। পৃথিবীর সকল মুসলমান সাধারণভাবে আখিরাতে বিশ্বাস করে। একজনও এমন মুসলমান পাওয়া

যাবে না যে, আখিরাতে অবিশ্বাস পোষণ করে। কারণ আখিরাতে অবিশ্বাস পোষণ করে মুসলিম হওয়া যায় না। আর যারা আখিরাতে বিশ্বাস পোষণ করে তারা জীবনের সকল সাফল্য ও ব্যর্থতা, কল্যাণ ও অকল্যাণ , উন্নতি ও অবনতি, জয় ও পরাজয় নিরূপণ করে আখিরাতে সফলতা-ব্যর্থতার নিরিখে। চিন্তাদর্শনের ক্ষেত্রে এমন আশ্চর্য মিল রয়েছে যে জাতির মধ্যে, তাদেরকে যদি যথাযথ ঐক্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাছাকাছি আনা যায়, আশা করা যায়, তারা অবশ্যই অনৈক্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে, সহসাই একীভূত হতে সক্ষম হবে।

১০.৪ আল-কুরআনে বিশ্বাসঃ মুসলমানদের ঐক্যের আরেকটি প্রবল উপাদান হলো আল-কুরআন আল্লাহর কালাম, এটি আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিল করেছেন, এ কিতাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আবশ্যক হিদায়াতসমূহ দান করেছেন ইত্যাদি বিষয়ের সত্যতায় কোনো মুসলমানই সংশয় পোষণ করে না, সন্দেহ করে না। একজন মানুষ যখন কুরআন মজীদের সত্যতায় বিশ্বাস পোষণ করে, তখন তাকে যদি যথাযথভাবে, নির্মোহ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে কুরআন মজীদের শিক্ষাসমূহ অবগত করানো সম্ভব হয় তাহলে স্বভাবতই সে ঐক্যের পথে হাটবে। কারণ কুরআন মজীদে একান্তভাবে মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতির পক্ষেই সকল বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে অনৈক্য ও বিভেদকে অপছন্দ করা হয়েছে। কুরআনের সত্যতায় আস্থাপোষণকারী কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ শিক্ষা কোনোভাবেই অবজ্ঞা করা সম্ভব নয়।

১০.৫ ফরয ইবাদাতে বিশ্বাস ও অনুশীলনঃ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের একটি বাস্তবসম্মত প্লাটফরম হতে পারে তাদের ফরয ইবাদাত সংক্রান্ত বিশ্বাস ও অনুশীলন এবং এই অনুশীলনজাত অভ্যাস ও প্রেরণা। যেমন পৃথিবীর সকল মুসলমান প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা, রমযান মাসে রোযা পালন করা, সামর্থ থাকা সাপেক্ষে যাকাত আদায় করা এবং হজ আদায় করা, সত্য বলা, চুরি না করা, ব্যভিচার না করা, মাদক সেবন না করা, অপরের হক নষ্ট না করা, মাতাপিতার খিদমত করা ইত্যাদি আমল ও ইবাদাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করে না। তারা প্রবলভাবে এটাও বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসার নিশ্চিত করার স্বার্থে দাওয়াতের কাজ করাও ফরয। তাদের মধ্যে অনৈক্য রয়েছে ইবাদাতগুলো কীভাবে পালন করা হবে সেগুলোর প্রায়োগিক দিকে। তারা মতপার্থক্য করে ইবাদাতগুলোর বিভিন্ন নফল, মুস্তাহাব, মাকরুহ, সুন্নাহ, ওয়াজিব ইত্যাদি কার্যক্রমে। কিন্তু ইবাদাতগুলো ফরয হওয়ার ব্যাপারে এবং ইবাদাতগুলোর অন্তর্গত ফরযগুলোর ব্যাপারেও তাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই যখন অবস্থা তখন এই ফরযগুলোর ভিত্তিতেই মুসলমানদের মধ্যে আরেকটি ফরয চেতনা তৈরি করা প্রবলভাবে সম্ভব। তা হলো ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও ঐক্যবদ্ধ থাকা ফরয হওয়ার চেতনা।

১০.৬ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেঃ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্র। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া

দেশ ও জাতীয় স্বার্থেই আবশ্যক। এটি সঠিক পর্যায়ে থাকলে শত্রুদেশ বা ষড়যন্ত্রকারীরা মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনৈক্যের বীজ বপন করতে পারে না। আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভেদের সুযোগ না থাকলে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তা ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে। কারণ দেশে দেশে পরাশক্তি ও শত্রুপক্ষের সমর্থক শাসকগোষ্ঠী তৈরি করা সম্ভব হয় বিভেদের পথ ধরে। এ ক্ষেত্রে উম্মাহর অভ্যন্তরীণ ও সামগ্রিক ঐক্য এ পরিস্থিতি পরিবর্তন করে দিতে পারে।

১০.৭ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে: বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নতি ও জোট প্রকৃতপক্ষে সকল ক্ষমতা, ঐক্য ও সংহতির নেপথ্য নিয়ামক হিসেবে সক্রিয় রয়েছে। সকল দ্বন্দ্ব, সংঘাত, অনৈক্য ইত্যাদির মূল কারণ হিসেবে অর্থনীতির বিষয়টিকেই মুখ্য বিবেচনা করা হয়েছে। এমতবস্থায় মুসলিম উম্মাহর নিজস্ব উদ্যোগে নিজেদের মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোট গঠন করা আবশ্যক। জ্বালানি ও খনিজ দ্রব্যে এবং মানবসম্পদে মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম অর্থনীতির অধিকারী হওয়ার পরও কেবল নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও বোঝাপড়ার অভাবে অন্যের ইচ্ছার অধীন হয়ে থাকে। এ অবস্থায় কেবল উম্মাহভিত্তিক অর্থনৈতিক জোট গঠন করা সম্ভব হলে পরিস্থিতি পুরোপুরি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে এবং মুসলিম উম্মাহের ঐক্য অর্থবহ ও স্থায়ী হওয়ার উপায় নিশ্চিত হবে।

১০.৮ সামরিক ক্ষেত্রে: মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য ছড়িয়ে দিয়ে, তাদেরকে বিভিন্ন সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে মুসলিম বিশ্বের আদর্শ ও অবস্থানের শত্রু শক্তিশালী দেশগুলো মূলত অস্ত্র বিক্রির হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। তারা অস্ত্রগুলো এমনভাবে তৈরি করে যে, সেগুলো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় না। ফলে মুসলমানদের অনৈক্যকে উপজীব্য করে তারা নিজস্ব সামরিক বলয় গড়ে তোলে। মুসলিম দেশগুলোও প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার উদগ্র বাসনায় অমুসলিম দেশগুলোর সাথে আঁতাত করতে বাধ্য হয়। অথচ সামরিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের ঐক্য গড়ে তোলার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। এতে যেমন তারা অপ্রয়োজনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রেহাই পাবে তেমনি অস্ত্র কেনার জন্য ব্যয় করা অপরিমাণ অর্থের অপচয় করা থেকেও নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা, বিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য অস্ত্র কেনার ফলে যে অবিশ্বাস ও অস্বস্তি এবং বিদ্বেষ তৈরি হয়, তা থেকে মুসলিম উম্মাহ রক্ষা পাবে।

১১. উপসংহার

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে ইসলাম দিয়ে পৃথিবীতে যে লক্ষ্যে প্রেরণ করেছেন, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সম্পন্ন না হলে সে লক্ষ্য কোনক্রমেই অর্জিত হবে না। পৃথিবীর সকল মুসলিম রাষ্ট্র, রাষ্ট্রগুলোর জনগণ, মুসলিম মনীষী, গবেষক, বিজ্ঞানী এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব যদি ঐক্য প্রচেষ্টার আসল লক্ষ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারতেন, যদি তারা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রচেষ্টার আবশ্যকতার

উপলব্ধিতে সঠিকভাবে উপনীত হতে পারতেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে এ প্রত্যয় পোষণ করা যেতো যে, অচিরেই মুসলিম উম্মাহ এক অবিচ্ছেদ্য ঈমানী বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। শিয়া, সুন্নী, মাযহাবী, লা-মাযহাবী বিভেদ তাদের এই সামগ্রিক ঐক্যের পথে কোনোক্রমেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। কারণ সকল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই মুসলমানদের মূলমন্ত্র। ইসলামের দাওয়াহ মানেই হলো একতার প্রতি দাওয়াহ। এ দাওয়াহ ও একতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হলে এক ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহর স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠবে। যে উম্মাহ পৃথিবীতে আবার সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। তখনই মুসলিম উম্মাহর জন্য বাস্তব হয়ে উঠবে মহান আল্লাহর শাশ্বত প্রতিশ্রুতি "তোমরা সাহস হারিয়ো না, তোমরা দুঃখিতও হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।"[৫৫]

৫৫ *আল-কুরআন*, ৩: ১৩৯

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচার ও আর্থিক সহায়তাদান

ড. আ. ম. কাজী হারুন উর রশীদ*

[**Abstract**: All human beings on earth are closely related to each other. So, Rasulullah (Sm.) extended his helping and compassionate hands to everyone,irrespective of caste, creed, and religion. He emphasized not making any discrimination based on faithwhile helping others, especially the neighbours. Because a person who does good deeds, whether a Muslim or a non-Muslim, will undoubtedly get his return from Allah. The Quran and Hadith at different places give important instructions regarding good manners to non-Muslims. The non-Muslim hostages in the Battle of Badr testify to this fact. Rasulullah (Sm.) instructed to show good manners with the hostages in the Battle of Badr. That's why a person of good deeds is entitled to good manners, irrespective of religion. Every Muslim's moral responsibility is to give financial assistance to non-Muslims during their hard times. So, in addition to inviting non-Muslims to Islam, we must present our good character by showing good manners and providing financial assistance to them.]

Keywords: Good manners, Assistance, Non-Muslims, Hadith, Justice, Modesty, Quran.

ভূমিকা

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে অসংখ্য মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে মানবজাতি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ, যাকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে অভিহিত করা হয়। সর্বপ্রথম মানব হলেন আদম (আ)। পরবর্তীতে আদম (আ) ও তাঁর সহধর্মিণী মা হাওয়া (আ)-এর মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে মানবজাতির ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে। যা বর্তমান যুগ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের আদি পিতা হলেন আদম (আ)। তাই বলা যায় পৃথিবীর সকল মানুষ একে অপরের সাথে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ। এজন্য নবী করীম (সা) বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ বিভেদ ভুলে গিয়ে সকল মানুষের প্রতি সহায়তা ও সহমর্মিতার হাত সম্প্রসারণ করেছেন। বিশেষ করে প্রতিবেশীকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য ধর্মপ্রথার প্রতি কোনরূপ পার্থক্য না করার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা কোন ব্যক্তি মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক, সে যদি ভালো কাজ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার প্রতিদান অবশ্যই রয়েছে।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন-

وَمَنْ أَحْسَنَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ وَّقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ فِيْ عَاجِلِ دُنْيَاهُ أَوْ آجِلِ آخِرَتِهِ.

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

"আর যেকোনো ব্যক্তি সে মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক, কোন ভালো কাজ করলে সে তার দুনিয়াবী জীবনে অথবা পরকালীন জীবনে অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে।"[১]

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচার

মানুষ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুলের অন্যতম। কেননা তারা সবাই একই পদ্ধতিতে এবং একই নিয়মে জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেকটি শিশুর মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার নিকট সমান। পরিপূর্ণ বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু সমাজ তাদেরকে বিভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। পিতা-মাতা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তাদেরকে মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদী বা মূর্তিপূঁজক হিসেবে পরিচিত করে। ফলে তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আকীদা ও বিশ্বাসের জন্ম হয়। ফলে মানুষ বিভিন্ন দল-উপদল, বিভিন্ন ধর্ম, মুসলিম-অমুসলিমে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরূপ বিভক্তি রোধ করা সম্ভব নয়। কেননা সৃষ্টির রহস্যের মধ্যে এটি অন্যতম। রহস্য রয়েছে বিধায় আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। আর এজন্যই পৃথিবীতে আদর্শিক সংঘাত ও সংগ্রাম লেগে রয়েছে। সুতরাং সকল মানুষ একই মতের অনুসারী হওয়া অসম্ভব। তদুপরি এ বিরোধ থাকা সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে সকলের মধ্যে একটি সাধারণ সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা থাকা আবশ্যক। অন্যথায় পৃথিবীর সর্বত্র হানাহানি, মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়বে। ফলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হবে দুর্বিষহ।

সর্বজনীন ধর্ম ইসলাম বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সৃষ্টিজগতের প্রতি তিনি অফুরন্ত মমতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। পাশাপাশি তাঁর বান্দাদেরকে কোনরূপ হানাহানি ও বিশৃঙ্খলা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا.

"আর তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না এটি সংস্কারের পর।"[২]

সুতরাং ধর্মীয় বিভেদের কারণে পৃথিবীতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা মুসলমানদের জন্য শোভনীয় নয়। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলতে সাধারণত অমুসলিম সকল অবিশ্বাসীদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে। এরা চার ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. হারবী, ২. আশ্রয় প্রার্থী, ৩. চুক্তিবদ্ধ এবং ৪. যিম্মী।

উপর্যুক্ত প্রকারের মধ্যে হারবী তথা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করত যুদ্ধ ঘোষণা করে থাকে, সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে

---

১ মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার আল-ওয়াকিদী, ***আল-মাগাযী***, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল আ'লামী, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ২২২।

২ আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ৫৬।

মুসলমানদের ওপর তাদের কোন অধিকার নেই। পক্ষান্তরে আশ্রয় তথা নিরাপত্তা লাভের ক্ষেত্রে যারা মুসলমানদের ওপর নির্ভরশীল, তাদেরকে সীমিত সময় ও স্থানে নিরাপত্তা প্রদান করা তাদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ

"আর যখন মুশরিকদের কেউ তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তাদের সাহায্য করো; যাতে তারা আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পারে। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।"[৩]

আর যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ, চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে, যদি না তারা চুক্তির বরখেলাফ কিছু করে। অর্থাৎ তারা যতদিন চুক্তির ওপর বহাল থাকবে এবং মুসলমানদের কোন অনিষ্ট না করে, হয়রানি না করে ও দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۔

"তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে ঐ সমস্ত লোক যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের কোন ব্যাপারে ক্ষতি সাধন করেনি এবং তোমাদের ওপরে কোন প্রকার শত্রুতাও করেনি, তাহলে তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তোমরা বহাল থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকওয়ার অধিকারী লোকদের ভালোবাসেন।"[৪]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَىِٕمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ۔

"আর যদি চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তারা তা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা দোষারূপ করে তাহলে কাফিরদের নেতাদেরকে তোমরা হত্যা করো। কারণ তাদের সাথে তোমাদের আর কোন চুক্তি নেই, যাতে তারা ফিরে আসে।"[৫]

অতঃপর যিম্মীদের ওপর মুসলমানদের এবং মুসলমানদের ওপর তাদের অধিকার রয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা মুসলিম দেশে বসবাস করে থাকে এবং জিযিয়া প্রদান করে। এ কারণেই

৩ সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ৬।

৪ পূর্বোক্ত, ৯ : ৪।

৫ পূর্বোক্ত, ৯ : ১২।

তারা মুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য। অতএব, মুসলিম সরকারের ওপর কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাদের জান-মাল এবং সম্মানের হিফাযত করা। পক্ষান্তরে যিম্মীদের ওপর সাধারণ মুসলমানদের কতিপয় করণীয় রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১. সদ্ব্যবহার প্রদর্শন

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, মুমিনগণ যেন মুমিনদের পরিবর্তে কাফির বা অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। কুরআনের একাধিক স্থানে এ নির্দেশনা এসেছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ.

"মু'মিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।"[৬]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

"তারা চায় যে, তারা যেমন কাফির, তোমরাও তেমনি কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে চলে আসে।"[৭]

আল-কুরআনের এসব নির্দেশনার অর্থ এ নয় যে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদাচরণ বা ভালো ব্যবহার করা যাবে না। বরং কুরআন ও হাদীসের একাধিক স্থানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদাচরণের গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বদরের যুদ্ধে বন্দি হওয়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধের বন্দিদের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ মোতাবেক বিশ্বমানবতার জন্য এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

---

৬ সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ২৮।

৭ সূরা আন্-নিসা, ৪ : ৮৯; আরও দেখুন, সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৫১, ৫৫, ৮১; সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ১৬; সূরা আল-মুমতাহিনাহ, ৬০ : ১৩।

যুদ্ধকালীন সময় সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের খাদ্য বন্দিদের খেতে দিতেন। এমনকি নিজেরা না খেয়েও ক্ষুধা নিয়ে রাত অতিবাহিত করতেন। নিজেরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় থেকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শত্রুদের খাবার দেয়ার এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বদর যুদ্ধের সময় বন্দিদের সাথে করা উত্তম আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করে। তবে ইসলাম যে বিষয়টিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে তাহলো- ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসা রাখা যাবে না। যে আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসা মুসলমানদের সাথে রাখার নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۰

"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"[৮]

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে আন্তরিক ভালোবাসার অনুমতি না দিলেও তাদের সাথে সৌজন্যতা বা শুভেচ্ছা বিনিময় এবং তাদের জন্য কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণে বাধা নেই। তবে শর্ত হলো, যেসব অমুসলিম মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না কিংবা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধকারী কোন শক্তিকে সহায়তা করে না। সুতরাং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে না ও তাদের ক্ষতি হবে এমন কাজ করে না- এরূপ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ এবং তাদের উপকার করতে ইসলাম নিষেধ করে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।"[৯]

আল্লাহ্‌র তা'আলার এ নির্দেশ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মন্দ আচরণের নির্দেশ দেয় না। যতক্ষণ না তারা নিরাপদে ইসলামী জীবন

৮ সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৫১।

৯ সূরা আল-মুমতাহিনাহ, ৬০ : ৮।

ব্যবস্থার আলোকে চলাফেরার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। বরং ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়। আর তাদের কল্যাণের কাজে এগিয়ে যাওয়ারও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২. ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আত্মীয়ের প্রতি করণীয়

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার বিষয়ে ইসলামে বহু নির্দেশনা বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়টিকে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট করে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

"যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।"[১০]

আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার উপযুক্ত নির্দেশনায় মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। অর্থাৎ এখানে কেবল মুসলিম আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আদেশ করা হয়নি; বরং মুসলিম-অমুসলিম সকল আত্মীয়ের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তাই বলা যায়, আত্মীয় যে ধর্মেরই হোক না কেন তার অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সজাগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

এছাড়া কুরআন ও হাদীসে আরো কতিপয় নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে, যেখানে সুস্পষ্ট ভাষায় অমুসলিম আত্মীয়ের সাথেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَ اِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِیْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا.

"আর আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তবে তারা যদি আমার সঙ্গে এমন কিছু শরীক করতে তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তাদের কথা মানবে না।"[১১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِیْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

---

১০ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, ৮ম খণ্ড (দিমাশ্ক: দারু তাওকুন-নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদীস নং ৬১৩৮, পৃ. ৩২।

১১ সূরা আল-'আনকাবূত, ২৯ : ৮।

"আর তারা উভয়ে যদি তোমাকে বাধ্য করে যে, তুমি আমার সাথে শির্ক করবে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তুমি তাদের আনুগত্য করো না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদাচারের সাথে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করো। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা দুনিয়াতে যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।"[১২]

কুরআনুল কারীমের উক্ত আয়াত দুটি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, যদি কোনো মুশরিক পিতা-মাতা তাদের কোন মুসলিম সন্তানকে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করতে বলে, তাহলে তাদের এ আদেশ মানা যাবে না। কিন্তু এমতাবস্থায়ও তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। পরিপূর্ণভাবে পিতা-মাতার হক আদায় করতে হবে।

৩. ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীর প্রতি করণীয়

সমাজ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হচ্ছে প্রতিবেশী। মানুষ যেখানেই বাস করুক না কেন, সেখানেই তাকে প্রতিবেশীর সাথে বসবাস করতে হয়। তাকে সাথে নিয়েই জীবন-যাপন করতে হয়। বাড়ির পাশাপাশি বসবাসকারী আত্মীয়-অনাত্মীয়, মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই প্রতিবেশী বলা হয়। ভ্রমণসঙ্গী অথবা সহকর্মীকেও প্রতিবেশী বলে অভিহিত করা হয়। মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করে তোলার জন্য ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রতিবেশীর মর্যাদাকে সমুন্নত করত তাদের অধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে তার প্রতিবেশীর প্রতি কতিপয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হয়। পারস্পরিক এ সকল দায়িত্ব পালনে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। হাদীসে হক ও অধিকার অনুসারে প্রতিবেশীকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। মুসলিম আত্মীয়, মুসলিম অনাত্মীয় এবং অমুসলিম অনাত্মীয়।[১৩] নিম্নে প্রতিবেশী সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, একজন প্রতিবেশীর ওপর আরেকজন প্রতিবেশীর কী হক রয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন,

إِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ وَإِنِ اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَهُ وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ وَإِنِ احْتَاجَ أَعْطَيْتَهُ وَإِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّيْتَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ

১২ সূরা লুকমান, ৩১ : ১৫।

১৩ সম্পাদনা পরিষদ, ***সীরাত বিশ্বকোষ***, ১১শ খণ্ড (ঢাকা: ইফাবা, জুমাদাল-উলা ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭২-৭৩।

وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تُؤْذِيهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ.

"যদি সে তোমার কাছে ঋণ চায় তাহলে ঋণ দেবে, যদি তোমার সহযোগিতা চায় তাহলে তাকে সহযোগিতা করবে, যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার খোঁজখবর নেবে, তার কোনকিছুর প্রয়োজন হলে তাকে তা দেবে, সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার খোঁজখবর নেবে, যখন সে ভালো কিছু লাভ করবে তখন তাকে শুভেচ্ছা জানাবে, যদি সে বিপদে পড়ে তাহলে সান্ত্বনা দেবে, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরীক হবে, তার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘর এত উঁচু করবে না যে তার ঘরে বাতাস ঢুকতে পারে না, কোন ভালো খাবার রান্না করলে তাকে এর ঘ্রাণ ছড়িয়ে কষ্ট দেবে না, তবে যদি তার ঘরে সে খাবার থেকে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। আর যখন কোন ফল কিনে তোমার বাড়িতে নেবে তখন হাদিয়াস্বরূপ তাকে সেখান থেকে কিছু দাও।"[১৪]

'আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন,

مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

"জিবরীল (আ) সবসময় আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়্যত করতেন। এমনকি আমি মনে করেছিলাম যে, তিনি তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।"[১৫]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[১৬]

আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন-

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ.

"হে আবূ যার! যখন তুমি তরকারি পাকাবে, তখন তাতে ঝোল বেশি করে দিবে এবং প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখবে।"[১৭]

---

১৪ ইবন হাজার আল-'আসকালানী, ***ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী***, ১০ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ৪৪৬।

১৫ *সহীহুল বুখারী*, ৮ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০১৪, পৃ. ১০।

১৬ আবূ বকর ইবন আবী শায়বাহ, ***আল-কিতাবুল মুসান্নাফ ফিল-আহাদীছ ওয়াল-আছার***, ৫ম খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.), হাদীস নং ২৫৪১৮, পৃ. ২২০।

১৭ মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, ***সহীহ মুসলিম***, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাছিল-'আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং ২৬২৫, পৃ. ২০২৫।

প্রতিবেশীর অধিকার নষ্ট না করার প্রতিও ইসলামে সতর্ক করা হয়েছে। আবূ শুরায়হ (রা) থেকে বর্ণিত।

নবী করীম (সা) বলেছেন,

وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ.

"আল্লাহ্‌র কসম! সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহ্‌র কসম! সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহ্‌র কসম! সে ঈমানদার হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন- যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে না।"[১৮]

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آذَانِي جَارِي، فَقَالَ: اصْبِرْ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: آذَانِي جَارِي، فَقَالَ: اصْبِرْ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ، آذَانِي جَارِي، فَقَالَ: اعْمَدْ إِلَى مَتَاعِكَ فَاقْذِفْهُ فِي السِّكَّةِ، فَإِذَا مَرَّ بِكَ أَحَدٌ فَقُلْ: آذَانِي جَارِي، فَتَحِقُّ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ.

"এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন- আমাকে আমার প্রতিবেশী কষ্ট দিচ্ছে। তখন তিনি বললেন- তুমি ধৈর্যধারণ করো। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার আবার এসে বলল- আমাকে আমার প্রতিবেশী কষ্ট দিচ্ছে। তখন তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ করো। অতঃপর সে যখন তৃতীয়বার আসল, তখন নবী করীম (সা) বললেন- যাও তুমি তোমার মাল-সম্পদ রাস্তায় রেখে দাও। যখন তোমার নিকট দিয়ে কেউ যাবে তাকে বলবে, আমাকে আমার প্রতিবেশী কষ্ট দিচ্ছে। যাতে তার উপর লা'নত বর্ষিত হয়।"[১৯]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের জীবনী থেকেও এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক না কেন সে উত্তম আচরণ পাবার অধিকারী। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই প্রতিবেশী। সকল প্রতিবেশীর মর্যাদা আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে এবং মানবিক ব্যবহারের বিনিময়ে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। কেননা ইসলামে মুসলিম প্রতিবেশীর ন্যায় অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে

---

১৮ *সহীহুল বুখারী*, ৮ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০১৬, পৃ. ১০।

১৯ *আল-কিতাবুল মুসান্নাফ ফিল-আহাদীছ ওয়াল-আছার*, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ২৫৪১৯, পৃ. ২২০।

অমুসলিমদের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য করা হয়নি। সুতরাং অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথেও মুসলিম প্রতিবেশীর অনুরূপ সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন।

৪. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাস্যদের গালি-গালাজ না করা

ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। পৃথিবীতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ব্যাপারে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়নি। বরং সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি তাদের ইলাহসমূহের প্রতি কোনরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বাক্য প্রদর্শন না করতে নির্দেশ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"আর কাফিররা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে আহবান করে ও ইবাদত করে, তোমরা (মুমিনগণ) তাদেরকে গালমন্দ করো না। তাহলে তারা অজ্ঞতাবশত বৈরীভাবে আল্লাহকেই গালি-গালাজ করতে শুরু করবে। আমি তো এরূপেই প্রতিটি জনগোষ্ঠির জন্য তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তারা যা কিছু করত তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন।"[২০]

৫. ন্যায়বিচার করা

ন্যায়বিচার লাভ করা মানুষের অন্যতম একটি মৌলিক অধিকার। এছাড়া সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্তে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এজন্য সর্বজনীন ধর্ম ইসলাম মানুষের উক্ত মৌলিক অধিকারের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। এমনকি ন্যায়বিচারকে শুধু মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়নি; বরং ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও ন্যায়বিচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিধানসমূহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাক্ষ্য দানকারী হয়ে যাও। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এর প্রতি প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার করবে না। তোমরা ন্যায়বিচার করো। কেননা এটা

২০ সূরা আল-আন'আম, ৬ : ১০৮।

তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।"[২১]

৬. বিনয়ের সাথে কথা বলা

ইসলাম সকল সৃষ্টির সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছে। সৃষ্টিকুল বলতে যা বুঝায় তা সবই আল্লাহ্‌র পরিবার বিধায় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণও আল্লাহ তা'আলার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির সাথে সুন্দর ব্যবহার ও ভালো আচরণ প্রদর্শনের আদেশ করেছেন। তিনি বলেন :

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا.

"আর আমার বান্দাদের বলো, তারা যেন সে রকম বলে যা উত্তম। কারণ, শয়তান তো তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য উস্কানি দিয়ে থাকে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের সুস্পষ্ট দুশমন।"[২২]

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, শয়তান হলো এমন এক সৃষ্টি যে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ, বিবাদ-বিষম্বাদ, ঝগড়া-ফাসাদ, খুন-খারাবি, অনাচার-অবিচার, যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি-কাটাকাটি ইত্যাদি লাগিয়ে রাখতে সদা প্রস্তুত। সুন্দর কথা ও ভালো ব্যবহার এমন এক গুণ, যা মানুষের মাঝে ভালোবাসা, সম্প্রীতি, শ্রদ্ধাবোধ, স্নেহবোধ জাগিয়ে তোলার সর্বোত্তম মহৌষধ। তাই সব মানুষকে পরস্পরে ভালো আচরণ ও ভালো কথা বলার জন্য এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাকিদ দিয়েছেন।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ.

"আর তোমরা মানুষের সাথে ভালো কথা বলবে; নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে।"[২৩]

এ আয়াতে মানুষের সাথে ভালো কথা বলাকে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের মতো ফরয ইবাদতের উপর স্থান দিয়েছেন। এখানে মানুষ বলে আয়াতে কেবল মুসলিমদের বলা হয়নি; বরং দল-মত ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। এখানে একজন মুমিনকে যতগুলো উত্তম গুণাবলী অর্জনের প্রতি তাকিদ দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো সকলের প্রতি উত্তম আচরণ ও ভালো কথা বলা।

---

২১ সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৮।

২২ সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৫৩।

২৩ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৮৩।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا،

"আর রহমানের বান্দা তো তারাই যারা জমিনের উপর চলাফেরা করে বিনয়ী হয়ে। অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদের সাথে বিতর্ক করতে চায় তখন তারা বলে 'সালাম' (শান্তির বাণী)।"[২৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন কাছীর (র) বলেন : যখন তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) অজ্ঞ লোকেরা তাদের অজ্ঞতাবশত খারাপ আচরণ করবে তখন তারা যেন তাদের সাথে অনুরূপ খারাপ আচরণ না করে। বরাং তারা তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করবে, তাদের সাথে সম্প্রীতির হাত সম্প্রসারণ করবে। ভালো কথা ব্যতীত তাদের সাথে ভিন্ন কোন আচরণের চিন্তাই তারা করবে না।[২৫] যেমনটি নবী করীম (সা)-এর প্রতি যখন অজ্ঞ জাহিলরা খারাপ ব্যবহার করত তখন তিনি তা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করতেন।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলার জন্য নবী করীম (সা) উপদেশ প্রদান করেছেন।

'আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ .

"ইহুদীদের একদল রাসূল (সা)-এর দরবারে প্রবেশ করলেন। তখন তারা 'আস-সামু আলাইকুম' (তোমাদের মৃত্যু হোক) বলল। 'আইশা (রা) বললেন, তা আমি বুঝেছি। তখন আমি বললাম, তোমাদের মৃত্যু হোক ও লা'নত হোক। তখন রাসূল (সা) বললেন- হে 'আইশা! তুমি একটু থামো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল ক্ষেত্রে বিনয় পছন্দ করেন। তখন 'আইশা (রা) বললেন- হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি বলেছি, তোমাদেরও হোক।"[২৬]

---

২৪ সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৩।

২৫ ইসমা'ঈল ইব্ন 'উমার ইব্ন কাছীর, ***তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম***, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ১১১।

২৬ *সহীহুল-বুখারী*, ৮ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০২৪, পৃ. ১২।

ইসলাম ভালো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিম, মুশরিক, ইহুদী, খ্রিস্টান অগ্নিপূঁজক ইত্যাদির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করে না। সুতরাং বিশ্ব মুসলিমের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভিন্ন মতাবলম্বী নির্বিশেষে সকলের সাথে দয়া, অনুকম্পা, ভালোবাসা ও বিনয়ী ব্যবহার করতে হবে। যারা এ কাজটি করবেন রাসূল (সা) দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কল্যাণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। পক্ষান্তরে যারা পৃথিবীতে মানুষকে কষ্ট দেয় পরকালে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا.

"যারা দুনিয়ায় মানুষকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদের (দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে) শাস্তি প্রদান করবেন।"[২৭]

ইসলামের নির্দেশনা হলো, মুসলমানরা যেন মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর প্রতিও সদয় আচরণ করে। সে কাছের হোক কিংবা দূরের হোক, মুসলিম হোক কিংবা কাফির হোক না কেন।

৭. ইসলাম গ্রহণে বাধ্য না করা

ইসলাম পরম শান্তির ধর্ম। সর্বযুগে এ ধর্ম সর্বস্তরের মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। কেননা ইসলাম তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং মুসলমানদের আচার-আচরণ, বিনয় ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ তা'আলাও আল-কুরআনুল কারীমে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাউকে জোরপূর্বক মুসলিম বানাতে নিষেধ করেছেন। কেননা এরূপ ইসলাম মানুষের মনে বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করে না।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। নিশ্চয় ভ্রান্তি থেকে সুপথ প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরল, যা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।"[২৮]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

২৭ সুলায়মান ইব্‌নুল আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী, ***সুনানু আবী দাউদ,*** ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্‌র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), হাদীস নং ৩০৪৫, পৃ. ১৬৯।

২৮ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৫৬।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۭ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

"আর যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান গ্রহণ করত। তবে তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করতে পার, যাতে তারা ঈমান আনে?"[২৯]

সুতরাং যার তাকদীরে হিদায়াত রয়েছে সে নিজ থেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। আর এরকম ঈমানই আল্লাহ তা'আলার নিকট মর্যাদা লাভ করে থাকে।

৮. সচ্চরিত্রের পরিচয় দেওয়া

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে আচার-ব্যবহারে মুসলিম ব্যক্তিকে সচ্চরিত্রের পরিচয় দিতে হবে। কেননা চরিত্রের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করতে পারে। তাই সচ্চরিত্রের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের প্রতি আহবান করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। এছাড়া নবী করীম (সা) তাঁর উম্মতকে সচ্চরিত্র শিক্ষা দানের জন্য আগমন করেছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন-

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

"আমাকে উত্তম চরিত্র পূর্ণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে।"[৩০]

মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الكُوفَةِ، فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا.

"আমরা 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা)-এর দরবারে গেলাম। তিনি যখন মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে কূফায় আসলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এ সময় তিনি বললেন, তিনি অশ্লীল ও নির্লজ্জ ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : "তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো যার চরিত্র সুন্দর।"[৩১]

'আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ، وَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ

---

২৯ সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৯।

৩০ আবূ বক্র আহমাদ আল-বায্যার, ***মুসনাদুল-বায্যার***, ১৫শ খণ্ড (আল-মাদীনা আল মুনাওয়ারাহ: মাকতাবা আল-'উলূম ওয়া আল-হিকাম, ২০০৯ খ্রি.), হাদীস নং ৮৯৪৯, পৃ. ৩৬৪।

৩১ *সহীহুল বুখারী*, ৮ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০২৯, পৃ. ১২।

الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ.

"এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। যখন তিনি তাকে দেখলেন তখন বললেন, সে এমন গোত্রের লোক যে গোত্রের লোকেরা খারাপ। অতঃপর যখন সে বসল, তখন নবী করীম (সা) তার সাথে হাসিমুখে কথা বললেন। যখন লোকটি চলে গেল তখন 'আইশা (রা) বললেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! যখন আপনি তাকে দেখলেন তার সম্পর্কে ভিন্ন মন্তব্য করলেন। অতঃপর তার সাথে হাসিমুখে কথা বললেন? তখন রাসূল (সা) বললেন- হে 'আইশা! তুমি আমাকে কখনো অশ্লীল বলতে শুনেছ? নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হলো ঐ ব্যক্তি, যার ক্ষতি থেকে বাচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করেছে।"[৩২]

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আর্থিক সহায়তাদান

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এ জীবন বিধানে শুধু মুসলমানদের অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি; বরং মুসলমানদের পাশাপাশি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকারের ব্যাপারেও নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। কেননা সকল মানুষই সৃষ্টিগতভাবে এক। অর্থাৎ সকলেই আদি পিতা আদম (আ)-এর সন্তান। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সকল মানুষ সৃষ্ট। এজন্য শাশ্বত ধর্ম ইসলামে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকারের প্রতিও যত্নবান হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে সচ্ছল মুসলমানদের কর্তৃক ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে ইসলামী নির্দেশনা আলোকপাত করা হলো।

১. নফল সাদাকা প্রদান

ইসলামের নির্দেশনা হলো, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভিক্ষুক ও দরিদ্র ব্যক্তিকে নফল সাদাকার অর্থ থেকে দান করা যাবে। কারণ নফল সাদাকা এবং সাধারণ দান ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরও দেওয়া বৈধ।[৩৩] হাদীসেও এ সম্পর্কিত নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بأن لا يُتَصَدَّقَ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ إِلَى آخِرِهَا، فَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ بَعْدَهَا عَلَى كُلِّ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ كُلِّ دِينٍ.

---

৩২ পূর্বোক্ত, ৮ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০৩২, পৃ. ১৩।

৩৩ নিযামুদ্দীন আল-বালখী, ***আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ***, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল-ফিক্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৩১০ হি.), পৃ. ৩০০।

"তিনি (সা) মুসলিম ব্যতিত সাদাকা না করার জন্য বলেছেন। অতঃপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো- لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ إِلَى آخِرِهَا অর্থাৎ তাদেরকে হিদায়াত করার দায়িত্ব আপনার উপর নেই...। অতঃপর তিনি সকল ধর্মাবলম্বীদেরকে সাদাকা করার জন্য নির্দেশ দিলেন।"[৩৪]

সা'ঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন,

لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ إِلَى قَوْلِهِ: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ.

"তোমরা মুসলিম ব্যতিত সাদাকা করো না। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন- لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমরা যেকোনো ধর্মাবলম্বীদেরকে সাদাকা করো।"[৩৫]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন,

بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا، فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

"এক ব্যক্তি সফর করছে। এমন সময় হঠাৎ সে কঠিন পিপাসায় পড়েছে। তখন সে একটি কূপে অবতরণ করল এবং তা থেকে পানি পান করল। অতঃপর সে বের হয়ে দেখল একটি কুকুর হাপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাদামাটি খাচ্ছে। তখন সে বলল, এই কুকুর আমার মতো পিপাসার্ত হয়েছে। তখন সে কূপ থেকে মোজা ভরে পানি নিল ও তার মুখ বন্ধ করে দিল। অতঃপর উঠে কুকুরকে পানি পান করাল। তখন সে কুকুর আল্লাহ্র শোকর আদায় করল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! প্রাণীদের আহার করানোর মধ্যে আমাদের কি সাদাকা আছে? তখন তিনি বললেন, প্রত্যেক তাজা কলিজাতে সাদাকা রয়েছে।"[৩৬]

---

৩৪ *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪১।

৩৫ ইব্ন আবী শায়বা, ***আল-মুসান্নাফ ফিল-আহাদীস ওয়া আল-আছার***, ২য় খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাহ আর-রুশ্দ, ১৪০৯ হি.), হাদীস নং ১০৩৯৮, পৃ. ৪০১।

৩৬ *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ২৩৬৩, পৃ. ১১১।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, প্রতি প্রাণীর মাঝে সাদাকা রয়েছে। তাই তাদের আহার করাতে অবশ্যই পুণ্য নিহিত রয়েছে। সুতরাং মানবসেবা হিসেবে তাদেরকে নফল সাদাকা দেওয়া যাবে।

২. যাকাত প্রদান

সাধারণত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে যাকাত প্রদান করা যাবে না। যদিও পবিত্র কুরআনে অমুসলিমদেরও যাকাত দেওয়ার কথা এসেছে; কিন্তু বিধানটি বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সাধারণ অবস্থায় সে বিধান প্রযোজ্য নয়।

হাসান বসরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَا يُعْطَى عَبْدٌ، وَلَا مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ.

"যাকাত কোন গোলাম ও মুশরিককে দেওয়া যাবে না।"[৩৭]

ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) যখন মু'আয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন তখন বললেন-

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"তাদের আহবান করো আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন রাত-দিনে। যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। যা ধনীদের থেকে নেওয়া হবে এবং ফকীরদের মাঝে বণ্টন করা হবে।"[৩৮]

যেহেতু এ হাদীসে বলা হয়েছে, যাকাত মুসলিম ধনীদের থেকে নেওয়া হবে এবং মুসলিম ফকীরদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তাই কোন কাফিরকে স্বাভাবিক অবস্থায় যাকাত দেওয়া যাবে না। কেননা যাকাত দেওয়া ইবাদত। আর ইবাদতের সম্পর্ক মুসলিমদের সাথে। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) উল্লিখিত হাদীসে তা মুসলিমদের থেকে নিয়ে মুসলিম ফকীরদের মাঝে বণ্টন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং সরকারিভাবে হোক বা ব্যক্তিগতভাবে হোক যাকাত কাফিরদেরকে দেওয়া যাবে না।

---

৩৭ 'আবদুর রাযযাক, ***আল-মুসান্নাফ***, ৪র্থ খণ্ড (ভারত: আল-মাজলিসুল 'ইলমী, ১৪০৩ হি.), হাদীস নং ৭১৬৭, পৃ. ১১২।

৩৮ *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩৯৫, পৃ. ১০৪।

তবে ক্ষেত্র বিশেষে মন জয় করার জন্য (مؤلفة قلوب) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের যাকাত দেওয়া যাবে। অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে অমুসলিমদেরকেও যাকাতের আটটি খাত থেকে একটি খাত তথা মন জয় করার জন্য তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে।

এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

"সাদাকাসমূহ তো হচ্ছে শুধু ফকীর, মিসকীন, সাদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধে ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফরয। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী অতি প্রজ্ঞাময়।"[৩৯]

এখানে যদিও মন জয় করার জন্য যাকাত দেয়া বৈধ প্রমাণিত। তবে ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার পর থেকে তা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হানাফী মাযহাব অনুযায়ী উক্ত হুকুম বর্তমানে কার্যকর হবে না। তবে অবশিষ্ট তিন ইমামের মতে, উপযুক্ত কারণ পাওয়া গেলে বর্তমান যুগেও তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে।

৩. হাদিয়া প্রদান

সামাজিক সুসম্পর্ক স্থাপনে হাদিয়া বা উপঢৌকন আদান-প্রদান একটি কার্যকরী পন্থা। হাদিয়া আদান-প্রদানের মাধ্যমে শত্রুতা দূরীভূত হয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। এজন্য ইসলামে হাদিয়ার আদান-প্রদানের ব্যপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। হাদিয়া আদান-প্রদান শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়নি; বরং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হাদিয়া প্রদান করাকেও বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

"তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তোমার উপর নেই; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তোমরা ধন সম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুত তা তোমাদের নিজেদের জন্য। আর একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করো না

৩৯ সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ৬০।

এবং তোমরা সম্পদ হতে যা ব্যয় করবে তার পুরষ্কার পুরোপুরি তোমরা পেয়ে যাবে। আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"[৪০]

মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

"আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা)-এর পরিবারে একটি বকরি যবেহ করা হলো। যখন তিনি ('আবদুল্লাহ) আসলেন, তখন তিনি বললেন- তোমরা কি প্রতিবেশী ইহুদীদেরকে হাদিয়া দিয়েছ? কেননা আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, জিবরীল (আ) আমাকে অনবরত প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়্যত করছেন। এমনকি আমি ধারণা করেছি তিনি তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাবেন।"[৪১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে হাদিয়া দিতেন এবং তাদের হাদিয়াও গ্রহণ করতেন। তিনি এবং তাঁর বংশের জন্য সাদাকা হারাম ছিল বিধায় তিনি হাদিয়া প্রথাকে বেশি পছন্দ করতেন। ফলে বহু কাফির বাদশাহ তার নিকট হাদিয়া প্রেরণ করলে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করতেন এবং তাদেরকেও হাদিয়া প্রদান করতেন।

হাদিয়া আদান-প্রদানের মধ্যে বহু উপকারিতা রয়েছে। যেমন 'আতা ইব্ন 'আব্দুল্লাহ খুরাসানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادُّوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ.

"তোমরা পরস্পর মুসাফাহা করো। এতে তোমাদের অন্তরের বিদ্বেষ চলে যাবে। আর পরস্পর হাদিয়ার আদান প্রদান করো। এতে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা বাড়বে এবং ঈর্ষা চলে যাবে।"[৪২]

৪. সাদাকায় ফিত্‌র প্রদান

রমযান মাসের সিয়াম সাধনা শেষে সামর্থ্যবান মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি দান আবশ্যক করেছেন। যেটিকে যাকাতুল ফিতর তথা ফিতরা নামে অভিহিত করা হয়।

---

৪০ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৭২।

৪১ মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী, ***জামি'উত্-তিরমিযী***, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল-গারীবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.), হাদীস নং ১৯৪৩, পৃ. ৩৯৭।

৪২ মালিক ইব্ন আনাস, ***আল-মুয়াত্তা***, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৪০৬ হি.), হাদীস নং ১৬, পৃ. ৯০৮।

প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিম ব্যক্তির নিজের ও তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা আবশ্যক। যব, খেজুর, কিশমিশ ও পনির থেকে ফিতরা আদায় করলে তিন কেজি ৩০০ গ্রাম আর গম বা গমের আটা দিয়ে ফিতরা দিলে এক কেজি ৭০০ গ্রাম বা এর সমপরিমাণ মূল্য কোন গরিবকে দিতে হয়। ফিতরার বিধানের হিকমত বা রহস্য হলো, রমযানের রোযা রাখার ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা এ বিধান দিয়েছেন। এছাড়া ঈদুল ফিতরের ঈদের আনন্দ যেন সবাই মিলে একসঙ্গে উদযাপন করতে পারে। ঈদের দিন অভাবী দুস্থ লোকেরা যেন আনন্দে কাটাতে পারে।

ফিতরা গরিব দুঃখীদের মাঝে বণ্টন করতে হয়। ইসলাম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া কুরআন ও হাদীসে সকল ধর্মাবলম্বী মানুষকে দান করার নির্দেশনা রয়েছে। কেননা ঈদের দিন মুসলমানরা ঈদের আনন্দ করবে আর তাদের কোন অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশী না খেয়ে থাকবে, এভাবে কি ঈদের আনন্দ উদযাপন করা যায়? কেবল ঈদ কেন, অন্যসময়েও অমুসলিম প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেয়ার বিধান স্বয়ং রাসূল (সা) শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে সাদাকায়ে ফিত্‌র দেওয়ার ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবী মায়সারা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّه كَانَ يُعْطِي الرُّهْبَانَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

"তিনি সাদাকায়ে ফিতর খ্রিস্টান পাদ্রীদের দিতেন।"[৪৩]

৫. আর্থিক সহায়তা দান

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন বিপদাপদের সময় তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব। কেননা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপদেশ দিয়েছেন।

মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَغُلَامُهُ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ: يَا غُلَامُ، إِذَا فَرَغْتَ فَابْدَأْ بِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: الْيَهُودِيُّ أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْجَارِ، حَتَّى خَشِينَا أَوْ رُئِينَا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

"আমি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমরের নিকট ছিলাম। তিনি একটি ছাগলের চামড়া তুলছিলেন। তখন তিনি বললেন- হে গোলাম! যখন তুমি কাজ শেষ করবে তখন তুমি আমার প্রতিবেশী ইহুদীদেরকে দিয়ে শুরু করবে। তখন ইহুদী জাতির এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তোমার কল্যাণ

৪৩ *আল-কিতাবুল মুসান্নাফ ফিল-আহাদীছ ওয়াল-আছার*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১০৪০৩, পৃ. ৪০১।

করুক। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়্যত করতে শুনেছি। এমনকি আমরা ধারণা করছিলাম যে, তিনি তাদেরকেও উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।"[৪৪]

৬. রাষ্ট্রীয় অনুদান প্রদান

ইসলামী রাষ্ট্রে যে সকল অমুসলিম রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন মেনে বসবাস করবে, তারা সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তারা তাদের নির্ধারিত সকল অধিকার প্রাপ্ত হবে। সন্দেহ নেই যে, রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে এ বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। 'উমার (রা)-এর একটি ঘটনা। তিনি তখন খলীফাতুল মুসলিমীন।

একদিন তিনি এক ইহুদী বৃদ্ধকে মসজিদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতে দেখে তাকে লক্ষ্য করে বললেন,

مَا أَنْصَفْنَاكَ إِنْ كُنَّا أَخَذْنَا مِنْكَ الْجِزْيَةَ فِي شَبِيبَتِكَ، ثُمّ ضَيّعْنَاكَ فِي كِبَرِكَ. قَالَ:ثُمّ أَجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يُصْلِحُه

"আমরা তোমার ওপর ইনসাফ করতে পারিনি যদি তোমার যৌবনে আমরা তোমার নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করে থাকি আর তোমার বার্ধক্যে তোমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেই। এরপর তিনি তার জন্যে বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করে দেন।"[৪৫]

'উমার (রা) উক্ত বৃদ্ধ ইহুদীর জন্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন- এটা তো তিনি শাসক হিসেবে করতেই পারেন। কিন্তু তিনি সেই ইহুদীকে লক্ষ্য করে যে কথাটি বললেন, তা আমাদের সামনে চিন্তার নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে। যে সহানুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন এটাই ইসলামের সৌন্দর্য ও আসল চরিত্র।

৭. গনীমতের মাল প্রদান

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে গনীমতের মাল প্রদান করাও বৈধ। ইব্ন শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:

---

৪৪ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, ***আল-আদাবুল মুফরাদ*** (বৈরূতঃ দারুল-বাশায়ির আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), হাদীস নং ১২৮, পৃ. ৫৮।

৪৫ ইব্ন যানজূইয়াহ, ***আল-আমওয়াল***, ১ম খণ্ড (সৌদি আরবঃ মারকাযুল মুলক ফায়সাল লিল-বুহূছি ওয়াদ্-দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), হাদীস নং ১৭৯, পৃ. ১৪৩।

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ.

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয় করলেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদের সাথে বের হলেন এবং হুনায়নের যুদ্ধ করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধর্ম ও মুসলিমদেরকে বিজয়ী করলেন। সেদিন রাসূল (সা) সাফওয়ানকে একশত উট দিলেন। অতঃপর আরো একশত উট দিলেন। অতঃপর আরো একশত উট দিলেন। তখন সাফওয়ান বলল- আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এত বেশি দান করলেন। অথচ তিনি এতদিন আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমাকে উট দিতে লাগলেন। এমনকি তিনি এখন আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে গেলেন।"[৪৬]

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا. قَالَ: لاَ شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! কিয়ামত কখন ঘটবে? তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালোবাস তারই সাথী হবে।"[৪৭]

ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কৃষ্টি-কালচারের অনুসরণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে।"[৪৮]

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী, যে ব্যক্তি কোন এক সম্প্রদায়কে ভালোবাসে অথচ সে

৪৬ *সহীহ মুসলিম*, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ২৩১৩, পৃ. ১৮০৬।

৪৭ *সহীহুল বুখারী*, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৬৮৮, পৃ. ১২।

৪৮ *সুনানু আবী দাউদ*, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৪০৩১, পৃ. ৪৪।

তাদের মতো আমল করতে পারে না? উত্তরে নবী করীম (সা) বলেন : যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গী হবে।"[৪৯]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলিমদের দ্বীনি ক্ষতি ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলিম-অমুসলিম একে অপরের কল্যাণ কাজ করায় কোন ক্ষতি নেই। এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠাসহ কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণে বাধা নেই। তাই আমাদের কর্তব্য হলো ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দানের পাশাপাশি তাদের প্রতি সদাচার ও আর্থিক সহায়তা করে নিজের মহৎ চরিত্রের পরিচয় প্রদান করা। সুতরাং মুসলমানদের কর্তব্য হলো কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত অবিশ্বাসী বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা দ্বীনি ক্ষতি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা এবং সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি অনুসরণ করা।

৪৯ *সহীহুল বুখারী*, ৮ম খণ্ড, হাদীস নং ৬১৬৯, পৃ. ৩৯।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শারীরিক সুস্থতা ও চিকিৎসার অধিকার : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ড. মোঃ নজরুল ইসলাম*
ফারজানা আক্তার ডালিয়া**

[Abstract: People do not deliberately disable. Anyone has to be accepted disability due to accident or by birth. Whatever the reason, No one can feel the suffering of the disabled. Disability is viewed negatively by society. A family with a disabled person is also viewed differently by the society. Islam wants to ensure the rights of all people as a complete code of life. It is necessary to follow the instructions of medical science to bring back a disabled to normal life. At the same time they should obey their best for their health by following the Islamic guidelines. Everyone has to work efficiently to mitigate their sufferings. In the early stages of Islam, various steps were taken to treat such patients. Islam sincerely gives special attention to alleviate their sufferings. It is responsibility and duty of all to be vigilant so that they do not fall victim to any kind of superstition and malpractice of treatment. Superstition has been declared invalid in Islam. Islam has given the highest importance to the practice of knowledge. Islam has always encouraged taking necessary steps to solve the problems of autistic and disabled by accepting the medical science acquired through the practice of knowledge. In the present article, the guiding statements of Islam on how to ensure the physical health of people with disabilities and special needs have been highlighted. At the same time, importance is also laid on the knowledge of medical science and how they can return to normal life.]

ভূমিকা

শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে যারা যথাযথভাবে কাজের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে তাদেরকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বা প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। জাতিসংঘের সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ রয়েছে যারা কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধী। এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এর সংখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। মানবজীবনে কেউ তার প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাশা না করলেও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মানুষের জীবনে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিবন্ধিতা কারও কারও জীবনে অভিশাপ হয়ে আসে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন কোন প্রতিবন্ধী নিজেকে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। যা একজন প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষকে স্বাভাবিক মানুষের পাশে একইসাথে চলাফেরা করায় উৎসাহ

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
** উপ-পরিচালক, ভিটিসি (ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার), বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

জোগায়। মানসিক রোগী বা পাগল এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ইসলাম ধর্মে সকল মানুষকে সমান অধিকারের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বাসস্থান ও চিত্তবিনোদন। এ সকল অধিকার সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। কেবলমাত্র বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কিংবা প্রতিবন্ধিতার জন্য মৌলিক চাহিদা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে সকল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এবং প্রতিবন্ধীরা সমাজে স্বাভাবিক জীবন-যাপনের উপকরণগুলো পাচ্ছেন। যার কারণে সমাজে তারা স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে সক্ষম হন। আধুনিক এ সকল চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের সক্ষমতা সকল পরিবারের থাকে না। প্রতিবন্ধীদের সুচিকিৎসা করাতে না পারলে তারা পরিবার ও সমাজের জন্য বোঝা হয়ে থাকে। তখন সে ও তার পরিবার সমাজের বোঝা হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সমাজে অসহায় মানুষ ও পরিবারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইসলাম একটি আদর্শ জীবন ব্যবস্থা (Islam is a complete code of life) হিসেবে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এ সকল নির্দেশনা অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে দিয়ে একজন প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ নিজেদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে উত্তোরণ করতে পারে। ইসলাম শারীরিক সুস্থতার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে এবং কিভাবে ভাল থাকা যায় তারও নির্দেশনা দিয়েছে। শারীরিক কোন সীমাবদ্ধতাকে উত্তোরণের জন্য বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতির চর্চা করা হয়ে থাকে ইসলামে। এ সকল পন্থা ও পদ্ধতি চর্চার মধ্যে দিয়ে একজন মানুষ ভালো থাকতে পারেন। ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক শারীরিক পরিচর্যা করলে একজন প্রতিবন্ধী নিজে যেমন শারীরিকভাবে সুস্থ হতে পারবে অপরদিকে পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্য সম্পদে পরিণত হবে। বর্তমান প্রবন্ধে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনামূলক বক্তব্য তুলে ধরা হবে। ইসলাম আদর্শ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যেক মানুষের যথাযথ অধিকার সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের স্বাস্থ্যের অধিকার সম্পর্কে পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম প্রদত্ত এসব নির্দেশনা সবাই মেনে চললে প্রতিবন্ধীরা সমাজের জন্য বোঝা হয়ে থাকবে না বরং নিজের জন্য যেমন কিছু করতে পারবে তেমনি পরিবার ও সমাজের জন্যও কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে।

বর্তমান গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation-WHO)-এর ১৯৭০ সালের গবেষণায় দেখা যায় বিশ্বের সমগ্র মানুষের মধ্যে ১০ শতাংশ মানুষ কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধী।[১]

১ *Summary of World Report on Disability*, World Health Organization Publications (Joined produced by WHO & The World Bank), Geneva, Switzerland, Published at 2011, p. 7

সর্বশেষ ২০১১ সালে একই সংস্থার গবেষণায় দেখা যায় প্রতিবন্ধীর এ হার ১৫ শতাংশে এসে দাড়িয়েছে।[২] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর এ শুমারী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিশ্বে যত মানুষ থাকুক না কেন তার প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধী। সংস্থাটির প্রতিবেদন মোতাবেক পৃথিবীতে কোন না কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বসবাস করছেন ১ বিলিয়নের চেয়েও বেশি মানুষ।[৩] উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, প্রতিবন্ধী কিংবা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের এই সংখ্যা আরও বাড়ার প্রবণতা রয়েছে।[৪] অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে দেখা যায় প্রতিবন্ধীদের এ সংখ্যা আরও বেশি।[৫] যেসব পরিবার নিম্ন আয়ের অন্তর্ভুক্ত, আয় করার সামর্থ্য রাখেনা, কাজ পায়না কিংবা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনা তাদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি আরও বেশি।[৬] দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে অংশ অতি দরিদ্র এবং তাদের মধ্যে যারা সংখ্যালঘু তাদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী হবার ঝুঁকি থাকে তুলনামূলক বেশি।[৭] প্রতিবন্ধিতার পরিসংখ্যানে বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্নরা বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগে থাকেন। এ সকল সমস্যা সম্পর্কে অনেক প্রতিবন্ধী কাউকে বলতেও পারে না। অনেক প্রতিবন্ধী বললেও পারিবারিক চাপে অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আবার অনেক প্রতিবন্ধী আর্থিক দৈন্যতার জন্য যথাযথ চিকিৎসা সেবা পায়না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভুল চিকিৎসার কারণেও অনেক মানুষ প্রতিবন্ধিতার স্বীকার হয়ে থাকে। বর্তমান গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়ে দ্বৈতয়িক উৎসের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য, শারীরিক অবহেলা ও ত্রুটি নিয়ে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঘটে যাওয়া এসব অমানবিক ঘটনার কিঞ্চিৎ অংশ

---

২ Ibid

৩ Ibid

৪ Ibid, p. 8

৫ Ibid

এ সম্পর্কিত রিপোর্টের বিস্তারিত আরও তুলে ধরা হল : (People with disabilities report seeking more health care than peoole with our disabilities and have greater unmet needs. For example, a recent survey of people with serious mental disorders, showed that between 35% and 50% of people in deveopled countries, and between 76% and 85% in developing countries, received no treatment in the year prior to the study. Reference-http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/ (Accessed Date-29-10-2015)

৬ *Summary of World Report on Disability*, World Health Organization Publications (Joined produced by WHO & The World Bank), Geneva, Switzerland, Published at 2011, p. 8

৭ Ibid

উপস্থাপন করে বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষাপট রচনা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের শারীরিক প্রতিকূলতা, চিকিৎসকদের অবহেলা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অবহেলার কিছু প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রতিবন্ধীদের সমস্যা উত্তরণে শারীরিক সমস্যা নিয়ে নতুন নতুন অনেক গবেষণা হয়ে থাকলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে সে সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত না করার ফলে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ডাক্তাররা সে সকল বিষয় আয়ত্ত্বে আনতে ব্যর্থ হন। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এ্যাকশন এইডের এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, দেশের মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার কোন পাঠ্যক্রম নেই। সরকারি বা সেবরকারি মেডিকেলগুলোতে চিকিৎসকদের কাছ থেকে কোন চিকিৎসা পান না প্রতিবন্ধীরা। হাসপাতালগুলোতে আছে নানান প্রতিকূলতা। ফলে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৫ ভাগ প্রতিবন্ধী মানুষ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য অধিকার সুরক্ষা: রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা" শীর্ষক এক গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া গেছে। আগারগাঁওয়ে এলজিইডি কক্ষে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা গবেষণার এ সকল তথ্য প্রকাশ করেন। প্রথম আলো পত্রিকায় "প্রায় ১৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী চিকিৎসাসেবা-বঞ্চিত" শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ সকল তথ্য পাওয়া যায়।[৮] অন্য এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের অধিকাংশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও সমজাতীয় প্রতিবন্ধীরা স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পায় না।[৯]

অটিষ্টিক শিশুদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা নিয়ে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে বলা হয়েছে, "অটিষ্টিক শিশুদের জন্য পরিচর্যাই মুখ্য" অটিজম ব্যবস্থাপনা নিয়ে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণের উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে চিকিৎসকেরা বলেছেন, অটিষ্টিক শিশুদের চিকিৎসার চেয়ে পরিচর্যাই মুখ্য বলে দাবী করেন বিশেষজ্ঞরা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ইনষ্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক-নিউরো-ডিসঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইনপা) দুই দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। অটিষ্টিক শিশুদের মা-বাবাদের সচেতনতা ও বাসায় অটিষ্টিক শিশুদের উন্নতির জন্য কাজ করার লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।[১০] বাংলাদেশের অটিজম বিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটির চেয়ারম্যান সায়মা ওয়াজেদ হোসেন বলেছেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সামাজিক সেবাসহ প্রতিটি খাতে অটিস্টিক শিশুদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়

---

৮ "প্রায় ১৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী চিকিৎসাসেবা- বঞ্চিত" ২৩ নভেম্বর ২০১৫ইং, দৈনিক প্রথম আলো

৯ (ম্যাথিই (হেজী) স্মিথ, "আত্ম-নির্ভরশীল ও অংশগ্রহণমূলক স্বাধীন জীবন" *আমার কথা আমি বলব'; বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আদায়ে সেক্ষ এডভোকেসীঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, দিলারা সাত্তার মিতু (সম্পা), ঢাকা: সীড, সপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ৪২

১০ শিরোনাম-"অটিষ্টিক শিশুদের জন্য পরিচর্যাই মুখ্য" ২০ নভেম্বর ২০১৫ইং, দৈনিক প্রথম আলো

সম্পৃক্ত করতে হবে। তাহলেই অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন সম্ভব হবে। ০২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের 'ইকোসক চেম্বারে আয়োজিত "বিশ্ব অটিজম সম্প্রদায়ের জন্য বিজ্ঞান, সহযোগিতা ও উত্তর বিষয়ক আলোচনায় সায়মা এসব কথা বলেন। উন্নয়নশীল বিশ্বে অটিজম মোকাবিলায় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, সীমিত সেবা, সেবাদানকারীদের মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের অভাব এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেন। "উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অটিজমের বহুমাত্রিক কৌশল" শীর্ষক পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় তিনি বলেন, ২০১১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে অটিজম সচেতনতা ও সেবা নিয়ে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে। তিনি বলেন, অটিজম বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, জাতীয় পরামর্শক কমিটি এবং কারিগরি নির্দেশক কমিটির মাধ্যমে সমন্বিতভাবে অটিজম সচেতনতা দ্রুত চিহ্নিতকরণ, সেবা ও পুনর্বাসন করা হচ্ছে। এ জন্য ১৩ টি মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করছে।[১১]

অটিষ্টিক শিশুদের শারীরিক সমস্যা ও চিকিৎসা সেবা নিয়ে অন্য এক গবেষণায় বলা হয়েছে, "অটিষ্টিক শিশুর মানসিক বিকাশে চাই সহযোগিতা" রাজধানীর লালমাটিয়া মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে 'ইন্টারন্যাশনাল অটিজম ফাউন্ডেশন' আয়োজিত সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, 'মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে কোন রকম অবহেলা না করে তার বিকাশের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাটুকু যাচাই করে তাকে সহযোগিতা করতে হবে। এটা আশংকাজনকভাবে আমাদের সমাজ থেকে কমে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা।[১২] অন্য এক গবেষণায় বলা হয়েছে, "অটিষ্টিক শিশুদের বুঝে শুনে খাবার দিতে হবে" বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিউট্রিশন এন্ড অটিজম রিসার্চ সেন্টার (নার্ক) আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেছে, অটিষ্টিক শিশুদের খাবারে অভিভাবকদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কিছু খাবার রয়েছে যা শিশুদেরকে আরও অসুস্থ করে তুলতে পারে।[১৩]

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য এক গবেষণায় বলা হয়েছে, "ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মা জন্ম দিতে পারেন প্রতিবন্ধী শিশুর" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে গর্ভাবস্থায় আক্রান্তের সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। বিশ্বের অন্যান্য

---

১১ ০৪ এপ্রিল ২০১৫ইং, দৈনিক প্রথম আলো

১২ শিরোনাম-"অটিষ্টিক শিশুর মানসিক বিকাশে চাই সহযোগিতা" দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ৩

১৩ শিরোনাম-"অটিষ্টিক শিশুদের বুঝেশুনে খাবার দিতে হবে" ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ইং, দৈনিক প্রথম আলো, পৃ. ৫

দেশে এ সংখ্যা ১২ থেকে ১৮ শতাংশের বেশি নয়। ডায়াবেটিস আক্রান্ত মায়ের নিজের জীবনের ঝুঁকি বেশি। তিনি প্রতিবন্ধী শিশুরও জন্ম দিতে পারেন।[১৪]

মানসিক রোগিদের সমস্যা নিয়ে অন্য এক গবেষণায় বলা হয়েছে, "মানসিক রোগাক্রান্ত স্বজনকে লুকিয়ে রাখে অনেক পরিবার" বাংলাদেশের অনেক পরিবার এখনো মানসিক রোগাক্রান্ত স্বজনকে লুকিয়ে রাখে। মানসিক রোগীরা মানুষ হিসেবে যথাযথ মর্যাদা পায় না। আবার যে পরিবারে মানসিক রোগী আছে, সেই পরিবারটিকেও সমাজে কখনো কখনো একঘরে করে রাখা হয়। মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এক সেমিনারে এ তথ্য তুলে ধরেন। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে মানসিক স্বাস্থ্যে মর্যাদাবোধ নিয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আলোচকরা বলেন, একজন মানুষকে তখনই সুস্থ বলা হবে, যখন সে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকবে। মানসিক অসুস্থতার অনেক ধরন আছে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ মানসিকভাবে অসুস্থ হয় এবং বেশির ভাগ সময় তা লুকিয়ে রাখে। মানসিক সমস্যায় ভোগা মানুষকে দূরে ঠেলে না দিয়ে তাকে কথা বলার সুযোগ করে দিতে হবে।[১৫]

বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবা অপ্রতুল। প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের অভাব যেমন রয়েছে তেমনি বিষয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকার ফলে ভুল চিকিৎসা ও অপচিকিৎসার মাত্রা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৬] অনেক সময় দেখা যায় চিকিৎসার অবহেলায়ও অনেকে প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে। এ বিষয় নিয়ে অনেক প্রতিবেদন বাংলাদেশে অহরহ দেখা যাচ্ছে।[১৭] যুক্তরাজ্যের একটি নার্সিং হোমে ডাক্তারদের নিতান্ত অবহেলায় এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান আমার ভাই ডাউন সিনড্রোমজনিত আক্রান্ত জেমস।[১৮] বাংলাদেশে ভুল চিকিৎসা, অপচিকিৎসা কিংবা অবহেলার দরুন অসংখ্য মানুষ প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত হচ্ছে। এ সকল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরী।

প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞা

প্রতিবন্ধী বলতে শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে অসুস্থতাকে বোঝায়। এ অবস্থার ফলে ব্যক্তি বা শিশু প্রাত্যহিক কার্য-কলাপে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। বাংলা সংসদ অভিধানে বলা

---

১৪ শিরোনাম-"ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মা জন্ম দিতে পারেন প্রতিবন্ধী শিশুর" ২৩ নভেম্বর ২০১৫ইং, দৈনিক প্রথম আলো, পৃ. ৯

১৫ শিরোনাম-"মানসিক রোগাক্রান্ত স্বজনকে লুকিয়ে রাখে অনেক পরিবার" ১৬ অক্টোবর ২০১৫ইং, দৈনিক প্রথম আলো, পৃ. ৯

১৬ ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ইং, দৈনিক প্রথম আলো

১৭ ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ইং, দৈনিক ইত্তেফাক

১৮ জুলিয়ান ফ্রান্সিস, "প্রতিবন্ধীদের বুঝতে ও সম্মান করতে শেখা কিছু করণীয় ও বর্জনীয়" আমরা করবো জয় (জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের একটি নিয়মিত প্রকাশনা), ২১তম সংখ্যা, ফেব্রয়ারী-মার্চ ২০১৫, পৃ. ৪

হয়েছে, প্রতিবন্ধ অর্থ বাধা ও অন্তরায়। প্রতিবন্ধকতা অর্থ বাধাদান বা কোন কাজে প্রতিবন্ধকতা। প্রতিবন্ধী অর্থ বাধাযুক্ত, বাধাজনক কিংবা দৈহিক শক্তির একান্ত অভাব বা অঙ্গহানি হেতু যারা আশৈশব বাধাপ্রাপ্ত।[১৯] প্রতিবন্ধীর ইংরেজি প্রতিশব্দ Disable. Disable-এর অর্থ করতে গিয়ে Law Dictionary-তে বলা হয়েছে অক্ষম।[২০] Disability-এর অর্থ করতে গিয়ে Law Dictionary-তে বলা হয়েছে, অপারগতা, অসামর্থ্য ও অক্ষমতা।[২১] Disability-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে *The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language*-এ বলা হয়েছে, Disability means, "a being physically or mentally disabled"; এবং disabled means, "to incapacitate physically or mentally".[২২]

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী সনদের Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)-এর মতে, প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্ত করে।[২৩] আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই. এল. ও) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তা হল, "একজন প্রতিবন্ধী হচ্ছেন তিনি, যার স্বীকৃত শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্থতার কারণে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা কমে যায়।"[২৪] বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত গেজেটে প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "প্রতিবন্ধিতা" অর্থ যে কোন কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।[২৫] বিশ্ব

---

১৯ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সঙ্ক), *সসংদ বাঙ্গালা অভিধান*, ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫, পৃ. ৪৪৪

২০ Bernard S. Cayne (Ed), *The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language*, New York: Lexicon, 1987, p. 269

২১ Gazi Shamsur Rahman, *Law Dictionary*, Dhaka: Khoshroz Kitab Mahal, 2003, p. 95

২২ Bernard S. Cayne (Ed), *The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language*, New York: Lexicon, 1987, p. 269

২৩ দিলারা সাত্তার মিতু (সম্পা), *প্রতিবন্ধিতা কি ও কেন?* (Primary Handbook on Disability), ঢাকা: সীড ট্রাস্ট, ২০১২, পৃ. ৩

২৪ ডা. সজল দেওয়ান, "সমতা ও পূর্ণ অংশগ্রহণ, অগ্রগতির মূল্যায়ন ও নতুন উদ্যোগের আহ্বান", *প্রতিবন্ধি ও উন্নয়ন*, সেলিম রেজা হাসান ও এম. এম. শামছুল আজম (সম্পা), ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০২, পৃ. ৭১

২৫ *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৮৭৭৬

স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতা এবং ভঙ্গুরতাকে প্রতিবন্ধিতার একটি ছায়া প্রতিশব্দ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবন্ধিতা হল ব্যক্তির স্বাস্থ্যগত (যেমন- সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম এবং হীনমন্যতা)-এবং পরিবেশগত (নেতিবাচক মনোভাব, পরিবহনে এবং ভবনগুলোতে ওঠার সুযোগের অপ্রাপ্যতা এবং একইসাথে সামাজিক সহযোগিতারও যথেষ্ট অভাব) কারণগুলির সাথে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার নেতিবাচক আদান-প্রদান।[২৬]

উপরের সকল সংজ্ঞাগুলোর সারাংশ করলে বলা যায়, মানুষের যে কোন প্রকার বৈকল্যকেই প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কেননা, মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এর কোন অংশের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেহের সক্ষমতা এবং কার্যকারিতা কোন না কোনভাবে হ্রাস পায়। এ সমস্যা হতে পারে জন্ম পূর্ববর্তী কিংবা জন্মের সময় কিংবা জন্মের পরে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীর বহুমুখী প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শারীরিক সুস্থতা ও চিকিৎসার অধিকার: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য চিকিৎসা একটি অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা। চিকিৎসা লাভের অধিকার বেঁচে থাকার অধিকারের পরিপূরক। স্বাস্থ্য মানুষের অমূল্য সম্পদ। সুস্থ স্বাস্থ্যকে সকল সুখের মূল বলা হয়। স্বাস্থ্যহীন মানুষ পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখী। আর এ জন্যই শারীরিক সুস্থতা সকল মানুষের কাম্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সবল, প্রতিবন্ধী নির্বিশেষে এ চাহিদা সকলের মধ্যে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। অসুস্থতা মানুষের স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে নানা রকম বাধার সৃষ্টি করে। রোগাক্রমনের দ্বারা মানবদেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ফলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।[২৭] বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রতিবন্ধীরা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা,

---

২৬ "Disability defines as an umbrella term for impairments, activity limitations, and participation restrictions. Disability refers to the negative aspects of the interaction between individuals with a health condition (such as cerebral palsy, Down syndrome, depression) and personal and environmental factors (such as negative attitudes, inaccessible transportation and public buildings, and limited social supports)."
Sally Hartley et al. (Eds), *Summary of World Report on Disability*, Geneva: WH & World Bank, 2011, p. 7

২৭ Sophie Mitra et al, *Disability and Poverty in Developing Countries: A Snapshot from the World Health Survey*, SP Discussion Paper No. 1109, Social Protection & Labor Unit, The World Bank, 2011, p. 20

বাকপ্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা, মুগুর পা, পোলিও, রিকেট, কাটা ঠোঁট বা ঠোঁট কাটা, কাটা তালু বা তালু কাটা, ভাষাগত অথবা ভাষা আয়ত্তে অপারগতাজনিত প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য যে কোন প্রতিবন্ধিতার যথাযথ চিকিৎসা সেবা দেওয়া ও নেওয়া সম্ভব হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদেরকে চিকিৎসা করানো হলেও 'যাদুর মত নিরাময়' হবে এই প্রত্যাশা করে থাকেন অভিভাবকরা।[২৮] প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের চিকিৎসার ব্যয়ভার অনেক পরিবারের সামর্থ্যের বাইরে। প্রতিবন্ধীদের যে রকম সেবা ও শুশ্রূষা করা দরকার তাও অনেক পরিবার করে না।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও মানবতার আদর্শ। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের সকল মানুষই সমান ও পরস্পর ভাই ভাই। আপদে-বিপদে একে অন্যের সহায়ক। সেবামূলক কাজের উপর ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানুষের কল্যাণ সাধন ইসলামের প্রধান কাম্য। এতে রয়েছে মানবজীবনের জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় নীতি ও যে কোন সমস্যা সমাধানের বাস্তব উপায় ও উপকরণ। ইসলামে অন্যান্য নীতির ন্যায় স্বাস্থ্য নীতির কথা বলা হয়েছে। মহানবী (সা) সুস্থ শরীর কামনা ও অসুস্থতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছেন এবং সাথে সাথে স্বাস্থ্য সচেতনতার ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।[২৯] সুস্থ ও স্বাভাবিক শরীর ও মন কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি করে। ইবাদত বন্দেগীর জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা প্রয়োজন। ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে রোগ আল্লাহ্ থেকে আসে আর চিকিৎসাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এ বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, "এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।"[৩০] হাদীসে এসেছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন রোগ বা ব্যাধি সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক তিনি পাঠাননি কিংবা ওষুধ সৃষ্টি করেননি।[৩১] হাদীস আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "প্রত্যেক রোগেরই কোন না কোন ঔষধ আছে, কাজেই রোগ অনুযায়ী ঔষধ দেওয়া হলে আল্লাহ্‌র হুকুমে তার

---

২৮ Nirafat Anam, Ph.D. et al., *Situation Analysis and Need Assessment on Street Children with Disabilities in Dhaka City*, Dhaka: Centre for Services and Information on Disability (CSID), 1999, p. 11

২৯ Muhammad Salim Khan, *Islamic Medicine*, UK: Routledge Kegan Paul, 1986, p. 10

৩০ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ আল-কুরআন, ২৬ : ৮০

৩১ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ইমাম বুখারী (র), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুত তিববী, বাবু মা' আনজালাল্লাহু দা'আন..., হাদীস নং-৫৬৭৮, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ৬৯৮

আরোগ্য ঘটে।"[৩২] এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, এখানে রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদানে উৎসাহিত করা হয়েছে। অসুস্থতায় চিকিৎসা গ্রহণ করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত। সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, যারা অসুস্থ তারা আল্লাহ্র রাসূলের (সা) নিকট প্রায়ই আগমন করতো এবং তিনি তাদের আরোগ্যের জন্য ব্যবস্থাপত্র দিতেন এবং আল্লাহ্র নিকট তাদের আরোগ্যের জন্য দোয়া করতেন। হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জামানায় জনৈক ব্যক্তি আঘাত পেয়ে ক্ষতস্থানে তার রক্ত জমাবদ্ধ হয়ে যায়। উপস্থিতদের একজন বনূ আনবার গোত্রের দুই ব্যক্তিকে ডেকে আনলে উভয়েই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কে ভালো জানে? এ কথা শুনে উভয়েই বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! চিকিৎসাতেও কি কল্যাণ আছে? বর্ণনাকারী যায়িদ ইবেন আসলাম (রা) ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন, যিনি রোগ দিয়েছেন চিকিৎসাও তিনি দিয়েছেন।"[৩৩] ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ-ব্যাধি গুণাহের ক্ষতিপূরণ ও কাফফারা স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জ্বরকে গালি দিওনা, কেননা পাপসমূহকে এমনভাবে দূর করে যেমনিভাবে আগুন লোহার মরিচা (জং) বা ময়লা পরিষ্কার করে দেয়।[৩৪] এমনকি আক্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন ধর্মের হলেও তাকে চিকিৎসা প্রদানের উদাহরণ রাসূলের জীবনীতেও পাওয়া যায়।[৩৫] রাসূল (সা) নিজে রোগীর সেবায় নিঃস্বার্থভাবে ও অনাবিল দরুদসহ সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রতিবন্ধীসহ সকল রোগীর জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত গুরুত্ব সহকারে।[৩৬] এছাড়া মিশরে ৮৭৩ সালে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে আহমদ ইবনে তুলুন

---

৩২ عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل

ইমাম মুসলিম (র), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, বাবু লিকুল্লী দা'ইন দাওয়াউন...., হাদীস নং-২২০৪, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ৬৪২

৩৩ ড. মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, *ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, ২০১৩, পৃ. ২৮

৩৪ لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ইমাম মুসলিম (র), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররী ওয়াসসিলা ওয়াল আদাব, বাবু সাওয়াবিল মুকমিন ফী'মা ইউছিবুহু মিন মারযিন...., হাদীস নং-২৫৭৫, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ৭৩৯

৩৫ Muhammad Salim Khan, *Islamic Medicine*, Ibid, p. 10

৩৬ মুফতী মুতীউর রহমান, "রোগীর সেবায় মহানবী (সা)" *স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম*, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার (সম্পা), ঢাকা: ইফাবা, ২০১৩, পৃ. ২৩; ড. মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, *ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০১৩, পৃ. ৪৫

কর্তৃক ইসলামিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল যেখানে মানসিক রোগীদের জন্য ইসলামী আদলে চিকিৎসা করা হতো।[৩৭] ইসলামের বিভিন্ন জিহাদের সময়ও লক্ষ্য করা গেছে যেসব যোদ্ধা তাদের হাত পা, চোখ বা বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ হারিয়েছেন তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৩৮]

চিকিৎসা করানো কিংবা অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করাকে ইসলাম গুরুত্বের সাথে দেখেছে। রোগীর সেবা করার ফযীলত অনেক। হাদীসে এসেছে, কোনো মুসলিম তার কোনো রুগ্ন মুসলিম ভাইকে সেবা শুশ্রূষা করতে গেলে সে ততক্ষণ যেনো জান্নাতের ফলসমূহের বাগানে অবস্থান করে।[৩৯] নবী করীম (সা)-এর নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বদরের যুদ্ধের সময়ে নবী করীম (সা) হযরত উসমান (রা) কে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন শুধু তাঁর রুগ্ন স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা করার জন্য। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "বদর যুদ্ধে হযরত উসমান (রা)-এর অনুপস্থিতির কারণ হল তাঁর স্ত্রী মহানবীর কন্যা রোগাক্রান্ত ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অথবা শহীদ ব্যক্তির যে প্রতিদান তোমারও সে প্রতিদান।"[৪০]

---

৩৭ Michael Dols, "*Insanity in Byzantine and Islamic Medicine"*, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 38, Symposium on Byzantine Medicine, USA: Trustees for Harvard University (1984), p. 135

৩৮ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

রুবাই বিনতে মুআউয (রা) বলেন, আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে যুদ্ধে শরীক হয়ে পানি পান করাতাম এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম। (ইমাম বুখারী (র), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসিয়ার, বাবু মুতাওয়াতিন নিসাইল জারহা ফীল গাযবী, হাদীস নং-২৮৮৩, কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০, পৃ. ৩৪৯)

৩৯ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ

ইমাম মুসলিম (র), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররী ওয়াসসিলা ওয়াল আদাব, বাবু ফাযলি ইয়াদাতিল মারিযন, হাদীস নং-২৫৬৮, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ৭৩৭

৪০ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَه

ইমাম বুখারী (র), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ফারজিল খুমুসি, বাবু ইযা বাআ'ছাল ইমামু রসূলান ফী হাজাতিন..., হাদীস নং-৩১৩০, কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০, পৃ. ৩৭৮

মহানবী (সা)-এর যুগে মুসলিম নারীগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুদ্ধাহত ব্যক্তিদের সেবা ও শুশ্রূষা করতেন।[৪১] অন্য এক হাদীসে পাওয়া যায়, প্রিয় নবী (সা) আশরাফ-আতরাফ[৪২], ধনী-নির্ধন, আযাদ-গোলাম নির্বিশেষে সকলের খোঁজ-খবর নিতেন। কারোর অসুস্থতার সংবাদ পেলে নিঃসঙ্কোচে তার শুশ্রূষার জন্য যেতেন। এমন কি একবার তাঁর জনৈক ইয়াহুদী খাদেম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তিনি সেই ইয়াহুদীর শুশ্রূষা করেন। প্রিয় নবী (সা)-এর চাচা আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ করেনি অথচ তার অসুস্থতাকালে তিনি শুশ্রূষার জন্য গিয়েছিলেন।[৪৩] একজন সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় একজন প্রতিবন্ধীর চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ইসলাম অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করেছে। একজন স্বাভাবিক মানুষের মত প্রতিবন্ধী আল্লাহ্‌র নিয়ামত এবং তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পিতা-মাতার নিকট আমানত। প্রতিবন্ধীত্ব থেকে মুক্তি কিংবা প্রতিবন্ধকতাজনিত কষ্ট প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রাপ্তি তাদের অধিকার। তাদের চিকিৎসা প্রদান করা পিতা-মাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব। প্রতিবন্ধী বলে সন্তানের চিকিৎসা না করিয়ে তাকে মৃত্যু বা আরো প্রতিবন্ধীত্বের দিকে ঠেলে দেওয়া একটি মানবতাবিরোধী কাজ।[৪৪] বর্তমান সমাজে অনেক প্রতিবন্ধীকে চিকিৎসা ও সেবাজনিত অবহেলার কারণে আরও বেশি প্রতিবন্ধিতার সম্মুখীন হতে হয়।[৪৫]

---

৪১ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ ইমাম বুখারী (র), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, বাবু রদ্দিন নিসাঈ ওয়াল জারহা ওয়াল কাতলা, হাদীস নং-২৮৮৩, কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০, পৃ. ৩৪৯

৪২ আশরাফ শব্দের অর্থ হল অভিযাত, সম্ভ্রান্ত ও ভাল এবং আতরাফ শব্দের অর্থ হলো নিম্নমান, মন্দ ও অনভিযাত।

৪৩ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ইমাম বুখারী (র), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল মারদা, বাবু ইয়াদাতিল মুশরিক, হাদীস নং-৫৬৫৭, কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০, পৃ. ৬৯৫ এ প্রসঙ্গে হাদীসে আরও এসেছে, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাধারণ একজন গোলামের দাওয়াত কবুল করতেন, অসুস্থদের শুশ্রূষা করতেন এবং গাধার পিঠেও আরোহণ করতেন। (হাফিয আবূ শায়খ ইস্‌ফাহানী (র), *আখলাকুন্ নবী (সা)*, ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ ও অন্যান্য (অনু), ঢাকা: ইফাবা, ২০১৪, পৃ. ৯৬)

৪৪ Diane Nelson Bryen & Juan Bornman (Eds), "Stop Violence against People with Disabilities: An International Resource", South Africa: *Pretaria University Law Press*, 2014, p. 21

৪৫ মাহ্‌বুব কবীর, *একীভূত সমাজের পানে: মানসিক অসুস্থ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রগতি সহায়তায় একগুচ্ছ হাতিয়ার*, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ. ১৮

প্রতিবন্ধিতার বিভিন্ন স্তর উন্নতমানের চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্যযোগ্য হওয়া সম্ভব। আবার অনেক রোগ রয়েছে যা পরবর্তীতে প্রতিবন্ধীত্ব সৃষ্টি করে। অনেক অস্থায়ী প্রতিবন্ধিতা চিকিৎসার অভাবে স্থায়ী প্রতিবন্ধিতার সৃষ্টি করে। অনেক প্রতিবন্ধিতা আছে যেগুলো আধুনিক অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দূর করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রাথমিক স্তরে থাকা কানে কম শোনা রোগের চিকিৎসা করলে তা দূর করা সম্ভব। অপরদিকে হেয়ার এইড যন্ত্র ব্যবহার করেও তাদের শ্রবণশক্তিকে বাড়ানো যায়। পোলিও রোগের যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে তা পরবর্তীতে পঙ্গুত্ব সৃষ্টি করে। আবার দেখা যায় যে, আধুনিককালে কৃত্রিম পা সংযোজনের মাধ্যমে পঙ্গু ব্যক্তিকে চলার শক্তি প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। সে কারণে প্রত্যেক প্রতিবন্ধীরই অধিকার রয়েছে যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা দূর করার। কোন একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও যেন চিকিৎসার অভাবে আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ইসলাম দান করতে উৎসাহ দেয়। এই দানের ক্ষেত্রে রোগী, অসুস্থ ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধীরা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তাঁর চিকিৎসার জন্য অর্থ প্রদান করাও ইসলামের দৃষ্টিতে মহৎ কাজ। চিকিৎসা লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরা স্বাভাবিক রোগী থেকে আলাদা নয়। তারাও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলে একই রকম কষ্টভোগ করেন। এমনকি শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে তারা আরো বেশি কষ্টভোগ করেন। তাই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে এগিয়ে আসার ব্যাপারে ইসলামে যত কথা বলা আছে তা প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। একজন প্রতিবন্ধী যখন কষ্টের সীমা সহ্য করতে না পেরে কাতরান তখন তিনি অন্যের সাহায্য প্রার্থী হন এবং অন্যের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আর ইসলামে যে কোন আশ্রয়প্রার্থীকে নিরাপত্তা প্রদানের কথা বলা হয়েছে, এমনকি যদি সে মুশরিকও হয়। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিবে; কারণ তারা অজ্ঞ লোক।"[৪৬]

বস্তুত মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীবনে একে অপরের মুখাপেক্ষী। পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দে ভরপুর হয়ে উঠে। যখন কোন মানুষ রুগ্ন হয় তখন স্বভাবত অন্যদের তাকে সেবা শুশ্রূষা করার প্রয়োজন হয়। সমাজের অসুস্থদের যদি অন্যরা চিকিৎসা না করে তবে তাদের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সেবায়, দুঃখ-কষ্টে সাহায্যের হাত বাড়াতে হয়। এভাবে জীবন হয়ে উঠে অর্থপূর্ণ। প্রতিবন্ধীদের সেবায় হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং চিকিৎসা সেবা দিয়ে তাদের সুস্থ করে তোলা সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। সর্বোপরি প্রতিবন্ধীদের সর্বপ্রকার চিকিৎসার জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাধ্যমত কাজ করতে হবে।

---

৪৬ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ
আল-কুরআন, ০৯ : ০৬

প্রতিবন্ধীদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা একান্ত অপরিহার্য। সুন্দর ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্মলগ্ন থেকে পিতামাতাকে সতর্কতা ও অতীব যত্নের সাথে তাদের লালন-পালন করা অত্যাবশ্যক। প্রতিবন্ধীর সুস্থ জীবন গড়ে তোলার জন্য পিতামাতাকে শৈশব থেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবন্ধীরা কোন কোন ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভোগে।[৪৭] এই ভারসাম্যহীন অবস্থা থেকে প্রতিবন্ধীদের রক্ষা করা ইসলাম নির্দেশিত মৌলিক অধিকারেরই শামিল। প্রতিবন্ধীদের জীবন ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ইসলামের গুরুত্বারোপ প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সর্বজনীনতার প্রতি গুরুত্বারোপেরই শামিল। প্রতিবন্ধীরা সাধারণত শারীরিকভাবে কিছুটা দুর্বল থাকে।[৪৮] এ কারণে ইসলাম নির্ধারিত নীতিমালার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও সুস্থ জীবনের পন্থাসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পরিচালনার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এগুলো মেনে চলা জরুরি। মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্থতার নি'আমত দান করেছেন। সুস্থতার সাথে কোন কিছুর তুলনা হয় না। হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা) ঘোষণা করেন, "আল্লাহ্ সর্বপ্রথম যে সব নি'আমত সম্পর্কে বান্দাকে প্রশ্ন করবেন, তন্মধ্যে প্রধান হল সুস্থতা। কিয়ামতে তাকে প্রশ্ন করা হবে, "আমি কী তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দেইনি?"[৪৯]

মানব জীবনের ভিত্তি হচ্ছে তার শৈশবকাল। কেননা শৈশবকালে দেহ ও মনকে যদি রোগমুক্ত রাখা যায় তবে অটিস্টিক কিংবা প্রতিবন্ধিতার সম্ভাবনা কম থাকে। এর ফলে সে সারাজীবন ভাল থাকার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই সন্তান জন্মলাভের লগ্নে এমনকি মায়ের গর্ভে আসার সময় থেকেই শিশুর প্রতি যথোপযুক্ত যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্ব ও তাগীদ প্রদান করেছে। জন্মের পরে প্রতিবন্ধীদের পার্থিব জীবনের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা পিতামাতার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। তাই যে কোন রোগ, মহামারী এবং যে সমস্ত রোগের বিষয়ে মনুষ্য চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় করা যায় সে সকল বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং

---

৪৭ Ching-I Hung, Chia-Yih Liu, and Tsai-Sheng Fu, "Depression: An important factor associated with disability among patients with chronic low back pain", *The International Journal of Psychiatry in Medicine*, Department of Orthopedics, (Chang Gung Memorial Hospital at Keelung, Taiwan) 2015, Vol. 49(3), p. 187–198

৪৮ Stewart Gabel & Marilyn T. Ericknon (eds), *Child Development and Developmental Disabilities*, USA: Little Brown and Company, 1980, p. 224

৪৯ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَرْزَمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ مِنْ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ

ইমাম তিরমিযী (র), *সুনানে তিরমিযী*, খ. ৫ম, কিতাবু তাফসিরীল কুরআন, বাবু অমিনসুরাতি আলহা কুমুত তাকাসুর, হাদীস নং-৩৩৫৮, কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১০, পৃ. ২৭৯

অসতর্কতা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"[৫০]

বর্তমান সময়ে পরিবেশ নষ্ট হওয়া এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে মানব সমাজে অনেক রোগ-বালাই হয়ে থাকে। মানুষ এসকল রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। অজ্ঞতাবশত কোন রোগ বা মহামারীর শিকারে পরিণত হয়ে থাকলে তার সুচিকিৎসা করা প্রয়োজন। যে কোন প্রকার জীবন হরণকারী রোগ থেকে প্রতিবন্ধীদেরকে বাঁচানোর জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। ইসলাম মানুষকে সঠিক পথে চলার নির্দেশনা দেয় এবং সকল ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার এবং প্রত্যেক রোগের সম্ভাব্য চিকিৎসার অনুসন্ধানের জন্য বলে। এ মর্মে মহানবী (সা) বলেন, "আল্লাহ্ এমন কোন রোগ দেন নি, যার কোন চিকিৎসার বিধান দেননি। যখন কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয় আল্লাহ্র অনুগ্রহে তা ভাল হয়ে যায়।"[৫১] রোগ-ব্যাধি থেকে প্রতিবন্ধীদের সুস্থতার জন্য যত্নবান হওয়া অত্যন্ত জরুরী। একটি সুস্থ জাতি গঠনে সকল শ্রেণীর মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। রোগ-ব্যাধি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করার ব্যাপারে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। বাচ্চার জন্মকালীন সময়টা মা ও সন্তানের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।[৫২] এ সময়ের অজ্ঞতা, অবহেলা ও সুচিকিৎসার অভাবের ফলে অনেক বাচ্চা মারা যায়; না হয় প্রতিবন্ধিতার সম্মুখীন হয়। তাই এ সময়ের ঝুঁকিমূলক সম্ভাব্য সব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। উপযুক্ত উপায়-উপকরণ ও প্রতিষেধকের বিষয়ে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।[৫৩] প্রসূতি ও নবজাতকের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম সরঞ্জামাদি হাতের কাছে রাখতে হবে। যেন কোন কিছুর অভাবে মা ও সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের জীবনের

---

৫০ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ আল-কুর'আন, ২ : ১৯৫

৫১ عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواءفإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالي ইমাম মুসলিম (র), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস্ সালাম, বাবু লিকুল্লি দা-ইন' দাওয়া-উ'ন, হাদীস নং-২২০৪, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ৬৪২

বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু শব্দের পরিবর্তনে উক্ত বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে এসেছে, عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام ইমাম আবু দাউদ (র), *সুনান আবু দাউদ*, খ. ৪র্থ, কিতাবুত্ তিববি, বাবু ফি আদবিয়াতিল মাকরুহাতি, হাদীস নং ৩৮৭৪, কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১০, পৃ. ১৬৬৮

৫২ Dr. Akter Jahan Fadia Sultana, Unpublished M.Phil Thesis on Prenatal Nutrition and Pregnancy Outcome, Department of Nutrition and Food Science, University of Dhaka, July 1998, p. 37

৫৩ Kristen Lyall et al., "Pregnancy Complications and Obstetric Suboptimality in Association With Autism Spectrum Disorders in Children of the Nurses' Health Study ii" in *International Society for Autism Research* (INSAR), Vol. 5, 2012, p. 23

ঝুঁকির সম্ভাবনা দেখা না দেয়। বাংলাদেশে সন্তান প্রসবকালীন মা ও শিশু মৃত্যুর হার আশঙ্কাজনক।[৫৪] মাতৃগর্ভে সন্তান থাকাকালীন মায়ের অপুষ্টির কারণে শিশুর সঠিক মানসিক বিকাশ ঘটেনা।[৫৫] গবেষণায় দেখা গেছে প্রসূতিকালীন সময়ে অব্যবস্থাপনার কারণে অনেক শিশু মাতৃগর্ভ থেকে প্রসবকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে।[৫৬] তাই প্রসবকালীন মা ও শিশুর মৃত্যু সম্পর্কে সতর্কতা ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব।[৫৭] শিশু জন্মের পর যথোপযুক্ত উপায় ও প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধান শিশুর সুস্থতার জন্য পূর্বশর্ত।[৫৮] এ কারণে শিশুর আঁতুড়ঘরের সকল কার্যাদি সতর্কতার সাথে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে হওয়া প্রয়োজন।[৫৯] প্রসূতি পরবর্তী মাতৃস্বাস্থ্য ঠিক রাখা ও শিশুর পুষ্টির ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে; না হলে শিশুর মানসিক বিকাশ যথাযথভাবে ঘটবে না।[৬০] এমন সব ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে একটি নবজাতকও প্রতিবন্ধিতার শিকার না হয়। ইসলাম একজন মু'মিনকে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান হতে উৎসাহিত করে। হাদীসে বর্ণিত আছে, "শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহ্‌র নিকট দুর্বল মু'মিনের চেয়ে অধিকতর প্রিয়।"[৬১]

---

৫৪ Dr. Akter Jahan Fadia Sultana, Unpublished M.Phil Thesis on Prenatal Nutrition and Pregnancy Outcome, Department of Nutrition and Food Science, University of Dhaka, July 1998, p. 42

৫৫ Myron Winick, *Malnutrition and Brain Development*, New York: Oxford University Press, 1976, p. 98

৫৬ Kristen Lyall et al., "Pregnancy Complications and Obstetric Suboptimality in Association With Autism Spectrum Disorders in Children of the Nurses' Health Study ii" in *International Society for Autism Research* (INSAR), Vol. 5, 2012, p. 24

৫৭ Kevin Ka Shing Chan & Chun Bun Lam, "Paternal Maltreatment of Children with Autism Spectrum Disorder: A Developmenta;-Ecological Analysis" *Research in Autism Spectrum Disorders*, Netherlands: Elsevier Ltd, Volume 32, 2016, p. 112

৫৮ Hjordis O. Atladottir et al., "Maternal Infection Requiring Hospitalization During Pregnancy and Autism Spectrum Disorders" in the *Journal of Autism Development and Disorders*, Springer, 2010, p. 1

৫৯ Mary Ann Stark et al., "Importance of the Birth Environment to Support Physiologic Birth" in *the Journal of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing*, Vol. 45, Issue 2, March-April 2016, p. 286

৬০ Myron Winick, *Malnutrition and Brain Development*, New York: Oxford University Press, 1976, p. 129

৬১ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ। ইমাম মুসলিম (র), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ক্বদর, বাবু ফিল আমরি বিল কুয়্যাতি.., হাদীস নং ২৬৬৪, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ৭৬১

ইসলাম সকল মানুষের শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রতিবন্ধীদের সুস্থজীবন ও সুস্থতার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রতিবন্ধীদের দৈহিক অস্বাভাবিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে হলে তাদের শরীর ও পরিধেয় কাপড়-চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধীদের খাবার, খাবারের জন্য ব্যবহার্য পাত্র ও অন্যান্য আসবাবপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে পসন্দ করেন। তিনি পরিচ্ছন্ন এবং তিনি পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন।"[৬২] প্রতিবন্ধীদের দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য পরিবারকে যত্নশীল হতে হবে। তারা সঠিকভাবে তাদের নিজেদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে না। তারা ময়লা আবর্জনা ধরে অথচ ওভাবেই তারা খাওয়া-দাওয়া করে এক্ষেত্রে তাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। হাতের আঙ্গুলের নখের ভেতর যে ময়লা জমে থাকে তা পরিষ্কার রাখা দরকার। তা যদি পরিচ্ছন্ন রাখা না হয় তবে এতে খাদ্যদ্রব্য দূষিত হতে পারে। যে প্রতিবন্ধীর পরিচর্যা করে তার হাতও পরিষ্কার রাখা জরুরি। হাদীসে আরও এসেছে, "তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যেন হাত ধুয়ে নেয়।"[৬৩] তিনি আরও বলেন, "তোমরা নখ কাটবে এবং গোঁফ ছোট

---

৬২ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ। ইমাম তিরমিযী (র), *সুনানে তিরমিযী*, খ. ৪র্থ, কিতাবুল আদাব, বাবু মা জা'আ ফিন্ নাজাফাহ, হাদীস নং-২৭৯৯, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ৫২৫ বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু শব্দের পরিবর্তনে উক্ত বিষয়টি এভাবে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِك ·

ইমাম মুসলিম (র), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, বাবু কুবুলিস্ সদাকাতি..., হাদীস নং ১০১৫, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ২৭০

৬৩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ইমাম বুখারী (র), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ওজু, বাবুল এসতিজমারু বিতরা, হাদীস নং ১৬২, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ৩০

করবে।"[৬৪] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত হল খাবার গ্রহণের আগে ও পরে হাত ধুয়ে নেওয়া। নবীজির গুরুত্বপূর্ণ এ আমল মানার জন্য হাত-নখ ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এছাড়াও মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি এসে যায়। মুখের ভেতর দিয়ে খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় দেহে প্রবেশ করে। এজন্য প্রতিবন্ধীদের মুখ গহ্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। মুখের ভেতর রয়েছে দাঁত ও জিহ্বা; তাও যথা নিয়মে পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। কেননা, মুখের ভেতর যদি কোন রোগ জীবাণুর ভাইরাস প্রবেশ করে তা হলে তা খাদ্যনালী হয়ে বৃহৎ-অন্ত্রে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং বিভিন্ন রোগব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য মুখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর ইসলাম খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে। দৈনিক কমপক্ষে পাঁচ বার ওযুর জন্য মুখ ধোঁয়াকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। দাঁত ও মাড়ি যাতে ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয় সেজন্য প্রত্যেক ওযুর সময় দাঁতে মিসওয়াক করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "মিসওয়াক করলে যেমন মুখ পরিষ্কার হয় তেমনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টিও লাভ হয়।"[৬৫] তিনি আরও বলেন, "আমি যদি আমার উম্মাতের অথবা সাধারণ মানুষের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তা হলে প্রত্যেক সালাতের সময় তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[৬৬] মানুষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে চোখ। চোখের যত্নের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাস্তব আমল ছিল এরূপ যে, "রাসূল (সা) তাঁর কাছে সুরমা রাখতেন এবং প্রত্যেক রাতে ঘুমাবার আগে তা উভয় চোখে তিনবার করে লাগাতেন।"[৬৭]

---

৬৪ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَبْطَأَ عَنْكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ وَلِمَ لَا يُبْطِئُ عَنِّي وَأَنْتُمْ حَوْلِي لَا تَسْتَنُّونَ وَلَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ وَلَا تَقُصُّونَ شَوَارِبَكُمْ وَلَا تُنَقُّونَ رَوَاجِبَكُمْ- ইমাম আহমদ (র), *মুসনাদ আহমদ*, খ. ৩য়, হাদীস নং ২১৮১, কায়রো: দারুল হাদীস, ১৯৯৫, পৃ. ৭

৬৫ وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ইমাম বুখারী (র), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুস্ সওম, বাবু সিওয়াকির্ রতবি..., কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ২৩০

৬৬ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ ইমাম বুখারী (র), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জুমু'আতি, বাবুস্ সিওয়াকি ইয়াওমুল জুমু'আতি, হাদীস নং ৮৮৭, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ১০৮ বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু শব্দের পরিবর্তনে উক্ত বিষয়টি এভাবে এসেছে, عن أبي هريرة يرفعه قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة ইমাম আবু দাউদ (র), *সুনান আবু দাউদ*, খ. ১ম, কিতাবুত্ তহারাত, বাবুস্ সিওয়াক, হাদীস নং ৪৬, কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১০, পৃ. ৩০

৬৭ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ ইমাম আহমদ (র), *মুসনাদ আহমদ*, খ. ৩য়, হাদীস নং ৩৩২০, কায়রো: দারুল হাদীস, ১৯৯৫, পৃ. ৪১২

উপসংহার

যথাযথ স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সুচিকিৎসা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার থেকে কোন মানুষকে বঞ্চিত করা যাবে না। প্রতিবন্ধিতার বিভিন্ন ধরণ ও প্রকার রয়েছে। আধুনিক যুগে প্রতিবন্ধিতার ধরন ও প্রকার উপলব্দি করে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আধুনিক পদ্ধতি রয়েছে। যে যে ধরনের প্রতিবন্ধী তার জন্য সম উপযোগী ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় যথাযথ চিকিৎসা সেবা যেন প্রতিবন্ধীরা পায় সে লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে। ইসলামী জীবন পরিচালনার মধ্য মানুষের সুস্থতা নিহিত রয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা যথাযথভাবে পালন করলে প্রতিবন্ধিতার হার কমে আসবে বলে মনে করছেন ইসলামী চিন্তাবিদরা। কেননা ইসলাম মানুষের দৈনন্দিন কর্মসূচিতে এমন কিছু নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলা আনয়ন করেছে যা যথাযথ চর্চার মাধ্যমে শারীরিক ব্যায়াম ও আদর্শ পুষ্টির যোগান দিয়ে থাকে। পাশাপাশি ইসলাম মানুষকে স্বাবলম্বী হওয়ার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছে। এই নির্দেশনা কেবলমাত্র স্বাভাবিক মানুষের জন্য নয়। প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদেরও স্বাবলম্বী হওয়ার অধিকার রয়েছে। আর এই অধিকার অর্জন করতে হলে শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠার জন্য যথাযথ চিকিৎসা করা দরকার। প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সকলকে স্বাবলম্বী করতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। ইসলাম প্রদত্ত চিকিৎসা ও শারীরিক সুস্থ্যতার অধিকার প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক মানুষকে পাশে দাড়াতে উৎসাহিত করবে। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধিত্ব নিরসন, তাদের চিকিৎসা এবং শারীরিক সুস্থ্যতার যথাযথ সেবা নিশ্চিত করার জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী চিন্তাবিদ, ঈমাম, খতিব এবং দাঈ' ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত অধিকার ও মর্যাদা প্রচার ও প্রচারণার মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ইসলামী জীবনাচরণে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। একইসাথে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা প্রয়োগ করে প্রতিবন্ধীদের সমস্যার সমাধান করাই ইসলামী আমল। তাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রতিবন্ধীদের একাডেমিক, পারিবারিক, সামাজিক ও স্বনির্ভর হতে শিক্ষা দিতে হবে। যার মধ্যে দিয়ে প্রতিবন্ধীরা নিজেরা স্বাবলম্বী হবে একই সাথে দেশকে সমৃদ্ধ করবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা

ড. মুহাম্মদ রেজাউল কারীম*
মাহমুদুল হাসান**

[Abstract : Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the father of the Bengali nation. Like a new born child he kept the Bengali nation alive. Step by step, he has built up the nation through his charismatic leadership . The red and green coloured flag reached at a pinnacle of success through his tireless and dedicated work. He cherished steadfast trust and faith in Almighty Allah. The basic teachings of Islam were rooted in his heart. So he wanted to enlighten the people of newly independent Bangladesh with the light of Islam. He wanted to spread the teachings of Islam everywhere. The first program he took to spread Islamic education was to establish the Madrasa Education Board for the proper management of the existing Madrasahs in the country and to formulate its educational curriculum and modern syllabus. Finally he made it an autonomous institution. Besides this, the Islamic Foundation was established through an urgent ordinance with the aim of spreading the multifaceted propagation of Islam and mass-oriented implementation of Islamic education throughout the country. This foundation has become an international institution today through its multidimensional and diverse activities. To spread the light of Quran and Hadith from the village to the countryside, he started broadcasting the recitation and interpretation of the Holy Quran on radio and television for the first time in the country, Not only inside the country, but indirectly on foreign land he also played an effective role to the formation of the International Islamic University of Malaysia IIUM.

In addition, he has played an important role in the spread of Islamic education in various ways, including the formation of Sirat Majlis for the spread of education based on the biography of Prophet Muhammad, providing space for Kawmi madrasah, providing space for Ijtema at Tangi, playing significant role in the establishment of OIC, which has become unforgettable in history.]

Keywords: Bangabandhu, Islam, Education, Quran, Hadith, Contribution.

ভূমিকা ঃ সুদূর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতে শিক্ষাই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে এবং জীবনের মান উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। শিক্ষাই আলো, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাই শক্তি। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। কিন্তু কোন সে শিক্ষা? শুধুই তথাকথিত জাগতিক শিক্ষা? যা মানুষকে অক্ষর জ্ঞান দিলেও অন্ধকার মুক্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে? যে শিক্ষা মানুষকে নীতি নৈতিকতাহীন এক জড় পদার্থে পরিণত করছে? না, এ শিক্ষা হল প্রকৃত ওহীর শিক্ষা। যার প্রথম শিক্ষক হলেন মানবতার মহান শিক্ষক বিশ্বনবী (সা)। যিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

* সহযোগী অধ্যাপক, ধনিয়া কলেজ, ঢাকা।
** সহকারী শিক্ষক, ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লাহ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا "

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন, আমাকে শিক্ষক রূপে প্রেরণ করা হয়েছে।[১]

এ শিক্ষা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ও নির্ভুল গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ আল কুরআনের শিক্ষা। এ শিক্ষা সে শিক্ষা যার ব্যাপারে মহানবী (সা) বলছেন,

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ

হুমায়দ ইব্নু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত নবী (সা) বলেন, আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের ইল্ম দান করেন। আমি তো বিতরণকারী মাত্র, আল্লাহই (জ্ঞান) দাতা। সর্বদাই এ উম্মাত কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের উপর কায়িম থাকবে, বিরোধিতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[২]

প্রকৃতার্থে এই দ্বীনি শিক্ষার অভাবেই আজ জাগতিক শিক্ষার বড় বড় ডিগ্রিধারী মানুষেরাও অনায়াসেই অনৈতিক পথে পা বাড়াচ্ছেন।

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই এদেশের সাধারণ মানুষকে সৎ ও নীতিবান করে গড়ে তুলতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীনতার মহা নায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামি শিক্ষার প্রচার প্রসার ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নিম্নে তার কিয়দাংশ আলোচনা করা হল :

১. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন

কুরআন ও হাদিসের আলোকে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে তাকেই ইসলামি শিক্ষা বলা হয়। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের উৎস নিয়েই ইসলামী শিক্ষার সূচনা। আর ইসলামী শিক্ষার অনানুষ্ঠানিক, উপ-আনুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারা পার হয়েই মাদরাসা শিক্ষার পূর্ণতা আসে। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন নবী করীম (সা)-এর যুগ থেকেই হয়েছে। সর্বপ্রথম মক্কা মুকাররামায় দারুল আরকাম ও পরবর্তীতে মদিনা মুনাওয়ারায় আসহাবে সুফ্ফার মাধ্যমে এ শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার লাভ করেছে।

বিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অনেকটা আলাদা হয়ে যাওয়ায় ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আলাদা ইনস্টিটিউশনের প্রয়োজন পড়ে। যে ইনস্টিটিউশন গুলো মাদরাসা নামে ব্যাপক পরিচিত।

---

১ ইবনে মাজাহ, ভূমিকা, হাদিস : ২২৯

২ বুখারি, ইলম, হাদিস : ৭১

'মাদরাসা' শব্দটি 'দারস' থেকে এসেছে। যার অর্থ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ। এর একবচন 'মাদরাসাহ' এবং বহুবচনে 'মাদারিস'। এই হিসেবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্থানকে মাদরাসা বলা হয়।[৩]

বঙ্গবন্ধু ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে প্রথমেই এই মাদরাসা গুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং এর শিক্ষা কারিকুলাম ও আধুনিক সিলেবাস প্রণয়নে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৪]

এ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনের ফলে গোটা দেশের ছাত্র সমাজ আজ অবধি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইসলামী আকীদাভিত্তিক জীবন যাপন করতে পারছে। দেশের প্রতিটি জেলা সদরসহ অনেক থানা পর্যায়ে এখন কামিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করার ফলে আজ বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড হতে লেখাপড়া শেষ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবীসহ ইসলামী শিক্ষা চালু থাকায় এখানে বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষিত ছাত্ররা প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে শিক্ষালাভ করে তারা ইসলামের সঙ্গে সকল বিষয়ের সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হচ্ছে। কুরআনের তাফসীরসহ হাদীসের অনুবাদ এবং ইসলামী বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বইপুস্তক রচনা করেও তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হচ্ছে। এমনকি এ দেশে অনেক মহিলা মাদরাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত ছিল না। বঙ্গবন্ধুই প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে এর নাম রাখেন 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড'। যা ১৯৭৯ সালের জুন মাসে এসে আলোর মুখ দেখে। তিনি ইসলাম সমর্থিত ধর্ম নিরপেক্ষতাভিত্তিক ও সঠিক আকীদা ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেদিন মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন ও মাদরাসা শিক্ষকদের চাকুরির নিশ্চয়তা ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করেছিলেন। এর পাশাপাশি কওমী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার জমি বরাদ্দেরও ব্যবস্থা করেন।[৫]

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করার কারণে বাংলাদেশের মানুষ ইসলাম যে সাম্যের ধর্ম, মানবতার ধর্ম, সকলের অধিকার এ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত

---

৩ সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ২৬৫

৪ অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ইসলামী খিদমত, পিরোজপুর। সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৬

৫ সামীম মোহাম্মদ আফজাল সম্পাদিত ইসলাম ও বাংলাদেশ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন। পৃ. ৫৮

হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারছে। জাতির জনক যদি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন না করতেন তাহলে ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে কোন প্রকার ধর্মের জ্ঞান এদেশের মানুষ শিক্ষা লাভ করতে পারত এমনটি মনে হয় না। অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা এত অগ্রসর হতো না।

২. গণমুখী শিক্ষা

গণমুখী শিক্ষা বলতে সাধারণভাবে জনগণের জন্য জনগণের প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে বোঝায়। এর প্রধান লক্ষ্য, দেশের শিক্ষাদানযোগ্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ন্যূনতমপক্ষে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করা বা স্বাক্ষর করে তোলা এবং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।[৬]

আমাদের মহানবী (সা) বলেছেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ " .

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। অপাত্রে জ্ঞান দানকারী শূকরের গলায় মণিমুক্তা ও সোনার হার পরানো ব্যক্তির সমতুল্য।[৭]

মূলত এ হাদিসটিই গণশিক্ষার ভিত্তি। আর বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গণমানুষকে নীতিবান করে গড়ে তুলতে হলে গণশিক্ষা দিতে হবে নৈতিক ভিত্তিতে এ কথা বলাই বাহুল্য। তাইতো বঙ্গবন্ধু নৈতিক ভাব ধারা সম্পন্ন নানামুখী গণশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে গণশিক্ষার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি আমরা দেখতে পাই। এ সম্বন্ধে সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

ক)-একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য।

খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য।

গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"[৮]

---

৬ ড. এ কে আযাদ চৌধুরী, গণমুখী শিক্ষা ও বঙ্গবন্ধু, শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ, আগামী প্রকাশনী। পৃ. ১২০

৭ সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৮ : আলিমের মর্যাদা ও জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা। হাদিস : ২২৪

৮ সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, অনুচ্ছেদ ১৭

গণমুখী শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। সবার জন্য শিক্ষা ব্যতীত আমাদের উন্নতি-অগ্রগতির যে উপায় নেই তা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। শিক্ষা তার কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি একে 'উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ হিসেবে দেখেছেন।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সোনালী অতীতের মসজিদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার সাথে সঙ্গতি রেখে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯২ সালে মে মাসে এ প্রকল্প শুরু করে। ধর্মীয় ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ৮৬৪০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।[৯]

এ প্রকল্পের মাধ্যমে মসজিদের আশে-পাশের মহল্লার মেধাবী ও পিছিয়ে পড়া কোমলমতি শিশুরা একদিকে শিক্ষার সন্ধান পাচ্ছে অপরদিকে মুসলমান হিসেবে নিজেদের মূল পরিচয় ও অতীত ইসলামী ঐতিহ্যের কথা জানতে পারছে। তারা নামায, রোজা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুশাসনের বাস্তব প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়ে বড় হচ্ছে।[১০]

তাছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে পনেরোর্ধ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা হচ্ছে। এর পাশাপাশি তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা, পরিবার প্রথা, নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অসামাজিক ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হতে বিরত থাকার শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ১৬ লাখ ৪৮ হাজার ৮ শত ৩০ জন শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।[১১]

৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা, প্রচার প্রসার ও এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামগ্রিক জীবনকে ইসলামের কল্যাণময় স্রোতধারায় সঞ্জীবিত করার মহান লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ।[১২]

---

৯ মাওলানা মোঃ নুরুজ্জামান, ইসলাম ও জীবন, দৈনিক যুগান্তর, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

১০ অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু ও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, ইসলাম জঙ্গিবাদ এবং বঙ্গবন্ধু, ঢাকা। রূপ প্রকাশন ২০১৭। পৃষ্ঠা. ৮৮

১১ মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম সমীক্ষা, (ঢাকা : ইফা গবেষণা বিভাগ), পৃষ্ঠা. ১৬০

১২ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্পর্কে দু'ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৭৫ সনের ২২ মার্চ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী অধ্যাদেশটি সরকারিভাবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সনে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত "বাংলা পিডিয়ার" ১ম খণ্ডের ৪৪১ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে "১৯৭৫ সনের ২২ মার্চ বায়তুল মোকাররম- সোসাইটি এবং ইসলামিক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল মোকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমি নামক তৎকালীন দুটি সংস্থার বিলোপ সাধন করে এই ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। প্রথমোক্ত দুই সংস্থার সমুদয় দায়িত্ব এবং কর্মসূচী নব গঠিত ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত করা হয়।[১৩]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যাদেশ প্রণীত হয় বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত দিকনির্দেশনায়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধ্যাদেশে এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় :

(ক) এসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষাণাবেক্ষণ করা;

(খ) এসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট এবং সমাজ সেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেয়া;

(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা করা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(ঙ) ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলির সুলভ প্রকাশনা ও বিলিবণ্টনকে উৎসাহিত করা;

(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা;[১৪]

ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে ইসলামিক ফাইন্ডেশনের গৃহীত কর্মসূচি :

১. অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ প্রতিষ্ঠা

ইসলামী দাওয়াহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ কুরআনের তাফসীর, হাদীস ও ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে অন্য ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি অনুবাদ ও

একাডেমিকে একীভূত করে এক অধ্যাদেশ বলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট প্রণীত হয়।

১৩ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, পৃ. ১৯৬

১৪ সামীম মোহাম্মদ আফজাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

সংকলন করছে। এ পর্যন্ত এ বিভাগ থেকে তাফসীর, হাদীস ও সীরাত বিষয়ক দুশতাধিক পুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়েছে।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে সামনে রেখে দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম, বিজ্ঞানী ও শিক্ষক প্রমুখ কর্তৃক মৌলিকভাবে লিখিত অন্যভাষা থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী বাংলায় প্রকাশের লক্ষ্যে 'ইসলামী বিশ্বকোষ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে বাংলায় দুই খণ্ডে সমাপ্ত 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' এবং ২৭ খণ্ডে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতোমধ্যে বৃহত্তর বিশ্বকোষের ২৮টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া 'সীরাত বিশ্বকোষ' নামে ২২ খণ্ডে সমাপ্ত আরেকটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এতে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ), রাসূল (সা) ও সাহাবীগণের (রা) জীবনী স্থান পাবে। ইতোমধ্যে এর ৮টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

৩. ইসলামিক মিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সেবা ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালন, যেমন, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে হালাল জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বনে সহায়তা প্রদান, চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ, গরীব ও দুঃস্থদের সেবা প্রদান, গরীব ও সহায়-সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তোলা, মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেশের অত্যন্ত দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৯৮৩ সনে জুলাই মাস হতে ইসলামিক মিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ২৮টি জেলার ৫১টি মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপর্যুক্ত কর্মসূচীসমূহ বাস্তাবায়িত হচ্ছে।[১৫]

এই মিশনের আওতায় আরও দুটি কাজ শুরু হয়েছে :

ক. মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

খ. মুবাল্লিগ (প্রচারক) প্রশিক্ষণ : মসজিদ এবং দাহলীজ পরিচালিত মক্তব ফুরকানিয়া মাদরাসা এর শিক্ষকগণকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা পবিত্র কুরআন শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা, অংক, স্বাস্থ্যবিধি, পৌরনীতি ইত্যাদি সম্পর্কেও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাথমিক জ্ঞান দান করতে পারেন। সেই সাথে কৃষি, পশুপালন, পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি সম্বন্ধেও কিছু ধারণা জন্মাতে পারেন।[১৬]

---

১৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঢাকা, ইফাবা পৃ. ৩।

১৬ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা. পৃ. ২০০

৪. দ্বীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ পরিচালনা

ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার এবং ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও বিভিন্ন মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃত্বের স্মরণে এবং ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন, বায়তুল মোকাররম মসজিদের আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীর ও দরসে হাদীস এবং বিষয় ভিত্তিক ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন ও পরিচালনা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহার নামাজের ব্যবস্থাপনা, শবে কদর, শবে বরাত, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) প্রভৃতি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও পরিচালনা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কিরাআত ও হিফয প্রতিযোগিতার আয়োজন, ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা দ্বীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যতম কাজ। এ বিভাগ প্রতি বছর ৩০টি তাফসীর মাহফিল, ৬০টি মহিলা বিষয়ক ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অনুষ্ঠান ১২০টি ও মাসআলা মাসায়েল সংক্রান্ত ৯০টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়াও দুঃস্থ ও বিধবা মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। এখানে মহিলাদেরকে কুরআন শিক্ষাও প্রদান করা হয়। মহিলা শাখায় মহিলাদের জন্য একটি লাইব্রেরীও আছে।[১৭]

৫. মসজিদভিত্তিক ইসলামী পাগার স্থাপন

ইসলামের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় ও মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মসজিদভিত্তিক ইসলামী পাগার স্থাপন করছে। এ কার্যক্রম ১৯৯২ সনে শুরু হয় এবং বর্তমানে বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় মোট ৩৩৭০টি মসজিদে ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি মসজিদে ইসলামী পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা ফাউন্ডেশনের রয়েছে।

৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা

ইসলামি সাহিত্যের ওপর গবেষণাসহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এ লাইব্রেরীতে কুরআনুল কারীম, বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থসহ ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইসলামী সাহিত্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, ইতিহাস, আইন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর লক্ষ্যাধিক বই রয়েছে।[১৮]

---

১৭ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, পৃ. ৪

১৮ প্রাগুক্ত পৃ. ৪

তাছাড়া জনগণের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিকাশের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলাতেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৭. ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রদান

ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে এবং মুসলমানদের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়েছে। ইসলামের মৌলতত্ত্ব, সীরাত গ্রন্থ, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা, সৃজনশীল সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী গ্রন্থ, শিশু সাহিত্য, অনুবাদ, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, শিল্পকলা, ইসলাম প্রচার ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে প্রতি হিজরী সনে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৮. গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠা

ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা, গবেষণালব্ধ বিষয়াবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং গবেষণামূলক পুস্তকে বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রচারের ইতিহাস, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্ম, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ফাতাওয়া ও মাসাইল, আল-কুরআনে অর্থনীতি, আল-কুরআনে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কিত বিষয়ে ৫০টি মূল্যবান গ্রন্থ গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল নামে একটি গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকাও এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়।[১৯]

৯. ইসলামী প্রকাশনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা

ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক যেমন ইসলামের মৌলিক বিষয়, দর্শন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, আইন-বিচার প্রভৃতি বিষয়ের উপর মৌলিক গ্রন্থ ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ প্রকাশ করছে। ইসলামী বিষয়ের উপর যুগ চাহিদার আলোকে গবেষণার কাজে গবেষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করছে এবং তরুণ সমাজকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ম্যাগাজিন/পত্রিকা প্রকাশ করছে।

বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর প্রথম সভার পরপরই "কুরআন মঞ্জিল" নামক একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং "আরেফীন প্রেস" নামক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান থেকে মুদ্রিত কুরআনুল কারীমে এর ৩০ পারা ব্লকসহ যাবতীয় সম্পদ ইসলামিক ফাউন্ডেশনে দান করা হয়। "বোর্ড অব ট্রাস্টিজ" এর দুটি সভা অনুষ্ঠানের পর ১৯৭৫ সালে ১৫ আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শাহাদত বরণ করেন। ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নামক এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রচার ও প্রসারে তিনি যে সুদূর প্রসারী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তা তার জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারের আমলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে এবং আজ এ শাখা অফিস দেশের প্রতিটি বিভাগ এবং জেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বঙ্গবন্ধু সূচীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। এরপরও বাংলাদেশের জেলা সদর পর্যায়ে মোট ৪০টি কার্যালয় অস্থায়ীভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ ২৫ বছর অতিবাহিত হলেও এগুলোর স্থায়ী কার্যালয় করা হয়নি। এতদিন ইসলামের সরকার, নানান সরকার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিল। ২৫ বছর পর আবার বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত ৪৮টি অস্থায়ী শাখাকে স্থায়ী করেন। এজন্য প্রতিটি কার্যালয়ে শুকরানা নামাজ আদায় করে বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য দুআ মুনাজাত করা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মূলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অনন্য দূরদর্শিতা ও উদার মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন উল্লিখিত অধ্যাদেশে বিবৃত কর্মপরিকল্পনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধুর এ কর্মপরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন আজ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ণতা লাভ করে দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

৪. সিরাত মজলিস

জাতীয় পর্যায়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) পালন

عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، تَقْرَؤُونَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتِ: اقْرَأْ: {**قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ**} [المؤمنون: ١] قَالَ يَزِيدُ: فَقَرَأْتُ: {**قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ**} [المؤمنون: ١] إِلَى {**لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ**} [المؤمنون: ٥]، قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইয়াযীদ ইবনে ইয়াবানূস (র) থেকে বর্ণিত আমরা আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে মুমিন জননী! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কি ছিল? তিনি বলেন, কুরআনই ছিল তার চরিত্র। আপনার সূরা মুমিনূন পড়ে থাকেন। তিনি বলেন, পড়ুন "কাদ আফলাহাল মুমিনূন"। ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি পড়ালাম, "কাদ আফলাহাল মুমিনুন.... লিফুরূজিহিম হাফিযুন" পর্যন্ত (১-৫)। তিনি বলেন, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য (নাসাঈ, হাকিম)।[২০]

২০ আল আদাবুল মুফরাদ, অধ্যায়ঃ ৬, বদান্যতা, কৃপণতা ও চারিত্রিক দোষ ত্রুটি, হাদিস : ৩০৮

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম হাক্কানী আলেম ওলামাদের সংগঠিত করে পবিত্র ইসলামের সঠিক রূপ জনগণের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার দিক নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় 'সিরাত মজলিস' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়।[২১]

সিরাত মজলিস ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে রবিউল আউয়াল মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বৃহত্তর আঙ্গিকে পবিত্র ঈদে মিলদুন্নবী (সা)-এাহফিল উদযাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু বায়তুল মুকাররম মসজিদ চত্বরে মাহফিলের শুভ উদ্বোধন করেন। একজন সরকার প্রধান হিসেবে জাতীয়ভাবে পবিত্র ঈদে মিলদুন্নবী (সা)-এাহফিলের উদ্বোধন, উপমাহদেশের ইতিহাসে প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৯৭৪ সালে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিদেশে চিকিৎসাধীন থাকায় মিলাদুন্নবী (সা)-এাহফিলে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।[২২]

এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনে প্রতিবছর জাতীয়ভাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা)-এাহফিল উদযাপন হয়ে আসছে। ইসলামের ধর্মীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শব-ই-বরাত উপলক্ষ্যে সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন। উল্লিখিত দিনসমূহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।[২৩]

৫. মাতৃভাষা :

"ও আমার মাতৃভাষা বাংলাভাষা
খোদার সেরা দান
বিশ্বভাষার সবই তোমার
রূপ যে অনির্বাণ।"[২৪]

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বনবী (সা) বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم " بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আবদুল্লাহ ইবন 'আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র আয়াত হলেও তা (মানুষের নিকট)

২১ সৈয়দ আবির, ইসলামী মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু, ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ২০৮

২২ অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু ও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৮১

২৩ সামীম মোহাম্মদ আফজাল, ইসলাম প্রচার প্রসারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইফাবা, ২০১০, পৃ. ২৩

২৪ ফররুখ আহমদ, নির্বাচিত কবিতা, বাংলা একাডেমি, প্রকাশ- ২০১৬, পৃষ্ঠা. ৩৪

পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের বরাতে কথা (হাদীস) বর্ণনা করতে পার, এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা চাপিয়ে দেয়, সে যেন জাহান্নামে তার থাকার জায়গা নির্ধারণ করে নেয়।[২৫]

সুতরাং তাঁর বাণী জনসাধারণের মাঝে পৌঁছে দিতে চাইলে তাদের ভাষাতেই পৌঁছাতে হবে। যাতে তারা সহজেই বুঝতে পারবে। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢﴾

ইহা আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।[২৬]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾

ইহা দয়াময় পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ, আরবী ভাষায় কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।[২৭]

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যত নবী রাসূল পাঠিয়েছেন প্রত্যেককেই তার জাতির ভাষা শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤﴾

আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি। তাহাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২৮]

এ থেকে ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালা সূরা রূমের ২২ নাম্বার আয়াতে ভাষাকে তাঁর একটি নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলছেন,

---

২৫ তিরমিযী, জ্ঞান, বনী ইসরায়েল হতে কিছু বর্ণনা করা প্রসঙ্গে হাদিস : ২৬৬৯

২৬ সূরা ইউসুফ, আয়াত : ২

২৭ সূরা হামীম, আয়াত : ২-৩

২৮ সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৪

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ﴿۲۲﴾

আর তাহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে।[২৯]

সুতরাং প্রমাণিত হলো, এই দেশে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই এবং ছিলোনা। তাই বঙ্গবন্ধু মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং মাতৃভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

১৯৪৭ সালে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে তদানিন্তন ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাব উত্থাপন করেন, 'মাতৃভাষা হবে শিক্ষার বাহন এবং পূর্ববঙ্গের আইন আদালতের ভাষা হবে বাংলা।'

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার দাবিতে প্রথম সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট সফল করার জন্য পিকেটিং করা কালে সচিবালয়ের প্রথম গেইটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তির ফলে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য ছাত্রনেতাগণ ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, যেহেতু এ ৮ দফা চুক্তিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী স্বীকৃত হয়নি সেহেতু এ চুক্তি তিনি মানেন না। ১৬ মার্চ ৮ দফা চুক্তির বিরুদ্ধে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় তিনি এক সভা আহ্বান করেন। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তিনিই ছিলেন সেদিনের সভায় একমাত্র বক্তা। সভাপতির বক্তৃতাকালে তিনি ৮ দফার চুক্তিপত্র ছিড়ে ফেলে মিছিল সহকারে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ভবন ঘেরাও করেন এবং দাবী উত্থাপন করেন যে, "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে না পারলে গণপরিষদ থেকে পূর্ববঙ্গের সকল সদস্যকে পদত্যাগ করতে হবে। সেদিন ১৬ মার্চ এ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য ছাত্রনেতার উপর নির্যাতন চালায়।

২১ মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে তিন লক্ষাধিক লোকের এক বিশাল সমাবেশে এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবার কথা ঘোষণা করলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ সমাবেশেই এর তীব্র

২৯ সূরা রূম, আয়াত : ২২

প্রতিবাদ জানান। এখান থেকেই ভাষা আন্দোলন নতুন রূপ ধারণ করে। এর চরম বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ভাষার জন্য জীবন দেন শহীদ সালাম, বরকত, রফিকসহ নাম না জানা আরো অনেকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি হয়ে উঠে স্বাধীনতা আন্দোলনের মাইল ফলক।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকালে বঙ্গবন্ধু কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের নেতা জনাব গাজীউল হক, জনাব জিল্লুর রহমান, ডাঃ গোলাম মওলা এবং সামসুল হক চৌধুরীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং আন্দোলন সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। এ সময় তিনি রাজবন্দীদের মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে জেলে অনশন ধর্মঘট পালন করেছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট করা এবং মিছিল করে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। পাকিস্তানী স্বৈরশাসকদের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে বাঙালি জাতি যখন ক্ষত বিক্ষত তখনই বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[৩০]

৬. ও আই সি প্রতিষ্ঠা

১৯৬৯ সালে জেরুজালেমে অবস্থিত পবিত্র মসজিদুল আকসায় ইয়াহুদী কর্তৃক অগ্নিকাণ্ডের পর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ২৪টি মুসলিম দেশ মিলিত হয়ে ও.আই.সি প্রতিষ্ঠা করে। এর মূল উদ্দেশ্য হল মুসলিম ধর্মীয় স্থানসমূহ শত্রুকবল মুক্ত ও নিরাপদ রেখে ইসলামিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করা। ও.আই.সি'র যে ৪টি অঙ্গসংস্থা বিদ্যমান সেগুলি হল : রাষ্ট্র প্রধানদের সম্মেলন, পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন, সাধারণ সচিবালয় সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত। ও.আই.সি-এর সদর দপ্তর হল জেদ্দা (সৌদী আরব)। এর সদস্য সংখ্যা ৫৪।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও.আই.সি. সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ১৯৭৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্ব মুসলিমের নিকট বাংলাদেশের ইসলামী ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাংলা ও বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বিশ্ব উম্মাহর সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে ও.আই.সি. সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এমনকি ১৯৭১-এর পরাজিত সামরিক জান্তার প্রতিনিধি ভূট্টোর দেশেও যেতে দ্বিধাবোধ করেননি। তেমনি সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে এই মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে উক্ত সম্মেলনে যোগদানের মধ্যে দিয়েই বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর মাঝে বাংলাদেশের স্থান

---

৩০ অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু ও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৫, ৪৬

সমুন্নত করেন। এ কাজগুলো তিনি কাউকে খুশি কিংবা ব্যথিত করার জন্য করেননি। তার ঈমানী দায়িত্ব পালনার্থেই তিনি তা করেছিলেন।[৩১]

এভাবে ও আই সির সদস্য পদ প্রাপ্তির মাধ্যমে তিনি IIUC ও IIUM গঠনের দ্বার উন্মুক্ত করেন। যে IIUC এ দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ইসলামী সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পথ সহজ করে দিয়েছে।

৭. বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত প্রচার

মুসলমানদের ধর্মীয় মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর পবিত্র কালাম। যা ওহী দ্বারা তার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে অবতীর্ণ করেছেন। আল কুরআন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নুবুয়্যাত-রিসালাতের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ। কুরআন তিলাওয়াতে অধিক সওয়াব লাভ হয় যা পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ পাঠে হয় না। কুরআনের একটি হরফ উচ্চারণ করলে ১০টি সওয়াব পাওয়া যায়। এদিক বিবেচনা করে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার শাসনামলে তারই নির্দেশে সর্বপ্রথম বেতার ও টেলিভিশনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসীর প্রচার শুরু করার সুব্যবস্থা করেন। ফলে সকালের শুভ সূচনা হয় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে এবং ঠিক তেমনি কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের শেষ হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই এ ব্যবস্থা চালু হয়।[৩২]

৮. বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গিতে সরকারি জায়গা বরাদ্দ

তাবলীগ জামাত একটি অরাজনৈতিক ইসলামী সংগঠন। ইসলামের পথে দাওয়াত দেয়াই হচ্ছে এ সংগঠনের মূল কাজ। সংগঠনটি যাতে বাংলাদেশে অবাধে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এ উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গিতে সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন। প্রতি বছর বিভিন্ন দেশ থেকে দাওয়াতি কাজে সংশ্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ তাবলীগী ভাই এই জামাতে সমবেত হন। বঙ্গবন্ধু টঙ্গি বিশ্ব ইজতেমার এ স্থানটি বরাদ্দ করেছিলেন বলেই ইজতেমায় আগত লক্ষ লক্ষ মুসলিম এখানে সমবেত হয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে দাওয়াতি কাজ পরিচালনার জন্য বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন।[৩৩]

বাংলাদেশের তাবলীগ জামাতের মারকায বা কেন্দ্র নামে পরিচিত কাকরাইল মসজিদের সম্প্রসারণকল্পে রমনা পার্কের অনেক খানি জায়গার প্রয়োজন যখন দেখা দেয় তখন রাষ্ট্রপ্রধান

---

৩১ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ইসলামী খিদমত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৩২ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ইসলামী খিদমত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৩৩ সামীম মোহাম্মদ আফজাল সম্পাদিত ইসলাম ও বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দ্বিধায় সে জায়গা কাকরাইল মসজিদকে দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করে দেন।[৩৪]

একজন সরকার প্রধানের পক্ষে এতোটুকু ইসলামী অনুভূতি কম কথা নয়। কাকরাইল মসজিদের বর্তমান অবকাঠামো বা তার এরিয়া বঙ্গবন্ধুর ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি সজাগ মনোভাবের প্রতিফলনে দিক-নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

মূলত টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমায় এবং কাকরাইলের মারকাজে ইসলামি জ্ঞানের প্রচার প্রসার করা হয়। এ জায়গা দুটিতে ধর্মীয় জ্ঞানের আলোয় তাবলিগের সাথীদের আলোকিত করা হয়। আর এই জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে কেবল বঙ্গবন্ধুর কারণেই।

৯. পবিত্র হজ্জব্রত পালনের সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা

নামায, রোযা ও যাকাতের ন্যায় হজ্জ ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ। হজ্জ মানুষের প্রতি আল্লাহ পাক কর্তৃক ফরযকৃত একটি আর্থ-দৈহিক ইবাদত, যা সক্ষম ব্যক্তির উপর সারা জীবনে কেবল একবারই ফরয। যাকে আল্লাহপাক নিজ দেশ বা আবাস থেকে পবিত্র মক্কা নগরী পর্যন্ত যাওয়া ও ফিরে আসার মত সঙ্গতি দিয়েছেন এবং তার ব্যয় বহনের পর সে হজ্জ পালন করে ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম, তার উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব খুবই বেশি। সে কারণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়ে হজ্জ পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়।[৩৫]

৭১-৭৫ এই দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশকে সৌদি আরব স্বীকৃতি না দেওয়ায় বাংলাদেশীরা হজ্জ করতে যেতে পারছিলেন না। তখন বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে '৭৩ এর দিকে ইন্দিরা গান্ধি একটি অর্ডিন্যান্স পাস করেন, যেখানে বলা হয় বাংলাদেশীরা ভারত থেকে হজ্জযাত্রা করতে পারবে। কিছু মানুষ এভাবে হজ্জ পালন করেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদর্শন ছাড়াও অন্যান্য জটিলতায় এই ব্যবস্থা বেশ টেকসই হয়ে উঠেনি। ফলে বঙ্গবন্ধু সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অনেক কূটনৈতিক আলোচনা করেও সৌদি সরকারের নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় ১৯৭৩ এর ০৫ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে চতুর্থ ন্যাম সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু। বৈঠক চলাকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৌদির বাদশাহ ফয়সালের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সুযোগ পান।

সে বৈঠকের কথোপকথনের চুম্বকাংশ নিচে দেওয়া হল :

---

৩৪ মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্ম চিন্তা, অগ্রপথিক, জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা, (ঢাকা : ইফাবা-১৯৯৮), পৃ. ১২৮।

৩৫ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ইসলামী খিদমত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

বাদশা ফয়সাল : আমি শুনেছি যে, বাংলাদেশ আমাদের কাছে কিছু সাহায্য আশা করছে। আপনি আসলে কী ধরনের সাহায্য চাচ্ছেন? আর হ্যাঁ, যেকোন ধরনের সাহায্য দেওয়ার আগে আমাদের কিছু পূর্বশর্ত আছে।

বঙ্গবন্ধু : ইউর এক্সেলেন্সী। আশা করি আমার দুর্বিনীত ব্যবহার ক্ষমা করবেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমার মনে হয়না বাংলাদেশ ভিক্ষার জন্য আপনার কাছে হাত বাড়িয়েছে।

ফয়সাল : তাহলে আপনি সৌদি আরবের কাছে কি আশা করছেন?

বঙ্গবন্ধু : বাংলাদেশের পরহেজগার মুসলমানরা পবিত্র কাবায় গিয়ে ইবাদত পালনের অধিকার দাবী করছে। যদি ইবাদত পালনের জন্য আপনার কোন পূর্বশর্ত থেকে থাকে তাহলে আপনি তা বলতে পারেন। আপনি পবিত্র কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক। বাঙালী মুসলানদের কাছে আপনার স্থান অনেক উপরে। এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরই সেখানে ইবাদত করার অধিকার রয়েছে। সেখানে ইবাদত পালন করার কোন প্রকার শর্ত আরোপ করা কি ন্যায়সঙ্গত? আমরা সমঅধিকারের ভিত্তিতে আপনার সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই।

ফয়সাল : কিন্তু এটা তো কোন রাজনৈতিক আলোচনা হলো না। দয়া করে আমাকে বলুন আপনি সৌদি আরবের কাছে আসলেই কী আশা করছেন?

বঙ্গবন্ধু : ইউর এক্সেলেন্সী। আপনি জানেন যে, ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ দ্বিতীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। আমি জানতে চাই, কেন সৌদি আরব স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি?

ফয়সাল : আমি অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে জবাবদিহি করি না। তবু আপনাকে বলছি, সৌদি আরবের স্বীকৃতি পেতে হলে বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে "Islamic Republic of Bangladesh" করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু : এই শর্ত বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে না। বাংলাদেশের জনগণের অধিকাংশ মুসলিম হলেও, আমার প্রায় এক কোটি অমুসলিমও রয়েছে। সবাই একসাথে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে, ভোগান্তিতে পড়েছে। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্যই নন। তিনি বিশ্বজাহানের স্রষ্টা। ইউর এক্সেলেন্সী, ক্ষমা করবেন, তাছাড়া আপনার দেশের নামও তো "Islamic Republic of Saudi Arabia" নয়। বাদশাহ ইবনে সৌদের নামে নাম রাখা হয়েছে "Kingdom of Saudi Arabia"। আমরা কেউই এই নামে আপত্তি করিনি।

এ সময় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শেষ হয় আলোচনা। উঠে পড়েন বাদশাহ ফয়সাল। দুই নেতা বেরিয়ে যেতে থাকেন। যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেন সেই আয়াত, "লা-কুম দ্বীন-কুম ওয়াল-ইয়া দ্বীন"।[৩৬]

---

৩৬ মুজিবের রক্ত লাল, এম আর আখতার মুকুল; Who Killed Mujib, এ এল খতিব; টাইমস বিডি

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

তোমাদের পূর্বে নানারকম জীবনপদ্ধতি অতীত হয়েছে। অতএব, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখ অবিশ্বাসীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? [৩৭]

এই আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, সফরের মাধ্যমে ইলম অর্জিত হয়। এ কারণেই দেখা যায় বিশ্ব বিখ্যাত পরিব্রাজক মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল মোকাদ্দাসি তার দীর্ঘ বিশ বছরের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আলোকে ৯৮৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম' নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৮]

এছাড়া পবিত্র মক্কা ইসলামি জ্ঞানের মারকাজ এবং পবিত্র মদিনা ইসলামি জ্ঞানের শহর হিসেবে বঙ্গবন্ধু হজ্জের সফরে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করে হাজীদের ইসলামি জ্ঞান লাভ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, এ দেশে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে বঙ্গবন্ধুর যে অবদান তা অনস্বীকার্য। নানামুখী প্রকল্প হাতে নিয়ে তিনি এ দেশের সাধারণ মানুষদের ধর্মীয় ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। শুধু দেশের মাটিতেই নয়, বরং বিদেশেও IIUM গঠনের পেছনে পরোক্ষ ভূমিকা রেখে তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে গেছেন। সুতরাং তাঁর রেখে যাওয়া ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই বঙ্গবন্ধুর চেষ্টা স্বার্থক হবে।

---

৩৭ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৭

৩৮ Dr. Philip qurban, Lives of Muslim Stars, Charchil Publication, East London, 1993, p-321

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

আধুনিক বাংলা কাব্যে রাসূল (সা) প্রশস্তি : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান*

[Abstracts: Holy Prophet Muhammad (sm) is the best human in the world. He has widely been talked and commended in the different levels of world literature as he is the greatest sage in the world history. Human welfare, kindness, forgiveness, love, and goodness were his grand characteristics. His honesty and faithfulness were well acknowledged. Though his span of life is not so long in regard to count up, it is a rare paradigm in view of creating history. The best idealism for all humankind lies in his life and in his philosophy. For these reasons, he has blatantly and luminously been presented in the works of the litterateurs or in the poems of the poets. He has specifically been glorified and extolled extensively in the poems of the modern Bangla poetry. The glorification and praise of Muhammad (sm) in modern Bangla poetry have been explored in this article.]

ভূমিকা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বাংলা সাহিত্যের একটি আলোচিত বিষয়। বাংলা সাহিত্যের নানা পর্যায়ে মহানবী (সা) প্রসঙ্গ ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণের প্রাক্কালে বাঙালী মুসলিম কবি সাহিত্যিকরা নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে কাজ শুরু করেন। তারা বিষয় হিসেবে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হন। একই সাথে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন ও আদর্শভিত্তিক রচনার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেন। বাংলা সাহিত্যের নানা পর্যায়ে রাসূল (সা)-এর প্রশস্তিমূলক রচনা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মধ্যযুগের কবি সাহিত্যিকদের রচনায় যেমন মহানবী (সা) প্রসঙ্গ নানা আঙ্গিকে আলোচিত হয়েছিল, তেমনি আধুনিক যুগেও তা অব্যাহত থাকে। এ যুগে মহানবী (সা) প্রসঙ্গ আরো ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। তাঁর জীবনী, তাঁর আদর্শ ও তাঁর প্রশস্তিমূলক রচনা আধুনিক যুগের অন্যতম আলোচিত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৮০১ সাল হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ যুগের বাঙ্গালী কবি সাহিত্যিকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নানা আঙ্গিকে রাসূল (সা) প্রসঙ্গ একটি পরিপূর্ণ সাহিত্যকর্ম হিসেবে পূর্ণতা লাভ করে। বিশেষ করে বাংলা কাব্যে তাঁর প্রশস্তিমূলক রচনা আকাশচুম্বী উচ্চতায় আসীন হয়। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে মহানবী (সা) প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হলেও আধুনিক বাঙলা কাব্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিবরণ এসেছে জীবনী কাব্যে, না'ত বা প্রশস্তিমূলক কবিতায়, গজল-গানে, মৌলূদ ধরনের

* প্রাবন্ধিক : সহকারী অধ্যাপক, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

কবিতায় এবং গীতি কবিতার মাধ্যমে। আধুনিক কবিদের রচনায় অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁরা কখনো হযরত (সা)-এর জীবন ও আদর্শের মধ্যে মানবমুক্তির দিশা খুঁজেছেন আবার কখনো তাঁকে সত্য ন্যায়ের দিশারীরূপে তাঁর কাছে কল্যাণের পাথেয় কামনা করেছেন। নজরুলের 'মরুভাস্কর' কিংবা ফররুখ আহমদের 'সীরাজাম মুনীরা' অথবা আব্দুল কাদিরের 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' ইত্যাদি কাব্যে সে চেতনাগত পরিবর্তনের রূপ পরিলক্ষিত হয়। নজরুলের হাতে বাংলা কাব্যে রাসূল প্রশস্তি এক অনন্য উচ্চতায় উপনীত হয়। তাঁর রচিত কবিতা, গান, না'ত, গীতিকাব্য প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি নবী প্রশস্তির এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। এর প্রভাব তাঁর পরবর্তী কবিদের রচনায়ও পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা কাব্যে মহানবী (সা)-এর প্রশস্তি সম্পর্কে একটি পর্যালোচনামূলক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

রাসূল (সা) প্রশস্তির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

এক সমস্যা সঙ্কুল বিশ্ব পরিস্থিতে ইসলামের সুমাহন শান্তির বার্তা নিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পৃথিবীতে আগমন করলেন। তাঁর আগমনের সময়কালটি আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ হিসেবে পরিচিত ছিল।[১] সেই অন্ধকার যুগে তিনি এসে শান্তির বাণী প্রচার করলেন। তাঁর ওপর নাযিল হলো সর্বশেষ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআন। কুরআন এসেই সবাইকে শান্তির পথে উদ্বাত্ত আহ্বান করল। কুরআন ঘোষণা করল- "আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তিময় আবাসের দিকে আহ্বান করছে।"[২] অন্যত্রে ইরশাদ হচ্ছে- "তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা এসেছে এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব।"[৩]

আল কুরআনের শান্তির এ আহ্বানে তারা সাড়া দিয়ে আরবরা ধন্য হলো। অশান্তির অগ্নিগিরি হতে তারা বের হয়ে আসল। কুরআন তাদের সে ইতিহাসের কথা স্মরণ করে দিয়ে বলছে- "হে আরবরা! তোমরা জাহান্নামের আগুনের নিকটে ছিলে। মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে (ইসলামের মাধ্যমে) মুক্তি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে।"[৪]

আল কুরআনে মহানবী (সা)-এর সুকীর্তি ও গুণাবলির উচ্ছসিত প্রশংসা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে: "হে নবী! নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।[৫] আরো বলা হয়েছে : "নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"[৬]

কবিদের দেশে কুরআন নাযিল হল। সে কুরআনে রাসূলের প্রশস্তি বর্ণনা করা হলো। আবার সেখানে সৎ ও বিশ্বাসী কবিদেরও প্রশংসা করা হলো।[৭] কুরআনের এসব চমৎকারিত্ব

---

১. মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস,* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৩।

২. আল কুরআন, সূরা ইউনুস : ২৫।

৩. আল কুরআন, সূরা মায়েদা : ১৫।

৪. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান: ১০৩।

৫. আল কুরআন, সূরা কলম : ০৪।

৬. আল কুরআন, সূরা আহ্যাব : ১৪।

দেখে কবিরা অভিভূত হয়ে গেলো। তারাও রাসূল (সা)-এর প্রশস্তিতে মেতে উঠলেন। আরব জাহানের বিখ্যাত কবি কা'ব বিন যুহায়র (রা) [মৃ. ২৪ হি.] সমকালীন যুগের একজন তারকা কবি এবং অভিজাত পরিবারের সন্তান। তাঁর পুরো পরিবারই ছিল কবিতে ভরপুর। তার ভাই বোন ফুফুসহ অনেক সদস্যই ছিলেন কবি। ইসলামের আগমনের খবরে এ অভিজাত পরিবার অন্যান্য কিছু অভিজাতদের মতোই নাখোশ হন এবং কবিতার মাধ্যমে প্রাণপণে ইসলাম ও তার নবীর বিরোধীতায় লিপ্ত হন। এদিকে আসমানী কিতাবের আলোতে আরব মরুভূমির অন্ধকার হৃদয়গুলো ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠছে। এ আলোর রৌশনীতে যুহায়র পরিবারের অন্ধকারও দূরীভূত হয়ে আলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রথমে যুহায়রের ভাই বুযাইর ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং যুহায়রকেও আলোর পথে আসার আহ্বান জানালেন। এক পর্যায়ে যুহায়রও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে আলোকিত হলেন। তিনি মহানবী (সা)-কে উপলক্ষ্য করে 'বানাত সুআদ' নামক এক কালজয়ী কবিতা রচনা করেন। সেই কবিতায় তিনি আল্লাহর রাসূলের মহানত্ব ও মহানুভবতাকে অসাধরণ শৈল্পিকরূপে তুলে ধরেন। আচমকা একদিন সে কবিতা নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখপানে হাজির হন এবং অতীব প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁকে আবৃত্তি করে শুনান। কবি যুহায়র তার কবিতায় বলেন :

নিশ্চয় রাসূল উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা, তাঁর দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়।
তিনি আল্লাহর ধারালো তরবারী সমূহের মধ্যে একটি কোষমুক্ত তরবারী।
আমি অবহিত হয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ আমাকে ভীতির সংবাদ দিয়েছেন,
কিন্তু রাসূলুল্লাহর নিকট ক্ষমা আশা করা যায়।
অপেক্ষা করুন, যে আল্লাহ আপনাকে হেদায়াতপূর্ণ কুরআন দিয়েছেন,
তিনি আপনাকে হেদায়াতের কাজে সাফল্য দান করুন।[৮]

তাঁর এ কবিতা শুনে মহানবী (সা) অভিভূত হয়ে যান এবং যুহায়রকে তাঁর গায়ে জড়ানো চাদরটা খুলে উপহার দেন। রাসূল (সা)-এর এ বদন্যতায় কবি যুহায়রও খুব খুশী হন এবং এরপর থেকে তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান করে জীবনপাত করেন।

আরেক বিখ্যাত কবি হাসসান বিন সাবিত (মৃ. ৫৪ হি) ইসলাম গ্রহণ করে নিজের কবি সত্ত্বাকে দ্বীনের পথে উৎসর্গ করলেন। তিনি রাসূলের প্রতি কুৎসা রটনাকারীদেরকে কবিতার মাধ্যমে জবাব দিলেন। তখনকার সময়ে নবী (সা)-এর প্রবল বিরোধীতাকারী আবু সুফিয়ান রাসূল (সা)-কে কবিতার মাধ্যমে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত, নানাভাবে বুদ্ধিভিত্তিক আক্রমণ করত।

---

৭. আল কুরআন, সূরা আশ শুয়ারা : ২২৪-২২৭।

৮. কা'ব বিন যুহায়র কর্তৃক রচিত 'কসিদায় বুরদাহ'এর ৫২-৫৩ পংক্তি। আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৫৩।

এর প্রেক্ষিতে হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে কবিতার মাধ্যমে আবু সুফিয়ানের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। তিনি বলেন-

কেউ কি আমার পক্ষ হতে আবূ সুফিয়ানকে জানিয়ে দিবে যে,
তার গুমর আমাদের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে।
আমাদের তরবারি তাকে করেছে পুরোপুরি দাস
তাই আবদুদ দ্বার গোত্রের নেতৃত্বভার নারীদের উপর পড়েছে।
তুমি মুহাম্মদের নিন্দা করেছ আর আমি তার জবাব দিয়েছি,
আর আমার এ কাজের প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর কাছে।[৯]

তাঁর এ ভূমিকা রাসূল (সা) খুবই প্রীত হন এবং তাঁকে বলেন, হে হাসসান, আল্লাহর কাছে তোমার এ কর্মের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত। এভাবে হাসসান বিন সাবিত তাঁর কবিত্ব শক্তিকে ইসলামের পথে ব্যয় করেন। রাসূল (সা) তাঁকে 'শায়েরুর রাসূল' (রাসূলের কবি) উপাধিতে ভূষিত করেন।[১০]

এভাবে আরবদের বড় বড় কবিরা রাসূল (সা)-এর প্রশস্তি গেয়ে রাসূল প্রশস্তির ধারা সৃষ্টি করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকালের অল্পকাল পরেই বিশ্বের দিকে দিকে ইসলামের শান্তির বাণী প্রচারিত হতে থাকে। সেই সাথে কবিরাও নিমগ্ন হয়ে গেলেন রাসূল প্রশস্তির নবধারা সৃষ্টিতে।

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর (খ্রি) বঙ্গ বিজয়ের[১১] মাধ্যমে এ দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়। যদিও এর পূর্বে অনেক বনিক সূফি সাধক ও দ্বীন প্রচারকের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেই থেকে বাঙলা ভাষাভাষিদের মধ্যে রাসূল প্রশস্তি শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যের নানা যুগ ও বিভাগে পুঁথি, মর্সিয়া, না'ত ইত্যাদির মাধ্যমে নবী জীবনীর চর্চা হয়।[১২] বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে (১২০০-১৮০০ খ্রি) রাসূল প্রশস্তি আরো একধাপ এগিয়ে যায়। এ যুগের শাহ মুহাম্মদ সগির (১৩৩৯-১৪০৯ খ্রি), সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খ্রি.আনু:), জৈনুদ্দীন (১৩৭১-১৪৮১ খ্রি), শেখ চাঁদ (১৫৫০-১৬২৫ খ্রি), মহাকবি আলাওল (১৫৯৭-১৬৭৩ খ্রি), দৌলত উজির বাহরাম খাঁন, শেখ ফয়জুল্লাহ, ফকির গরিবুল্লাহ, কবি আব্দুল হাকীম (১৬২০-১৬৯০ খ্রি) আনু:), কবি হেয়াত

৯. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫৭।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

১১. তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার বঙ্গদেশের তৎকালীন সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে ১২০৪ সালে বঙ্গ বিজয় করেন। ১২০৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১২. মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ, *বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৪২-৪৩।

মামুদ (১৬৮০-১৭৬০ খ্রি) প্রমুখ কবিগণ এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন।[১৩] আরো অনেক কবি সাহিত্যিক তাদের পুঁথি সাহিত্যে ইসলামী সঙ্গীত তথা গজল, কবিতা, হামদ-নাত লেখার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। কেবল পুঁথি সাহিত্য নয়, লোক-সাহিত্যেও বাউল ও ফকীরদের গানে সুফি ভাবমূলক, মুর্শিদী, মারফতি, জারি এবং পালা গান, হামদ-না'তে রাসূল প্রশস্তির দৃষ্টান্ত মেলে। এভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রাসূল প্রশস্তির একটা ধারা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে আধুনিক যুগের কবিদের হাতে এসে বাংলা কাব্যে রাসূল প্রশস্তি এক অনন্য উচ্চতায় উপনীত হয়।

আধুনিক বাংলা কাব্যে রাসূল প্রশস্তির স্বরূপ ও বিকাশ ধারা

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য এবং মুসলমানদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে নবী প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্যে নবী প্রসঙ্গ এসেছে ধর্মীয় আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাতে। এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম এবং ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের পর মুসলমানের যে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক-সংকট দেখা দেয়, তার ফলে ইসলামের ধর্মীয় পবিত্রতা সংরক্ষণের দিকে বিশেষভাবে নজর পড়ে এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এসময়ের সাহিত্যে একদিকে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব থেকে রক্ষা, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে আত্মমুক্তির আকুলতা, এই দুই-এর প্রেক্ষাপটে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য অনুধাবনের চেষ্টা হয়েছে এবং তা সেকালে আন্দোলনের চরিত্র লাভ করেছে। ওহাবী আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন ও বালাকোটের যুদ্ধ ইত্যাদির সঙ্গে ইসলামের ধর্মীয় আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমনকি পাকিস্তান-আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ইসলামের ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির প্রেরণা কার্যকর ছিল। ওহাবী-আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সংস্কারমূলক ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামকে তার আদি-পবিত্রতায় বিকশিত করা। এ লক্ষ্য থেকেই ইসলামের ধর্মীয় আচরণগত দিকের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাংলা কবিতায় সব আন্দোলনের ছায়াপাত ঘটেছে এবং সে প্রসঙ্গেই হযরত মুহাম্মদ (সা) নানাভাবে কীর্তিত হয়েছেন। বাংলা কাব্যে হযরত মুহাম্মদ (সা)-যেমন ধর্মীয় মহিমা নিয়ে সমুপস্থিত, তেমনি তিনি উল্লিখিত হয়েছেন ইতিহাসের নায়করূপে।

তবে আখ্যান-কাব্যগুলোতে মোটামোটি মধ্যযুগের রচনারীতি বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন-

"মধ্যযুগের আখ্যান-কাব্য রচনার ধারা একাল পর্যন্ত প্রলম্বিত, যদিও চিন্তাধারা ও রচনারীতিতে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্যযোগ্য, তবুও জীবনী কাব্য রচনায় একালেও সর্বত্র আধুনিক মানের প্রতিফলন ঘটেনি। আধুনিক কালে হযরত মুহম্মদ (সা)-এর জীবন-কাহিনী ভিত্তিক যে

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

কয়টি আখ্যান-কাব্য রচিত হয়েছে, তাতে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার অনুসরণ লক্ষণীয় না হলেও জীবনীবিন্যাস এবং কাহিনীর সূত্র রক্ষায় মধ্যযুগীয় ধারা অনুসৃত হয়েছে বলা যেতে পারে"।[১৪]

এ যুগের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- মোহাম্মদ সাদেক (১৮৩৮-১৯২২ খ্রি), মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১ খ্রি), শেখ জুমন উদ্দীন (জ. ১৯৩৭ খ্রি) কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২ খ্রি), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১ খ্রি), শেখ ফজলল করিম (১৮৬২-১৯৩৩ খ্রি)-মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৯৩ খ্রি), কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খ্রি), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪ খ্রি), আ ন ম বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬ খ্রি) প্রমুখ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহানবী (সা) বিষয়ক কাব্য রচনায় তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। রচনারীতি ও শিল্পমানে প্রত্যেকের সৃষ্টিকর্ম সমান না হলেও সার্বিকভাবে বলা যায়, এসব রচনা বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল কীর্তি। তাঁদের কাব্য সাধনার ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্যে মহানবী (সা)-এর জীবনী ও তাঁর প্রশস্তি একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিম্নে এ যুগের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবির রচিত রাসূল (সা) বিষয়ক কাব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

মোহাম্মদ সাদেক আলী

মোহাম্মদ সাদেক আলী (১৮০১-১৮৬২ খ্রি) সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার অধিবাসী। তিনি মুন্সি সাদেক আলী নামে পরিচিত। তার রচিত রাসূল বিষয়ক কাব্য 'হালতুন্নবী' (১৮৬০ খ্রি) এ ধারার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কাব্যখানি সিলেটি নাগরী হরফে লিখিত। পরে তা বাংলায় অক্ষান্তরিত করেন মোহাম্মদ ইউসুফ। এই বাংলা সংস্করণটি ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে সিলেট থেকে জনৈক আপ্তাব (আফতাব) মিয়া কর্তৃক মুদ্রিত হয়। এটি ডান থেকে বাঁ দিকে দোভাষী পুঁথির ধরনের লেখা। মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতানের 'নবী বংশ' কাব্যের অনুসরণে 'হালতুন্নবী' রচিত। প্রথমে কুরছির বয়ান, তারপর মহানবীর নামের বয়ান, চৌদ্দ ভুবনের পয়দাইশ ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে।

মুন্সি সাদেক আলী হযরত (সা)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর পরিচয় ও মর্যাদার বিবরণ দিয়েছেন। যেমন- তিনি বলেছেন, সকল পয়গম্বরের যত কামালিয়াত ছিল তার সবই পেয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বদৌলতে। তাঁর কোনো কামালিয়াত বা পূর্ণতা বাকি ছিল না। তাঁর জন্যই এ মহাজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। মহান আল্লাহর নিকট রাসূল (সা)-এর সম্মান অপরিসীম। তিনি পরকালে পাপীদের মুক্ত করতে কাজ করবেন ইত্যাদি। হযরত (সা)-এর জন্ম প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

শিকম হনে নবী জবে নামিলা ভূমিতে ॥
বেহেস্তের হুরপরি লইলা হাতে হাতে *

১৪. *বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬ ।

ফিরিশতা সকল আইলা কাতারে কাতারে ॥
নবী দেখি দরূদ লাগিলা পড়িবার *[১৫]

মহানবী (সা)-এর জীবনের প্রথম দিকে দুধ মা হালিমার কাছে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

দিনেতে বাড়িতা নবী মাশ বরাবর ॥
হালিমা করিত বড় নবীরে আদর *
দুই মাশ উমর আশি পুরিল জখন ॥
মাটিতে রাখিআ হাত চলিল তখন *
তিন মাশে হযরত খাড়া হইলা পাত্র ॥
হাটিআ ফিরিতা জবে চারিমাশ জাএ *
পাঁচ মাশ উমরেতে মনে জথা চাএ ॥[১৬]

এভাবে তিনি মহানবী (সা)-এর নবুয়ত লাভ, পবিত্র মক্কা হতে মদীনায় হিযরত, পরবর্তী জীবনকাল ইত্যাদি বিষয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সহজ সরল ভাষায় তাঁর পুঁথি সম্ভার রচিত হওয়ায় সর্ব সাধারণের কাছে তা জনপ্রিয় ছিল।

মীর মশাররফ হোসেন

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১ খ্রি) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান কবি ও সাহিত্যিক। ঐতিহাসিক কারবালা কাহিনী নিয়ে তার রচিত উপন্যাস 'বিষাদসিন্ধু' (১৮৮৫-১৮৯১ খ্রি) আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যের অমর সৃষ্টি। সাহিত্যসেবী, গবেষক ও সুধীমহল প্রায় প্রত্যেকেই তার এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সমালোচকরা গ্রন্থখানিকে 'গদ্য মহাকাব্য' বলে অভিহিত করেছেন। এখানে সরাসরি না হলেও তিনি পরোক্ষভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রসঙ্গ এসেছে। যদিও গ্রন্থটির ইতিহাস নির্ভরতা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন রয়েছে। কাব্যাঙ্গনেও মীর মশাররফ হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কবিতায় তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা ও জাতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন কামনা করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলামের ইতিহাস ও মুসলিম জীবনকে কেন্দ্র করেই তা আবির্ভূত হয়েছে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত গদ্যে পদ্যে রচিত মৌলুদ শরীফ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য রচনা। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী বর্ণনা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হওয়ায় সমকালীন সময়ে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে রচিত এ কবিতায় হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছেন। বিশিষ্ট গবেষক ও মীর মশাররফ হোসেনের জীবনীকার মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল বলেছেন- 'মীর

১৫. মুন্সি সাদেক আলী, *কেতাব হালতুন্নবী*, ঢাকা: নাগরী গ্রন্থ সম্ভার (ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০১৪ খ্রি.). পৃ. ১১-১২।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

মশাররফ হোসেনের জীবদ্দশায় এ পুস্তিকাটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত মৌলুদ শরীফ খুবই জনপ্রিয় কাব্য। এর কবিতাসমূহ মিলাদ মাহফিলের শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করা হয়।' তাঁর অন্যান্য কাব্যগুলোতেও বিষয়বস্তু হিসেবে হযরত (সা)-এর জীবন ও আদর্শকে গ্রহণ করেছেন। যথা : *'এসলামের জয়*, *বিবি খোদেজার বিবাহ*, *হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ*, *হযরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ*, *হযরত বেলালের জীবনী ও উপদেশমালা*, *মদীনার গৌরব*, *মোসলেম বীরত্ব'* প্রভৃতি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি।

মশাররফ হোসেন রচিত বাংলা ভাষার দরূদে তার ধর্মপ্রবণ মনের পরিচয় মেলে:

তুমি হে এছলাম রবি
হাবিবুল্লাহ শেষ নবী
নতশির তোমায় সেবি,
মোহাম্মদ এয়া রাছুলুল্লাহ।
তুমি সত্য উদ্ধারিলে
মহাতত্ত্ব প্রকাশিলে,
প্রভু-বাণী শুনাইলে,
মোহাম্মদ এয়া রাছুলুল্লাহ।[১৭]

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭ খ্রি) মুসলমানদের দুঃসময়ের কাণ্ডারী হিসেবে পরিচিত। সমাকালীন সময়ে খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ইসলাম ধর্মের প্রচারক হিসেবে কাজ করাই ছিল মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ কারণে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি খ্রিষ্টান মিশনারিদের ইসলাম ও মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা ও অসত্য অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এ লক্ষ্যে তিনি কলকাতার 'ইসলাম প্রচারক', 'সুধাকর' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লেখা-লেখি করতেন। এসময়ে তিনি এ প্রসঙ্গে একাধিকবার খ্রিষ্টান পাদ্রীদের সাথে সরাসরি বিতর্কে অবতীর্ণ হন।[১৮] তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, *খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা* (১৮৮৭ খ্রি), *মেহেরুল এসলাম* (১৮৯৭ খ্রি) এবং *'মুসলমান ও খ্রীষ্টান তর্কযুদ্ধ'* (১৯০৮ খ্রি) ইত্যাদি। তাঁর রচনার চরিত্র সংস্কারকামী। সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যেই তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বক্তৃতামালা হচ্ছে, রদ্দে খ্রিষ্টান, দলিলে ইসলাম,

---

১৭. মনির উদ্দিন আহম্মদ, *মীর মোশাররফ হোসেন মৌলূদ শরীফ* (টাঙ্গাইল: মনির উদ্দীন আহমদ, ১৯০০ খ্রি.)। মাহফুজুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

১৮. *বাংলা পিডিয়া*, প্রাগুক্ত, ১১তম খণ্ড, পৃ. ৩৭০।

খ্রিষ্টান, মুসলমান তর্কযুদ্ধ, ইসলামী রচনা প্রভৃতি।[১৯] তিনি বাংলা আসামের বিভিন্ন স্থানে জলসা ও সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে মুসলমানদের মাঝে প্রেরণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। মুন্‌শী মেহেরুল্ল-াহর রচনায়ও নবী-প্রশস্তির সন্ধান মেলে। গাও রে মোসলেমগণ নবীগুণ গাও রে/পরাণ ভরিয়া সবে সালে-আলা গাও, তাঁর রচিত এ না'ত খুবই জনপ্রিয় হয় এবং এখনো দেশের অনেক অঞ্চলে গীত হয়। তাঁর রচিত 'গাও রে মোসলেমগণ নবীগুণ গাও'-এর কয়েকটি লাইন :

গাও রে মোসলেমগণ, নবীগুণ গাও রে
পরাণ ভরিয়া সবে সাল্লে-আলা গাও রে।
আপনা কালামে, নবীর সালামে, তাকিদ করেন বারী।
কালেবেতে জান, কহিতে জবান, যে তক্ থাকে গো জারি।
যে বেশে যে বাষে, যে দেশেতে যাও রে।
গাও গাও সবে সাল্লে-আলা গাও রে।[২০]

শেখ ফজলুল করিম

শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬ খ্রি) বাংলা সাহিত্যের একজন কীর্তিমান কবি। তিনি রাসূল (সা)-এর জীবনী নিয়ে 'পরিত্রাণ' কাব্য রচনা করেন। কাব্য রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন- 'চিরারাধ্য হযরত মোহাম্মদের সাত্ত্বিক জীবনের কাহিনী, ইসলামের জন্য অসাধারণ আত্মত্যাগ,কবি তুলিকায় চিত্রিত করিবার আশায় পরিত্রাণ কাব্যের সৃষ্টি।'[২১] পরিত্রাণ কাব্যটি জাতীয় আখ্যান কাব্যের ধারাকে অনুসরণ করে রচিত। ২০টি স্বর্গে বিভক্ত এ কাব্যের প্রত্যেক সর্গে ঘটনা, কাল ও স্থানের নির্দেশনা রয়েছে। এ কাব্যে তিনি রাসূল (সা) জীবন পঞ্জি ও সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতিকে সার্থকভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এতে লেখকের ধর্মবোধ স্বদেশপ্রেম, স্বাজাতিপ্রীতি কিছু উগ্ররূপেই প্রকাশিত হয়েছে। স্বর্গবিভাগ, যুদ্ধ বর্ণনা, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং মাইকেল প্রবর্তিত কিছু শব্দ ব্যবহার করে যে বিশেষ ধরনের কাব্য রচনার প্রচেষ্টা ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু কবিগণ করেছিলেন, অত্যন্ত সচেতনভাবে লেখক তাকে অনুসরণ করেছেন। কবির মৌলিকত্ব হচ্ছে ইসলাম ধর্ম এবং উক্ত ধর্মের প্রবর্তকের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। ফলত পরিত্রাণ কাব্য যতটা না কবি মানসের পরিচায়ক তার চাইতে বেশি হচ্ছে ভক্ত মনের আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ।

পরিত্রাণ কবিতার কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

---

১৯. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬০।

২০. মুনসী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, *মেহেরুল এসলাম* (কলকাতা: শাহেনশাহ অ্যান্ড কোং, ১৮৯৭ খ্রি.)। *বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০।

২১. শেখ ফজলল করিম, *পরিত্রাণ* (যশোর: মুনশী মেহেরুল্লাহ, ১৯০৩/১৩১০), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

নিদাঘ শর্ব্বরী অন্ত, স্নিগ্ধ সমীরণ-
চম্বিয়া লতিকা বক্ষে বহে ধীরি ধীরি,
শান্তোজ্জ্বাল পূর্বাশা ভাতিল পূরবে
নাশিতে বিশ্বের তম, -হাসিলে প্রকৃতি
আনন্দে দোলায়ে শির, নিকুঞ্জ বল্লরী
সে উৎসবে মাতিলেক যেন এ ধারায়।[২২]

মোজাম্মেল হক

মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৯৩ খ্রি) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান কবি। তিনি শান্তিপুরের কবি হিসেবে পরিচিত। গদ্য-পদ্য উভয় শ্রেণিতে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'হযরত মহাম্মদ'(১৩১০ বঙ্গাব্দ) কাব্য গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। হযরত মুহাম্মদ কাব্য তিনি হযরত (সা)-এর আংশিক জীবনীর বিবরণ দিয়েছেন। এখানে হযরত আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে। কাব্যটি সাধু ভাষায় রচিত। কাব্য কৌশল এবং কাব্যসৌকর্যের প্রতি কবির বিশেষ অনুরাগ লক্ষ করা যায়। এ কাব্যে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রি) প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। উক্ত কাব্যে মঙ্গলাচরণ রচনা, রাসূল (সা)-কে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করা, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-কে দেবী সম্বোধন করা এবং তাঁর রূপ বর্ণনায় রতির সঙ্গে তুলনা করা প্রভৃতি বিষয় ইসলামী আদর্শ ও চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী। এসব কারণে বর্ণিত ঘটনার অনেক বিষয় মানোত্তীর্ণ নয় বলে বিশেষজ্ঞমহল মত প্রকাশ করেছেন।[২৩] মোজাম্মেল হকের 'হযরত মুহাম্মদ' কাব্যই বস্তুত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়ে প্রথম জীবনীমূলক কাব্য। মোজাম্মেল হক কাহিনী-বিন্যাসে পুঁথি-কাব্যের অনুসরণ করলেও ভাষা ব্যবহারে 'দোভাষী' পুঁথির অনুসরণ করেননি। এক্ষেত্রে তিনি মধ্যযুগের মুসলিম কবি জৈনুদ্দিন, মুহম্মদ সগীর, আলাওল, সৈয়দ সুলতান প্রমুখের রাসূলের জীবনীমূলক কাব্য ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। আলোচ্য কাব্যে তিনি রাসূল (সা)-কে অতিমানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা না করে পরিপূর্ণ একজন মানুষ হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।[২৪]

মোজাম্মেল হকের 'হযরত মুহাম্মদ কবিতার কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

নয়মাস পূর্ণ হয় বিভুর প্রসাদে।
মধুর বসন্তকাল আছিল তখন,

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

২৩. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: ১৯৬৪), পৃ ২৭৫।

২৪. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৫৯।

সুখদ সমীর বহে মৃদুল হিল্লোলে,
বিতরিয়া শীতলতা, ভীষণ মরুর
উগ্রভাগ নাশি আর, বিহঙ্গম দলে
আলাপী কোমল কণ্ঠে গীত মধুময়
আনন্দে করে মক্কাবাসীগণে।[২৫]

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১ খ্রি) বাংলায় মুসলিম জাগরণের জাতীয় কবি। উনবিংশ শতকে তিনি জাতীয় জাগরণমূলক কাব্য লিখেই নবজাগরণে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর অনল প্রবাহ, উচ্ছ্বাস, উদ্বোধন, স্পেন বিজয় কাব্য, প্রভৃতি এ জাতীয় রচনা। মুসলিম গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের আহবান ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কাব্যসমূহে। এসব কাব্যে নানা প্রসঙ্গে মহানবী (সা)-এর বিষয়ে বর্ণনা এসেছে। তাঁর উদ্বোধন কাব্যের 'বিলাপ' কবিতাটি সরাসরি মহানবী (সা)-কে উদ্দেশ্য করে রচিত। তাঁর 'উচ্ছ্বাস' কাব্যগ্রন্থের পটভূমিও মূলত হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়েই রচিত হয়েছে। মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের ফলে একদা বিশ্ব অন্ধকার বিদূরিত হয়ে আলোকোজ্জ্বল হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম জাতি গৌরবময় সে ইতিহাস ভুলে আবার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাদের সামনে সে গৌরবোজ্জ্বল দিন আর নেই। তবু কবি হতাশ হতে চান না, আশার আলোও ছাড়েননি তিনি। তাঁর বিশ্বাস আবার মুসলমানেরা ঘুরে দাঁড়াবে এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত হবে। এসব হচ্ছে তাঁর কবিতার মূল প্রতিপাদ্য। হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি নিবেদিত সংস্কৃত শব্দে মিশ্রিত কবি শিরাজীর না'তের একটি চরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

'জয় মোহাম্মদ নবী বরম্
সুরাসুর বন্দিত পুণ্যকরম্ !
বালভানু বিনীন্দিত কান্তিধরম্
জগজন অজ্ঞান ভ্রান্তিহরম!
শশিখণ্ড বিখণ্ডিত ভালতটম্
প্রে ভাস প্রপূরিত নেত্রপটম্ ![২৬]

তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'অনল প্রবাহে' হযরত (সা)-কে লক্ষ্য করে তিনি বলেন-

আরবের প্রান্তে উদ্ভূত হইয়া,
ইস্লাম - রশ্মিতে প্রদীপ্ত হইয়া,

২৫. মোজাম্মেল হক, *হযরত মহাম্মদ* (শান্তিপুর: মহম্মদীয়া লাইব্রেরী, ১৯০৩ খ্রি.), পৃ. ১৩৬-১৩৭।

২৬. আবদুল কাদির সম্পাদিত *শিরাজী রচনাবলী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩৬৩-৩৬৪।

পঞ্চাশৎ বর্ষে অবনী দলিয়া ,
ইস্লাম মহিমা করিলে বিস্তার।
অগণন শত্রু নিধন করিয়া,
বিজয় নিশান গগণে তুলিয়া,
'আল্লাহু আকবর' ঘন উচ্চরিয়া,
পাপ তাপ রাশি করিলে সংহার।[২৭]

মোহাম্মদ দাদ আলী

মোহাম্মদ দাদ আলী (১৮৫৬-১৯২৭ খ্রি) বাংলা ভাষায় হযরত মুহাম্মদ (সা) বিষয়ক কাব্য রচনার অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি 'আশেক রসূল' নামে দুই খণ্ড কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রথম খণ্ডে ৩৬টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩টি কবিতা রয়েছে। মহানবী (সা)-এর জীবনী নিয়ে রচিত হলেও কবিতাগুলো হয়ে উঠেছে কবির আপন মনের দুঃখ বেদনার মর্মবাণী। কবি ছিলেন আধ্যাত্মিক চেতনায় উজ্জীবিত। তাঁর কবিতায় প্রতিটি ছত্রেই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর 'লা ইলাহা ইল্লালা' এবং 'মোহাম্মদুর রাসুলুল্লা' কবিতাদ্বয় আল্লাহ এবং রাসূল প্রেমের অমিয় সুধায় ভরপুর। কাব্য রচনার পেছনে কবির উদ্দেশ্য ছিল বিপথগামী মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করা। আশেকে রসূল কাব্যের প্রথম খণ্ডে ৬টি গযল রয়েছে, যা মিলাদ মাহফিলে পরিবেশিত হতো। কবির প্রেমানুভূতি মধ্যযুগীয় সুফী কবিদের স্বগোত্রীয়। কবি বলেছেন মৃত্যুর পর কবরের গহীন অন্ধকারে রাসূল (সা) ব্যতীত আর কারো সাহায্য ও সাক্ষাত পাওয়া যাবে না। কেবল তাঁরই সুপারিশে মুক্তি পাওয়া যাবে। 'আশেক রসূল' সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য বিশারদ মুহাম্মদ এনামুল হক বলেছেন- 'কাব্যখানি বাংলা নাতিয়া শ্রেণীর কবিতা ও গীতি সমষ্টি। ইহা এক সময় বাংলার ঘরে ঘরে গীত হইত।'[২৮]

মুনশী খয়রাতুল্লাহ

মুনশী খয়রাতুল্লাহ (১৮৪২-১৯৩৬ খ্রি) রচিত 'তারিফে রসুল' কাব্য মৌলূদ ধরনের রচনা। ইতঃপূর্বে প্রথম মীর মশাররফ হোসেনের মৌলূদ শরীফ রচিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভাষা, বর্ণনায় খয়রাতুল্লাহর রচনা মীর মশাররফ হোসেনের চেয়ে উন্নতমানের। মুনশী খয়রাতুল্লাহর রচনা সম্পর্কে অধ্যাপক আবূ তালিব বলেন, 'একজন প্রকৃত কবির হাতে পড়লে ধর্মতত্ত্বও কেমন কবিত্বপূর্ণ ও সরল হতে পারে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে তার নমুনা প্রচুর।'[২৯]

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭-৪৫৮।

২৮. মুহাম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা : ১৯৬৫ খ্রি.) পৃ. ৩০৯।

২৯. মুহাম্মদ আবূ তালিব, *উপেক্ষিত সাহিত্য সাধক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ ১১-১২।

কবি রওশন ইয়াজদানী

রওশন ইয়াজদানী (১৯১৭-১৯৭৬ খ্রি) একজন বিশিষ্ট কবি, লোকসাহিত্য গবেষক ও সংগ্রাহক। তিনি মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য ও পূর্ব পাকিস্তানের লোকসাহিত্য এ দুটি মৌলিক গবেষণার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর রচিত 'খাতামুন নবীঈন' বাংলা সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমর্ধী রচনা। বিশাল পরিসরে ব্যপ্ত কবিতা গ্রন্থটি প্রায় চারশত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। এ কাব্যের প্রতিটি পরতে অলঙ্কারিত্বের ছাপ বিদ্যমান, অপরদিকে ভাষা ব্যবহার, শব্দ চয়ন ও উপমা প্রয়োগ প্রভৃতি বিবেচনা সার্থক লোকসাহিত্য হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়। ১৩৫৯-১৩৬০ সাল পর্যন্ত প্রায় দু'বছর যাবৎ 'খাতামুন নবীঈন' প্রথম মাসিক মোহাম্মদীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে তা গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। গ্রামীণ জন মানুষের সুবিধার্থে তিনি পল্লী ভাষায় মহানবী (সা)-এর জীবনী রচনার উদ্যোগ নেন। সে সম্পর্কে কবি নিজেই বলেন -

'সমাজ আমাদের শিক্ষিত শতকরা পঁচাশিজন অশিক্ষিত... শিক্ষিত পনের জনেরও সকলে সুধী সাহিত্যের রসাস্বাদ গ্রহণের অধিকারী নন। অশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত সমাজ তাই রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র জীবন-কথা জানার কোনো সুযোগ পায় না। কিন্তু তাদের জ্ঞান-লিপ্সা কম নয়। অবসর বিনোদনের জন্য তাহারা এখনও এক স্বতন্ত্র সাহিত্য চর্চা করে। ... এই সমাজের সামনে পরিবেশন করার নিয়েই আমি রচনা করেছি সহজ সাবলীল মাটির সুরে মাটির মানুষের মুখের ভাষা নিয়ে খাতামুন নবীঈন।'[৩০]

এ জন্য কবি গ্রাম বাংলার সমাজজীবন ও পরিবেশ প্রকৃতি থেকে উপমারাজি আহরণ করে সহজ ও সাবলীল ভাষায় তা তুলে ধরেছেন। কবি মহানবী (সা)-এর পুণ্যময় জীবনধারাকে সাধারণের জন্য তুলে ধরতে গিয়ে কোন অতিমানবিক ব্যাপার বা অতিপ্রকৃতিক ঘটনার অবতারণা করেননি। তিনি সত্য ও ইতিহাসনির্ভর তথ্য দিয়ে 'খাতামুন নবীঈন' কে পরিস্ফুটিত করেছেন। এরপরও কবি মনের গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধা নিবেদনে একটুও কমতি হয়নি।

ফররুখ আহমদ

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪ খ্রি) বাংলা সাহিত্যের ইসলামী ভাবধারার একজন বিশিষ্ট শক্তিমান কবি। তাঁকে মুসলিম রেনেসাঁর কবি নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৩১] তাঁর কবিতায় মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণের সুর ধ্বনিত হয়েছে। ফররুখ আহমদ এই বিশ্বাসে দৃঢ়মূল ছিলেন যে, বিশ্বজনীন মানবধর্ম ইসলামই 'মানবমুক্তির' সনদ এবং ইসলামী আদর্শের যথার্থ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ সম্ভব। ইসলামী ভাবধারার কবি হলেও তাঁর কবিতায় আধুনিকতার সকল উপদান বিদ্যমান। মহানবী (সা)

---

৩০. রওশন ইজদানী, *খাতামুন নবীঈন* (ঢাকা: ১৯৬০ খ্রি.), আরজ (ভূমিকা) পৃ. ৯।

৩১. আফজাল চৌধুরী, *ঐতিহ্য চিন্তা ও রসুল প্রশস্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯-৩০।

বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'সীরাজাম মুনীরা' এক অসাধারণ সুকীর্তি।[৩২] এটি একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য কবিতা যেখানে কবি মহানবী (সা)-এর পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও তাঁর অন্যান্য কবিতা যেমন সিন্দাবাদ, সাত সাগরের মাঝি, পাঞ্জেরী, নৌফেল ও হাতেম প্রভৃতি কবিতায় বিভিন্ন উপলক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে হযরত (সা)-এর প্রসঙ্গ এসেছে। কবি তাঁর রচনায় মহানবী (সা)-কে অতি প্রাকৃতরূপে চিত্রায়িত না করে আল্লাহর নবী ও মানব মুক্তির দিশারী হিসেবে তুলে ধরেছেন।

এখানে সীরাজাম মুনীরা কাব্যের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :

মহানবী (সা)-এর আগমন প্রসঙ্গে কবি বলেন-

ঐ আসে আসে সেই বিহঙ্গ সাতরঙা তার শ্বেত পাখায়,
আকাশের বুক ঘন হ'য়ে ওঠে নীল বরকত স্বচ্ছতায়,
সোনালী আলোয় শ্বপাদ রাত্রি আহত, লুপ্ত নিমেষ মাঝে;
স্থির-বিদ্যুৎ- আভা তরঙ্গ আলোকের সুর আকাশে বাজে।
হে অচেনা পাখি কোন্ আকাশের গভীরতা হ'তে এসেছ উঠি?
তোমার পক্ষ- সঞ্চারে ভাষা-ভাবের কুসুম উঠিছে ফুটি[৩৩]

মহানবী (সা)-এর হেরাগুহায় অবস্থান ও নবুয়ত লাভ প্রসঙ্গে কবি বলেন-

তারপর এল হেরা গুহার তিমির পাথরে ধ্যানের দিন
পরম সত্য খুঁজিবার তরী ভাসে সে স্রোতে সাথীবিহীন,
মরু মক্কার চোখের মনি সে সত্য দীপ্ত আল আমিন
হেরার গুহায় মোকাবা-লীন খোঁজে সে সত্য প্রেম-রঙিন।[৩৪]

আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে মহানবী (সা)-যে যুলুম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

মানব মুক্তি পণ নিয়ে তুমি ওঠো দুর্গম শিলা শিখরে,
প্রতি পাথরের প্রাকার পারাতে আহত তোমার রুধির ঝরে,
হে বীর! সেখানে পাথরের মত অটল তোমার পদক্ষেপ,
শিলা পার হ'য়ে পীড়িতের বুকে ঝর্ণাধারার দাও প্রলেপ।[৩৫]

---

৩২. ড. সুনীল কুমার মখোপধ্যায়, *কবি ফররুখ আহমদ* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৮৫-৮৭।

৩৩. ফররুখ আহমদ, *সিন্দাবাদ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৯ খ্রি.), [সিরাজাম মুনীরা]। পৃ. ১০৭ ।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

মহানবী (সা) বিশ্ব মানবতার জয় ঘোষণা করেছেন, আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ও সম্পন্ন হয়েছে। এখন তাঁর পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। কবির ভাষায়-

মানুষের হাতের সকল পাথেয় দিয়ে কামালৎ-সম্ভাবনা
সব কাজ শেষে মরু আফতাব হ'লে কি এবার অন্যমনা?
পরম প্রিয়ের ডাক এল নাকি? আকাশ মহলা সাত তলায়
ওপার থেকে সে মহাকারিগর ডাক দিল নাকি হে নূরনবী?
মরুর আকাশ রোশ্‌নিতে ভরি' এবার কোথায় জাগ্‌বে রবি?
এখানে তোমার নিশীথারণা? কোথায় তোমার ফুটছে যুঁই?
সে কোন স্বর্ণ চামেলী বনের আভায় এ মাটি হলো বিভুঁই?
ফিরদৌসের কোন গুলশানে 'সী' বিহঙ্গ উঠলো ডেকে
চ'লে গেলে তুমি ও-মাটির ফুলমৃত্তিকা তনু ধুলায় রেখে,
যেথায় সুন্দর গোলাপী পাপড়ি অক্ষয় রসে নিত্য লাল
চ'লে গেলে সেথা রেখে তারি ছায়া মুক্তি পথের আল্-হেলাল।[৩৬]

মূলত কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে যে মরু ঝড়ের উত্তাপ ছড়িয়ে ছিলেন ফররুখ আহমদ স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও স্বকীয়তা দিয়ে সে ঝড় মোকাবিলা করে নতুন এক রূপকল্প উপহার দিয়েছিলেন। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন-

'সিরাজাম মুনীরা কাব্যগ্রন্থে বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং শব্দচয়নের দিক থেকে নজরুল ইসলামের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও কবি ধর্ম, কাব্যরীতি ও ইতিহাস-চেতনার দিক থেকে তিনি স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। ইসলামের মহান খলীফা ও সাধক-সংগ্রামীদের জীবন-মাহাত্ম্য ও আদর্শ নিয়ে রচিত হলেও এ গ্রন্থের কবিতায় ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্যবোধের সমুজ্জ্বল দিকটি রূপ লাভ করেছে উপভোগ্য কবি-রূপকার কবি প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এ কারণে তার মন্ময় (অবজেকটিভ) কবিতাও তন্ময় সৃষ্টি শীলতার স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থে এমন একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে, যা একজন শিল্পীর জীবনানুভূতির নির্যাস দিয়ে পড়া। বিশুদ্ধ অনুভূতির সঙ্গে জীবনাদর্শ ও ঐতিহ্যবোধের সুখ-সম্মিলনের মধ্য দিয়ে তিনি তার সৌন্দর্যরূপের অভিব্যক্তির চেয়েও জীবনাদর্শের রূপায়ণের দিকে অধিক ঝুঁকেছেন। এই ঝোঁক থেকেই তিনি দেশীয় এবং জাতীয় ঐতিহ্যের রূপায়ণ-প্রয়াসে নিবিষ্ট হয়েছেন। ঐতিহ্যবোধের পটভূমিকায় তার কবিতায় সমকালীন যুগ-সংকটের দ্বান্দ্বিক রূপও প্রতিফলিত হয়েছে।'[৩৭]

তাঁর প্রতিটি কবিতার ওজস্বিতা, স্বকীয়তা ও এর আবেদন অনন্য ও অসাধারণ। যুগযুগান্তরে এর আবেদন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর শব্দানুশীলন, বাক্য বিন্যাস ও ভাষা ব্যবহারের

---

৩৬. প্রাগুক্ত, [সিরাজাম মুনীরা] পৃ. ১১৭ ।

৩৭. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, *বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

রীতিতে ইসলামের অতীত যুগের চিত্র ও আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। এ যুগে মুসলিম জীবন ও মানসের আদর্শ বিচ্যুতির জন্যে কবি বেদনাবোধ করেন।

সংস্কারকামী মনের আশ্চর্য প্রতিফলন রয়েছে তার শব্দ-চয়ন-কুশলতায়। যেমন:

তবু ভাঙলো কি, ঘুম ভাঙলো কি, ঘুম ভাঙলো এ অন্ধদের?
আজ বিস্মৃতি তোলে যে আড়াল তোমার দিনের এই দিনের।
এখানে যে ম্লান কদর্যতার ছবি আর ক্ষুধা যায় কি সেথা,
গড়ায় বিপুল অজগর তার লেলিহান ক্ষুধা, বিপুল ব্যথা,
আকাশে আকাশে তারই বিষাক্ত প্রশ্বাসে হেরি মূর্ছাতুর
আলো বিহঙ্গ ভোলে হে সূর্য তোমার শেখানো পথের সুর।[৩৮]

ইসলামের চিরন্তন ও বিশ্বজনীন মানবতাবাদী আদর্শ এবং শান্তি ও সাম্যের বাণীবাহক মানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশ্বাসী এবং আশাবাদী কবি ফররুখ আহমদ। যা হোক, কবি ফররুখ আহমদের নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমেই তিনি বাংলা সাহিত্যের কাব্যাকাশে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। ইসলামী আদর্শ এবং মুসলিম ঐতিহ্যের আদর্শ নিষ্ঠা ও মূল্যবোধ অবিচল এবং অনাহত মহিমায় স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। কবি হিসেবেও তিনি যেমন বিশিষ্টতা ও খ্যাতি অর্জন করেছেন তেমনি ইসলামের ইতিহাস-চেতনা ও মুসলিম জীবনাদর্শমূলক সাহিত্যের ঐতিহ্য প্রীতির জন্যও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

গোলাম মোস্তফা

কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খ্রি) মুসলিম জাতীয় জাগরণের অন্যতম মুসলিম কবি। মুসলিম বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিসীম। কবিতা রচনার পাশাপাশি আরবী ও উর্দু হতে বহু গ্রন্থ অনুবাদ করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। মৌলিক গ্রন্থ রচনায় তাঁর ভূমিকা প্রসংশনীয়। মহানবী (সা) বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিশ্বনবী' একটি অমর সৃষ্টি। গ্রন্থটি গদ্যরূপে রচিত হলেও এর গ্রন্থনা ও রূপায়ণ ছন্দময় কবিতার ন্যায় আকর্ষণীয়। এ গ্রন্থে কবি নবী ভক্ত প্রেমিক হৃদয়ের যে পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। গ্রন্থটির ইতিহাস নির্ভরতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও সাধারণ পাঠকের মাঝে এর জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। কবি পরবর্তীতে কুরআনের বর্ণিত ঘটনাবলির আলোকে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'বনী আদম' নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন যা বাংলা সাহিত্যেও অক্ষয় কীর্তি হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর রচিত ইসলামী গান, গজল কিয়ামবাণী প্রভৃতি হযরত (সা)-এর স্মরণে রচিত। সুর ছন্দ ও কাব্যের আঙ্গিকে ভক্ত হৃদয়ের পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে কবি গোলাম মোস্তফার রচনা অসাধারণ। তাঁর বেশ কিছু গান মরমী শিল্পী আব্বাস

৩৮. ফররুখ আহমদ, *সিন্দাবাদ*, প্রাগুক্ত, [সিরাজাম মুনীরা] পৃ. ১০৯।

উদ্দীনের কণ্ঠে রেকর্ড হয়ে ছিল বলে জানা যায়। নজরুলের পূর্বসূরি গোলাম মোস্তফার 'মানুষ' শীর্ষক কবিতাটিতেও সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার এই প্রচলিত ধারার অনুসরণ লক্ষণীয়। গোলাম মোস্তফা অবশ্য কবিতাটির শেষাংশে নতুন অর্থ আরোপের চেষ্টা করেছেন। তার 'বনী আদম' শীর্ষক কাব্য-কাহিনীতেও একই ধারার অনুসৃত হয়েছে। যেমন কবি বলেন :

অন্তরীক্ষে থাকি'
কহিলেন খোদা সব ফেরেশতার ডাকি
শোন ফেরেশতারা, আমি দুনিয়ার পরে
অপূর্ব নূতন এক জীব-সৃষ্টি তরে
করেছি মানস। 'আদম' তাহার নাম,
তারি মধ্য দিয়া আমি মোর মনস্কাম
পূর্ণ করে নিতে চাই। সে হবে আমার
একমাত্র প্রতিনিধি, দেহ হবে তার
দুনিয়ার মৃত্তিকায়, আত্মা হবে নূর
আমারি জ্যোতিতে তার চিত্ত ভরপুর
হয়ে রবে নিশিদিন। নিখিল সৃষ্টির
সার সৃষ্টি হবে সেই।

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি) আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ। ইসলামী সাহিত্যে ও মুসলিম ঐতিহ্যের তিনি প্রধান রূপকার। তাঁর হাত ধরে মুসলিম বাংলা সাহিত্য একটি পরিপূর্ণ সাহিত্যভাণ্ডারে পরিণত হয়। কবিতা, সঙ্গীত, গল্প, নাটক, নাত, গজল ও অনুবাদসহ সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি যে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তার তুলনা বিরল। সাহিত্য সমালোচকরা তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাকে বিংশ শতাব্দীর সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছেন। পুঁথি সাহিত্য প্রভাবিত মুসলিম বাংলা কবিতাকে তিনি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে প্রাণ সঞ্চার করেন। বাংলা সাহিত্যে মহানবী (সা) বিষয়ক রচনায় কাজী নজরল ইসলাম একজন সার্থক কবি, যিনি কাব্যের মাধ্যমে নবী (সা)-এর জীবনী চর্চাকে আকাশচুম্বী উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টি কর্ম তাঁকে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ ও দিশারীর ভূমিকায় উপনীত করেছে। ১৯২০ সালের দিকে কাব্য জগতে প্রবেশকালীন সময়ে তিনি 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' নামক বিখ্যাত কবিতা লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। কবি নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণার' অন্তর্ভুক্ত রূপকল্পে রচিত 'খেয়াপারের তরণী' এক অসাধারণ সৃষ্টি।

বিশিষ্ট গবেষক ও কবি আফজাল চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন-

'১৯২০ সালে তাঁর 'খেয়াপারের তরুণী' ও 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' কবিতা-দুটি প্রকাশিত হতেই নবী বিষয়ক কবিতার সাফল্য হয়ে ওঠে যুগান্তকারী। এতকালের কিংবদন্তী আখ্যান কথা, দোয়া দরূদ, মৌলূদ শরীফ অধ্যুষিত বাংলা সাহিত্য নবী চর্চার এক হীরক দিগন্ত মোচন হলো যেন। কী শব্দচয়ন, কী রূপকর্ম, দক্ষতার এক অনিন্দ ভুবনে ভক্ত হৃদয়ের সৌম্যস্তোত্র বিরচনে এই শতকের তৃতীয় দশকে এক উজ্জ্বল উৎক্রান্তি দান করলেন এই কবি।'[৩৯] কাব্যে মহানবী (সা)-এর জীবনী রচনা ছিল কবি নজরুল ইসলামের একটি দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে তিনি শুরু করেছিলেন 'মরুভাস্কর' নামে একটি কাব্য রচনার মাধ্যমে। তিনি শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। তবে যেটুকু করেছেন তাও এক অসাধারণ কালজয়ী রচনা। হযরত (সা)-এর নবুওয়ত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪০]

মরুভাস্কর' কাব্যটি মোট চারটি পর্বে ১৮টি পরিচ্ছেদে রচিত হয়েছে। পরিচ্ছেদগুলো হচ্ছে- ১. অবতরণিকা, ২. অনাগত, ৩ অভ্যুদয়, ৪. স্বপ্ন, ৫. আলো-আঁধার, ৬. দাদা, ৭. পরাভূত, দ্বিতীয় সর্গ, ৮. শৈশব-লীলা, ৯. প্রত্যাবর্তন, ১০, 'শাককুস সাদর' (বক্ষ বিদারণ), ১১. সর্বহারা, তৃতীয় সর্গ, ১২. কৈশোর, ১৩. সত্যাগ্রহী, চতুর্থ সর্গ, ১৪. শাদী মোবারক, ১৫. খাদিজা, ১৬. সম্প্রদান, ১৭. নওকাবা, ১৮. সাম্যবাদী। নিম্নে মরুভাস্কর কাব্যটির কিছু চরণ তুলে ধরা হলো :

কাব্যটি অবতরণিকা দিয়ে শুরু। কবিতার শুরুতে জেগে উঠার আহ্বান জানিয়ে কবি বলেন-

জেগে উঠ্ তুই রে ভোরের পাখী
নিশি - প্রভাতের কবি!
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া
উদিল আরব-রবি।
ওরে ওঠ্ তুই নূতন করিয়া
বেঁধে তোল্ তোর বীণ্!
ঘন আঁধারের মিনারে ফুকারে
আজান মুয়াজ্জিন।
কাঁপিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে
গ্রহ, রবি, শশী, ব্যোম,

৩৯. আফজল চৌধুরী, *ঐতিহ্য চিন্তা ও রাসুল প্রশস্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৪০. কাজী নজরুল ইসলাম, *মরু-ভাস্কর* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১২ খ্রি.), পৃ.৭।

ঐ শোন্ শোন্ সালাতের ধ্বনি
'খায়রুম্ মিনান্নৌম!'[৪১]

মহানবী (সা)-এর আগমনের পূর্বে সমকালীন অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে 'অভ্যুদয়' পর্বে কবি বলেন-

আঁধার কেন গো ঘনতম হয় উদয়-ঊষার আগে?
পাতা ঝরে যায় কাননে, যখন ফাগুনে-আবেশ লাগে
তরু ও লতার তনুতে তনুতে, কেন কে বলিতে পারে?
সুর বাঁধিবার আগে কেন গুণী ব্যথা হানে বীণা-তারে?
টানিয়া টানিয়া না বাঁধিলে তারে ছিঁড়িয়া যাবার মত
ফোটে না কি বাণী, না করিলে তারে সদা অঙ্গুলি ক্ষত?
সূর্য ওঠার যবে দেরী নাই, বিহগরা প্রায় জাগে,
তখন কি চোখে অধিক করিয়া তন্দ্রার ঝিম লাগে?
কেন গো কে জানে, নতুন চন্দ্র উদয়ের আগে হেন
আমবস্যার আঁধার ঘনায়, গ্রাসিবে বিশ্ব যেন! [৪২]

মহানবী (সা)-এর আগমনে সেদিন পৃথিবী সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে উঠেছিল সে বর্ণনা তুলে ধরেন 'স্বপ্ন' পর্বে।

মহানবী (সা)-কে স্বাগত জানিয়ে কবি বলেন :

সেদিন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সুখে হাসিল বিশ্বত্রাতা,
'সুয়োরানী হল আজিকে যেন রে বসুমতি 'দুয়ো' মাতা।
'মারহাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল্ আরবি!'
গাহিতে নান্দী গো যাঁর নিঃস্ব হল বিশ্ব - কবি।[৪৩]

নজরুলের না'তে রাসূল (সা)

কবি নজরুল ইসলাম ইসলামী সাহিত্যে ও মুসলিম ঐতিহ্যের তিনি প্রধান রূপকার। তাঁর হাত ধরে মুসলিম বাংলা সাহিত্য একটি পরিপূর্ণ সাহিত্য ভাণ্ডারে পরিণত হয়। কবিতা, সঙ্গীত, গল্প, নাটক, না'ত, গজল ও অনুবাদসহ সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি যে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তার তুলনা বিরল। তিনি বাংলা সাহিত্যে না'তে রাসূলের একটা স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করেন। ১৯৩১ সালে তাঁর রচিত প্রথম না'ত-'দেখে যা রে দুলা সাজ সেজেছেন মোদের

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

নবী এবং ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর' মাসিক জয়তীর কার্তিক ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিশিষ্ট কবি ও নজরুল গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ কবি নজরুল ইসলামের রচিত ৯১টি না'তের তালিকা দিয়েছেন।[৪৪] কবির রচিত না'তের উল্লেখযোগ্য অংশ পরবর্তী জুলফিকার (১৯৩২ খ্রি), গুল-বাগিচা (১৯৩৩ খ্রি)ও বনগীতি (১৯৩২ খ্রি) প্রভৃতি গীতিগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। দোভাষী-পুঁথি কাব্যের অনুসরণে বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামই আরবী-ফারসি শব্দ-ব্যবহার রীতি সুপ্রচলিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তার অজস্র গান ও কবিতায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রশস্তি রূপ পেয়েছে। নজরুলর 'সাহারাতে ফুটল রে ফুল রঙিন গুলে লালা' ইসলামের ঐ সওদা লয়ে, তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে, সৈয়দে মক্কী মদনী, কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও মদীনায়, তৌহিদের মুর্শিদ আমার মুহম্মাদের নাম, ইত্যাদি গান-গজল এবং ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম আবির্ভাব ও তিরোধান প্রভৃতি কবিতা বাঙালি পাঠকদের চিত্তে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। নজরুল ইসলাম নবী-প্রশস্তিমূলক গজল গান রচনার মাধ্যমে বাংলা কাব্যে একটি নতুন ধারার সূচনা করেছেন। পরবর্তী কবিদের ইসলাম সম্পর্কিত এবং নবী-প্রশস্তিমূলক রচনায় এ ধারার প্রভাব অপরিসীম। কবি ফররুখ আহমদ, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ আলী আশরাফ, আশরাফ সিদ্দিকী, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আল মুজাহিদী প্রমুখের নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ফারসি সাহিত্য যেমন নবী প্রশস্তি কবি হাফিজ, সাদী, জামী, রুমীর কণ্ঠে ধ্বনীত হয়ে উচ্চতার বিপুলায়তনে পৌঁছেছিল তেমনি বাংলা সাহিত্যেও নজরুল এবং তাঁর উত্তরসূরিদের হাতে মহানবী (সা)-এর প্রশস্তিমূলক কবিতা, না'ত, গজল, গান প্রভৃতি এক অসাধারণ কৃতিত্বের জীবন্ত ইতিহাস হয়ে আছে। নজরুল ছিলেন বিদ্রোহী কবি, জাগরণের কবি, সাম্য-মৈত্রী ও মানবতার কবি। তিনি তাঁর ইসলমী কবিতাগুলোর মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে বিশ্বের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা হিসেবে তুলে ধরেছেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রশস্তি গাইতে গিয়ে তাঁর মহত্ত্ব ও ব্যপ্তি প্রকাশে কাজী নজরুল ইসলাম ব্যবহার করেছেন প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ। কখনো আসমান, বাতাস, চাঁদ, জ্যোৎস্না কখনো ফুল, ফল, পাখি আবার কখনো ঝরনা, নদী, সাগর, পাহাড়, সাহারা মরুভূমি। পাখির বর্ণনায় সুরের পাখির প্রাধান্য যেমন বুলবুলি, দোয়েল, চকোর, কোকিল এসব পাখি তাদের সুমিষ্ট কণ্ঠের সুরে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর গুণগান বর্ণনা করেছে। গোলাপ ফুলের অনুষঙ্গ সৌন্দর্য সুবাসের কারণে উঠে এসেছে বারবার। খোরমা, খেজুর, বাদাম, জাফরান ফল অর্থাৎ আরব দেশের প্রচলিত ফল নবীর উপস্থিতির জানান দিয়েছে। নজরুলের চেতনায় সাহারা মরুভূমিতে গুলিস্তানের আবাদ হয়েছে নবীজীর আবির্ভাবে। সাহারার ধূলিপথের ওপর দিয়ে যখন সে মহাপুরুষের পদচারণা হতো সে খবর বুলবুলি তাঁর সুরে সুরে পৌঁছে দিত সাহারায়। হযরত মুহাম্মদ (সা) সাহারাতে ফোটা সেই 'রঙিন গুলে লালা'। যে ফুলের খুশবুতে

৪৪. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *কালজ কালোত্তর* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৪২।

সূর্য আকাশ, বাতাস, সাগর, নদী, তারকাসহ সমগ্র প্রকৃতি আচ্ছন্ন, কাজী নজরুল ইসলামের মায়াবী বর্ণনায় রাসূল (সা)-এর আবির্ভাব ও তাঁর পবিত্র উপস্থিতি প্রকৃতির রূপকল্পে উঠে এসছে। যা নিঃসন্দেহে বিচিত্র, বর্ণিল, প্রাণময় আন্তরিক সৌন্দর্যে ভরপুর। স্বীকার না করে উপায় নেই 'নাত-এ-রাসূলগুলো তার অধ্যাত্মচিন্তা প্রকাশের পাশাপাশি উঁচুমানের সাহিত্যেরও প্রকাশ।

তাঁর জনপ্রিয় কিছু না'তে রাসূলের প্রথম কয়েকটি লাইন এখানে উপস্থাপন করা হলো :

- তৌহিদের মুর্শিদ আমার মোহাম্মাদের নাম।
  ঐ নাম জপলেই বুঝতে পারে খোদায়ী কালাম-
  মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।।
- মরু সাহারা আজি মাতোয়ার- হলেন নাজেল
  তাহার দেশে খোদার রসুল।
  যাঁহার নামে যাঁহার ধ্যানে সারা দুনিয়া
  দিওয়ানা, প্রেমে মশগুল।।
- মদিনার শাহান শাহ কোহ-ই-তুরবিহারী
  মোহাম্মদ মোস্তফা নবুয়ত ধারী।।
- আজি আল কোরায়েশী প্রিয় নবী এলেন ধরাধাম
  তাঁর কদম মোবারকে লাখো হাজারো সালাম।
- উম্মত আমি গুনাহগার তবু ভয় নেই রে আমার
  আহমদ আমার নবী যিনি খোদ হাবিব খোদার।
- খোদার রহম চাহ যদি নবীজীরে ধর
  নবীজীরে মুর্শিদ কর নবীর কলমা পড়।।
- লহ সালাম লহ দ্বীনের বাদশাহ জয় আখেরি নবী
  পীড়িত জনগণে মুক্তি দিতে এলে হে নবীকুলের রবি।।
- ওগো আমিনা তোমার দুলালে আনিয়া আমি ভয়ে ভয়ে মরি
  এ নহে মানুষ বুঝি ফেরেশতা আসিয়াছে রূপ ধরি।।
- মোহাম্মদ নাম যত জপি, তত মধুর লাগে
  নামে এত মধু থাকে, কে জানিত আগে।।
- হে মদিনার বুলবুলি গো গাইলে তুমি কোন গজল।
  মরুর বুকে উঠল ফুটে প্রেমের রঙিন গোলাব দল।।
- নবীর মাঝে রবির সম আমার মোহাম্মদ রসূল
  খোদার হাবিব দ্বীনের নকিব বিশ্বে নাই যাঁর সমতুল।।

- তোমার নামে একি নেশা হে প্রিয় হযরত
  যত চাহি তত কাঁদি আমার মেটে না হসরত।।
- এ কোন মধুর শারাব দিলে আল-আরাবি সাকী,
  নেশায় হলাম দিওয়ানা যে রঙিন হল আঁখি।।
- আমার মোহাম্মদের ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়
  ওগো হৃদয়ে যার রয়।
  খোদার সাথে রয়েছে তার গোপন পরিচয়।
- মোহাম্মদ মোর নয়নমণি মোহাম্মদ নাম জপমালা।
  ঐ নামে মিটাই পিয়াসা ও নাম কওসারের পিয়ালা।।
- হে প্রিয় নবী রসূল আমার
  পরেছি আভরণ নামেরি তোমার।।
- নামাজ রোজা হজ জাকাতের পসারিণী আমি
  নবীর কলমা হেঁকে ফিরি পথে দিবস যামী।।
- নাই হল বসনভূষণ এই ঈদে আমার
  আল্লা আমার মাথার মুকুট রসূল গলার হার।।
- আমি যদি আরব হ'তাম মদিনারই পথ।
  সেই পথে মোর চলে যেতেন নূর নবী হযরত।।
- আল্লাহ থাকেন দূর আরশে নবীজী রয় প্রাণের কাছে
  প্রাণের কাছে রয় যে প্রিয়, সেই নবীরে পরান যাচে।।
- লহ সালাম লহ, দ্বীনের বাদশাহ, জয় আখেরি নবী।
  পীড়িত জনগণে মুক্তি দিতে এলে হে নবীকুলের রবি।।
- মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা
  তুমি বাদশাহরও বাদশাহ কমলীওয়ালা।।
- যে রসূল বলতে নয়ন ঝরে সেই রসূলের প্রেমিক আমি।
  চাহে আমার হৃদয়-লায়লী সে মজনুরে দিবস-যামী।
- তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
  মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে
  যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে।।[৪৫]

---

৪৫. আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, *নজরুল ইসলাম : ইসলামী, গান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩ খ্রি.), সংকলন হতে সংগৃহীত।

সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাভাষী মুসলমানের মনে নবী প্রশস্তির উচ্চতর রচনার যে অভাব ও তৃষ্ণা ছিল কাজী নজরুল ইসলাম তার সোনার কলমের ছোঁয়ায় সেটি পুর্ণ করেছেন। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন একজন সত্যিকারের মুসলমানের কর্তব্য কী, আদর্শ কী? সদিচ্ছা কী? সফলতা কিসে। কাজী নজরুল ইসলামের রচিত এসব নাত-ই-রাসূল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ইসলামের বার্তাবাহকের ছবি, কর্ম, জীবনাদর্শ পৌঁছে দেবে। ভবিষ্যতের মানুষ তাদের চরম বিপর্যয়ের দিনে পাবে আশ্রয়ের স্থল। মুখে মুখে, ঠোঁটে ঠোঁটে ফিরবে 'মোহাম্মদের নাম'। রাসূল (সা)-কে নিয়ে নজরুল এত গান রচনা করেছেন ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। মানুষের কল্পনা এমনো হতে পারে! এতভাবে কল্পনা করা যায়! এভাবে সুরে ছন্দে বাঁধা যায় একজন মানুষকে! এ অসাধ্য সাধন করেছেন নজরুল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েই তিনি রচনা করেছেন এসব নাত-এ-রাসূল (সা)। কবি নজরুলের রাসূল (সা) প্রশস্তির অনবদ্য সৃষ্টি 'আমি যদি আরব হ,তাম–মদিনারই পথ' না'তটি তুলে ধরার মাধ্যমে অত্র প্রবন্ধের ইতি টানছি।

"আমি যদি আরব হ'তাম – মদিনারই পথ"

আমি যদি আরব হ'তাম – মদিনারই পথ।
এই পথে মোর চ'লে যেতেন নূর নবী হযরত।।
পয়জার তাঁর লাগত এসে আমার কঠিন বুকে,
আমি ঝর্ণা হয়ে গ'লে যেতাম অম্‌নি পরম সুখে;
সেই চিহ্ন বুকে পুরে পালিযে যেতাম কোহ্-ই-তুরে,
দিবা নিশি করতাম তাঁর কদম জিয়ারত।।
মা ফাতেমা খেলতো এসে আমার ধূলি ল'য়ে
আমি পড়তাম তাঁর পায়ে লুটিয়ে ফুলের রেণু হয়ে।
হাসান হোসেন হেসে হেসে নাচতো আমার
বক্ষে এসে চক্ষে আমার বইতো নদী পেয়ে সে নেয়ামত।।[৪৬]

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যে রাসূল (সা) প্রশস্তি একটি সুনন্দিত বিষয়। আবহমানকাল থেকে কবি সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনায় রাসূল (সা)-এর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করে আসছেন। সেই সাথে রাসূল (সা)-এর প্রশস্তিমূলক কবিতা ও গান রচনা করে তারা কীর্তিত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগে নানা বিভাগে পুঁথি, মর্সিয়া, না'ত ইত্যাদির মাধ্যমে রাসূল (সা) প্রশস্তি চর্চা হয়। আধুনিককালে বাংলা কাব্যে রাসূল (সা) প্রশস্তির একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি হয়। আঠারশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা কাব্যে রাসূল প্রশস্তির যে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল,

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে তা এক বিশাল মহীরুহরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আধুনিক বাংলা কাব্যে কাহিনী-নির্ভরতার বদলে কাব্যের উপজীব্য হয়েছে ইসলামী আদর্শ ও হযরত মুহম্মদ (সা)-এর সত্যসন্ধানী জীবনের মহান শিক্ষা। সেই আদর্শ ও শিক্ষাই আধুনিক কবিদের নবী-বিষয়ক কবিতায় আলোকশিখার মতো বিচ্ছুরিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কয়েকজন কবি সাহিত্যিকের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাদের অনন্য সাধারণ ভূমিকা বাংলা কাব্যে রাসূল প্রশস্তিকে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে কবি নজরুলের ভূমিকা অনিস্বীকার্য। তিনি বাংলা ভাষায় সর্বাধিক হামদ-নাতের রচয়িতা। তিনি বাংলা সাহিত্যে না'তে রাসূলের একটা স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, মহানবী (সা) -এর জীবন ও তাঁর রূপ-সৌন্দর্য বোঝাতে গিয়ে তিনি যে উপমা ও বর্ণনার ভঙ্গি তুলে ধরেছেন, তার সুরের ঔদার্য ও শব্দের অলঙ্কারে যে ব্যাকুলতা ছড়িয়ে দিয়েছেন, সে উপমা আজও বিরল। সার্বিকভাবে বলা যায় বাংলা কাব্যে রাসূল (সা) প্রশস্তি বাংলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুপাঠ্য ও সুনন্দিত এসব সৃষ্টিকর্ম বাঙালী জাতিকে অনন্তকাল সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা

জহিরুল ইসলাম*

[ABSTRACT: The role of values is very important to make human life and society beautiful and peaceful. One of the many differences between humans and animals is the practice of ethics and values. Due to the lack of moral and human values, our individual life today is depressed, strife in family life, discord and chaos in social life, instability and anarchy in state life, curse of bribery and corruption in economic life, prevalence of shamelessness and stupidity in cultural life, imperialism and belligerence in international arena. The situation, above all our entire life system today is disturbed and turbulent. This article is designed to find a way out of this situation. Descriptive and analytical methods were followed in this study. It is evident from this article that the development of values in the society requires religious consciousness, especially the observance of Islamic precepts. Every chapter of the Qur'an and Sunnah contains the infallible panacea for all degenerative diseases and all the ingredients and means of developing values, through which anyone who wants to can become a great person with high morals in a very short period of time. A person with Islamic values strives to be free from moral lapses and crimes for his own sake. As a result universal brotherhood and peaceful atmosphere prevails in family, society and state.]

Keywords: Values, Morality, Humanity, Islam, Akhlaq.

ভূমিকা

মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' (সৃষ্টির সেরা জীব) হিসেবে স্বীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলবে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে, অপরাপর মানুষের সাথে, এমনকি গোটা মাখলুকাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে নিজের মান-মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখবে, এটাই কাম্য। অধিকন্তু মানুষ জীবন থেকে মিথ্যা, অন্যায় ও অসুন্দর দূর করে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের চর্চার মাধ্যমে মূল্যবোধে ভাস্বর মহৎ জীবনের অধিকারী হবে এবং চিত্তে নৈতিকতা, মানবিকতা, সত্যনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, কর্তব্যপরায়ণতা, দেশপ্রেম ও মানবসেবা ইত্যাদি মানবিক গুণের সঞ্চার ও সন্নিবেশ ঘটাবে, এটাই প্রত্যাশিত। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বর্তমানে মনুষ্য সমাজ যেসব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন তার মূলে রয়েছে মূল্যবোধের সর্বগ্রাসী অবক্ষয়। আমাদের সমাজে আজ সততার দুর্ভিক্ষ চলছে।

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস।

অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, মিথ্যা, শঠতা ও প্রতারণা, যুলুম-নির্যাতন পুরো সমাজ ব্যবস্থাকে কলুষিত করে ফেলেছে। যার ফলে সমাজে অপরাধ, অশান্তি ও অস্থিরতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আজ নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা অনুপস্থিত। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এখন শুধু পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ। অথচ যে কোনো জাতির আত্মবিশ্বাস তার নৈতিক মূল্যবোধে, শক্তির স্তম্ভ তার সংস্কৃতিতে, উন্নয়ন তার কর্মস্পৃহায়। পক্ষান্তরে কোনো জাতির পতন ও ধ্বংসের প্রধান বাহন হচ্ছে অনৈতিকতার প্রসার। বর্বর, অসভ্য ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড অনুশীলনের কারণে আল্লাহ তা'আলা বহু জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে ভুরি ভুরি। মুসলিম উম্মাহ বর্তমানের মতো এতটা নৈতিকতাহীন পূর্বে কখনো ছিল না। আজকাল পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে যে সকল অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যাচ্ছে সেগুলোর অধিকাংশের পিছনে ভোগবাদ ও বস্তুবাদের প্রতি অতি আসক্তি এবং ব্যক্তির নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব-ই দায়ী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আগমন আমাদের যুবসমাজের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে যে মহাসর্বনাশ ডেকে আনছে, তা কখনো সম্ভব হতো না যদি ব্যক্তি যথাযথ নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ছায়ায় গড়ে ওঠতো। নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা করতে হলে এ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য জানা অত্যন্ত জরুরি।

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্য বলতে সাধারণত আমরা আর্থিক মূল্য বা দামকেই বুঝি। তবে এটি বাক্যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ক্রিয়া হিসেবে মূল্যের অর্থ হলো প্রশংসা করা বা সমাদর করা। গুণবাচক বিশেষ্য হিসেবে মূল্যের অর্থ যোগ্যতার গুণ বা ভালোত্ব। বস্তুবাচক বিশেষ্য হিসেবে মূল্যের অর্থ হলো বস্তুতে আশ্রিত গুণ। যা আমাদের মনে সন্তোষ সৃষ্টি করে তারই নাম মূল্য।[১] আর বোধ মানে চেতনা (Sense), অনুভূতি, উপলব্ধি। আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকেই বোধশক্তি দিয়েছেন, যেটিকে আমরা বলি Common Sense. মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Value যার প্রকৃত অর্থ বস্তু বা ব্যক্তির মূল্যাবধারণ বা মূল্যবিচার।[২] মূল্যবোধ বলতে সাধারণত মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদণ্ডকে বুঝায়, যার মাধ্যমে কোনো ঘটনা বা অবস্থার ভালো-মন্দ বিচার করা হয়। এটি এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, বিশ্বাস, আদর্শ, ধারণা ইত্যাদি অথবা এগুলোর সমষ্টি, যা মানুষকে কোনো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং অন্যের কোনো কাজ মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়।

---

১ মো. আবদুল ওদুদ, *সাধারণ নীতিবিদ্যা*, (ঢাকা: মনন পাবলিকেশন, ২০১২), পৃ. ৫৬৮।

২ ড.এম মতিউর রহমান ও ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, *দর্শনের মূলনীতি*, (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০০৯), পৃ.২৩১।

বহুল প্রচলিত মূল্যবোধ (Value) শব্দটি নীতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। নীতিবিজ্ঞানে মূল্য বা মূল্যবোধ কথাটির আক্ষরিক অর্থ যোগ্যতা বা উৎকর্ষতা। নীতিবিজ্ঞানের পরিভাষায় মূল্যবোধ হচ্ছে এমন একটি যোগ্যতা বা উৎকর্ষতা, যা আমাদের আচরণের লক্ষ্য ও কাম্য বস্তুকে গঠন করে।[৩] নৃতত্ত্বের পরিভাষায় মূল্যবোধ হচ্ছে সংস্কৃতি, জীবনাচরণ, জীবন প্রণালী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির প্রতীক। অন্যদিকে সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় মূল্যবোধ হচ্ছে নীতিবোধ, আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা, মনোভাব, অধিকার, বাধ্যবাধকতা ইত্যাদির সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ।[৪] অর্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় মূল্যবোধ হচ্ছে এমন একটি আদর্শের মাপকাঠি যা মানুষের প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও আকাঙ্খার নৈতিক, নান্দনিক এবং যৌক্তিক প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে। ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক ও কাঙ্খিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ধারণার নামই মূল্যবোধ।[৫] স্পেফার মতে, "ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক ও কাঙ্খিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ধারণার নামই মূল্যবোধ।"[৬] এন. আর. উইলিয়াম বলেন, মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড, যার আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং যার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।[৭]

বাস্তবিকার্থে ব্যক্তি নিজের জন্য, গোষ্ঠীর জন্যে, সর্বোপরি সমাজের মঙ্গলের জন্যে যে সকল আচরণ ও নীতিমালা কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করে তাই মূল্যবোধ। অর্থাৎ সমাজের মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে ব্যক্তির কর্ম, আচরণ বিশেষ করে নীতিবোধের মাধ্যমে। এটি এমন একটি মাপকাঠি, যার আদর্শে সমাজস্থ মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং যার মাধ্যমে মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয় এবং যা মানুষের কাঙ্ক্ষিত আচরণ গঠন করে। আর ইসলামী মূল্যবোধের পরিচয়ে আলী খলীল মুস্তফা 'আল-কীমাহ আল-ইসলামিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেন, মানুষ, জীবন এবং বিশ্বজগত সম্পর্কে মৌলিক ইসলামি চিন্তা থেকে উৎসারিত এমন কিছু বিধান ও মানদণ্ড যা জাগতিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও অবস্থার আলোকে ব্যক্তি ও সমাজের সামনে গঠিত হয়, যা তাকে তার সম্ভাব্যতা অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বেছে

---

৩ ড. এম. আবদুল হামিদ, *সমকালীন নীতি বিদ্যার রূপরেখা*, (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশনা বোর্ড, ২০০১), পৃ.১৫।

৪ আনোয়ার উল্যাহ চৌধুরী, *'মূল্যবোধ ও সামাজিক পরিবর্তন'*, ১৯৯২, (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় : উৎস, কারণ ও প্রকৃতি- শীর্ষক জাতীয় গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত নিবন্ধ), পৃ. ১।

৫ ড. শওকত আরা, *উচ্চতর সমাজ মনোবিজ্ঞান*, (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২য় সংস্করণ, ২০০৬), পৃ.২১৯।

৬ প্রাগুক্ত।

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯; মো: আতিকুর রহমান, *সমাজ কল্যাণ*, (ঢাকা: কোরআন মহল, ১৯৯৯), পৃ. ৫৮।

নিতে সক্ষম ও যোগ্য করে তোলে এবং যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবহারিক রীতি-নীতি ও ব্যবস্থাপনার মাঝ থেকে রূপ পরিগ্রহ করে।[৮]

সর্বোপরি, মূল্যবোধ একটি ব্যাপক ও বহুল প্রচলিত আপেক্ষিক প্রত্যয় এবং দর্শন সম্পর্কিত একটি ধারণা। যে সব নীতি, বিশ্বাস, আদর্শ, দর্শন ও চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ ও কার্যাবলী পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সেগুলোর সমষ্টি মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের নীতিবোধ, আদর্শ, জীবনাচরণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ। এটা এমন এক আদর্শের মাপকাঠি যা মানুষের প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও আকাঙ্ক্ষার নৈতিক, নান্দনিক ও যৌক্তিক প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে। এটা সমাজকে শৃঙ্খলিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। এটা ভালো-মন্দ, প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত ও ন্যায়-অন্যায়ের নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে। বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীব হিসেবে সুস্থ মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে মূল্যবোধের উপস্থিতি সব সময়ে লক্ষ করা যায়। মূল্যবোধ প্রকাশের কতগুলো বাহন রয়েছে, নৈতিকতা ও মানবিকতা তেমনি গুরুত্বপূর্ণ দুটি মৌলিক বাহন, যার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশে মানব জীবন হয় সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ। মানুষের ধন-সম্পদ, বিদ্যা-ডিগ্রী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তথা বৈষয়িক উন্নতি যতই বাড়ুক না কেনো সবই বৃথা যদি তার মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ না ঘটে। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের আলোকে যারা নিজেদের জীবনকে রাঙ্গাতে পারে তারাই সভ্যতার ধারক ও বাহক, তারাই সফল।

মূল্যবোধের ভিন্নতা

মূল্যবোধ একটি অলিখিত সামাজিক বিধান হওয়ায় কোনো সমাজেই তা লিপিবদ্ধ থাকে না। দীর্ঘদিনের লালিত বিশ্বাস, সামাজিক রীতি-নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ, শিক্ষা-দীক্ষা, অনুমোদিত আচার-ব্যবহার, প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ইত্যাদির ভিত্তিতে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। তবে এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাস ও জ্ঞান। কেননা বিশ্বাস আর জ্ঞানই মানুষের জীবনকে গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। বিশ্বাস আর জ্ঞানের পার্থক্যের কারণেই সমাজ ও পরিবেশভেদে কিংবা স্থান, কাল ও পাত্রভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং একই মূল্যবোধ সমাজভেদে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিবেচিত হয়। প্রাচ্যের মূল্যবোধ এবং পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের পার্থক্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেমন প্রকাশ্যে মদপান বা নারীদের উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ হয়ে জনসম্মুখে ঘুরাফিরা করা পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় বস্তুতান্ত্রিক ও ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সমাজে মামুলি ব্যাপার হলেও প্রাচ্যের মুসলিম সমাজে তা জঘন্য ও সমাজবিরোধী কাজ। আবার হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা স্বহস্তে গড়া মূর্তির পূজা বা

---

৮ উদ্ধৃত, *মাওসু'আতু নাদরাতুন নাঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম*, (জেদ্দা: দারুল ওসীলাহ লি নাশরি ওয়াততাওযী') খ. ০১, পৃ. ৭৯।

অর্চনা করে, কিন্তু মুসলিমদের জন্য সেটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ-শিরক। মূল্যবোধের ভিন্নতার কারণে একই জিনিস একটা সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য তো অন্য সমাজে তা বর্জনীয়।

সুতরাং দেখা যায়, প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বজায় রাখে এবং বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করে। আবার মানুষের সমাজজীবনে ব্যক্তিগত, দলীয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পেশাগত ইত্যাদি পর্যায়ে মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ের মূল্যবোধ ব্যক্তির বিশ্বাসবোধ, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা ও নীতিবোধকে নির্দেশ করে, যেগুলো ব্যক্তির আচার-আচরণ ও কার্যাবলী পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। সামাজিক রীতি-নীতি, আদর্শ ও অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়ে গড়ে উঠা মূল্যবোধ সমাজের মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে। আর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত মূল্যবোধ হলো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট পেশার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ ভিত্তিক নীতিমালার সমষ্টি যা প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে ব্যক্তি, সমাজ ও মানবতা বিপন্ন হয়ে পড়ে।

ইসলাম ও মূল্যবোধ

ইসলাম মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিধানে এবং পারস্পরিক সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে এবং পৃথিবীতে সঠিকভাবে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কতগুলো বিধিনিষেধ ও ভালো-মন্দ স্থির করে দিয়েছে– এ সবই মূল্যবোধ। মানব জীবন ও সমাজকে সুন্দর ও শান্তিময় করার জন্য মূল্যবোধের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। মানবজীবনে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, আদর্শ, কাঙ্ক্ষিত আচরণ ও নৈতিক ভাবধারা গঠনে মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটাই নৈতিক জীবনের মৌলিক উপাদান এবং জীবনে এর রূপায়ণই মানব জীবনের ব্রত। এর বাস্তবায়নে জীবন ধন্য, সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। মূল্যের ধারণাই মানুষকে জীব জগতে পৃথক সত্তার অধিকারী করেছে। মানব জীবন থেকে মূল্যবোধের ধারণা বাদ দিলে জীবের বৈশিষ্ট্য থাকে বটে কিন্তু মনুষ্য নামের উপযোগী কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না। মূল্যবোধ ও মন্যুষত্ব একই সূত্রে গাঁথা; যার মূল্যেবোধের ধারণা নেই তার মন্যুষত্ব নেই। শুধু দীর্ঘায়ুর মধ্যে মানব জীবনের স্বার্থকতা নেই, স্বার্থকতা আছে জীবনের মূল্যবোধের রূপায়ণে তথা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের ধারণা ও উপলব্ধির মাধ্যমে আলোকিত জীবন যাপনের মধ্যে। মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে মূল্যগুলোকে জীবনে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে। মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও রূপায়ণের মাধমেই সাধিত হয় মানবতার অগ্রগতি। এ পথেই মানবিক পূর্ণতা ও আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়।[৯]

---

৯ বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : এ এফ মোঃ এনামুল হক, মূল্যবোধ কি এবং কেন? (ঢাকা: ইফাবা, ২য় প্রকাশ, ২০১৪), পৃ. ১৯-২৮।

এটা প্রমাণিত সত্য যে, মূল্যবোধ মানুষকে সর্বদা কল্যাণকর ও মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আর এর মূলে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে ধর্ম। ধর্ম, বিশেষত ইসলামই সর্বযুগে মানবজাতিকে নৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ ও উজ্জীবিত করেছে। ইসলামের সাথে মূল্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলাম নিছক আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম না হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা হওয়ায় এটি সর্বদা মানুষকে শান্তি ও কল্যাণের পথনির্দেশ করে। মানুষের কর্মমুখর বিশাল ও বর্ণাঢ্য জীবনের সকল অঙ্গনের জন্যই রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। মানবজীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই যা ইসলামে নির্দেশ করা হয়নি। এককথায়, ইসলামী মূল্যবোধ গোটা মানবজীবন ব্যষ্টিত, এর ব্যাপ্তি ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী। জীবন বিধান হিসাবে ইসলাম যেমন নির্ভুল, সর্বজনীন, শাশ্বত ও চিরন্তন, তেমনি এটি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সহধর্মী, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী এবং মানুষকে তার স্রষ্টার সাথে এবং অপরাপর সৃষ্টির সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনকারী। ইসলামের সহজ-সরল ও ব্যবহারিক বিষয়াবলী মহান স্রষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত সর্বোৎকৃষ্ট মূল্যবোধ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। এ আদর্শের ফলেই একজন মানুষের মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটে, যা মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আসনে সমাসীন করে। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব সমান্তরালভাবে বিরাজমান। পশুত্বকে দমন করে মনুষ্যত্বকে লালন ও বিকশিত করার প্রচেষ্টাই ইসলামি মূল্যবোধের মূলকথা। মহান আল্লাহ মানুষের মনুষ্যত্ব বা বিবেককে পবিত্র ও জাগ্রত করতে এবং পশুত্ব বা সীমালঙ্ঘন প্রবণতাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণে রেখে জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। যারা আল্লাহর এ নির্দেশ প্রতিপালনে সচেষ্ট তারাই মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। তারা সাধারণত সৎ, সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী ও ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে মানুষ যখনই পশুশক্তি বা পশুস্বভাব দ্বারা চালিত হয়, তখন সে নীতি ও মূল্যবোধহীন হয়ে হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

এদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ.

"আমি তো দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি অসংখ্য জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর আছে কিন্তু তার দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখে না। তাদের কান আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না। এরা পশুর সমতুল্য, বরং তার চাইতেও অধম। এরাই উদাসীন, অসচেতন" (সূরা আরাফ : ১৭৯)।

সুতরাং মানব মর্যাদা ও মনুষ্যত্ব রক্ষা এবং বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করার জন্য সমাজে ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা ও রূপায়ণ অপরিহার্য।

নৈতিক মূল্যবোধ

নৈতিক মূল্যবোধ একটি বহুল প্রচলিত প্রত্যয়, যা বাংলা 'নীতি' শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। নীতি মানে বিবেকের বিচার, ভালো-মন্দ যাচাই। ন্যায্য বা ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও হিতকর বিধানগুলোকেই নীতি বলা হয়। আর সমাজস্থ ব্যক্তির আচরণের উচিত্য ও অনৌচিত্যের বিচার হলো নৈতিকতা।[১০] নৈতিক মূল্যবোধ মানে নৈতিক চেতনা বা নৈতিক মূল্য সম্পর্কে উপলব্ধি। সাধারণত ভালো-মন্দের যে জ্ঞান মানুষের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই নৈতিকতা। নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হলো নীতিবোধ। নীতিবোধ হলো বিবেকপ্রসূত এক অভ্যন্তরস্থ শক্তি যা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের মধ্যে প্রভেদ করতে সক্ষম।[১১] অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় বা ভালো-মন্দের ধারণার ভিত্তিতে নীতিবোধের সৃষ্টি হয়। নীতিবোধ মানুষের এমন একটি অন্তর্নিহিত শক্তি, যেই শক্তির উৎস হলো সত্য, সুন্দর ও শুভের প্রতি অনুরাগ এবং অসুন্দর, অসত্য ও অশুভের প্রতি বিরাগ। আর এই নীতিবোধ থেকেই উৎসারিত হয় আমাদের নৈতিকতা। তবে সাধারণত যে আচরণ ও নীতিমালা সঠিক ও নির্ভুল থেকে ভুলকে, ন্যায় থেকে অন্যায়কে, উচিৎ থেকে অনুচিৎকে পৃথক করে তাই নৈতিকতা। তবে ন্যায়বিচারই হচ্ছে নৈতিকতার হৃদয়। নৈতিকতা সমাজ ও সংগঠনে মানুষের আচরণে ভালো ও মন্দের একটা নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করে।

ব্যাপকার্থে নৈতিকতা বলতে এমন কতগুলো মানবীয় গুণাবলীকে বুঝায়, যা মানুষকে সত্য, সুন্দর ও চিরকল্যাণের পথে পরিচালিত করে। এমন গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, মিথ্যার নিন্দাবাদ, ক্ষমাশীলতা, ধৈর্যশীলতা, কৃতজ্ঞতা, সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকা, বিশ্বস্ততা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, পারস্পারিক সম্প্রীতি রক্ষা, সত্য সাক্ষ্য দান, উদ্ধতভাব পরিহার করে বিনয়ী ও নম্র হওয়া, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঈর্ষা থেকে বিরত থাকা, অন্যের বিপদে উল্লসিত না হওয়া, দলীয়করণ-স্বজনপ্রীতি-দুর্নীতি ও গোঁড়ামী থেকে বেঁচে থাকা, মদ, জুয়া, সুদ-ঘুষ, ব্যভিচার, হত্যা-রাহাজানি প্রভৃতি থেকে বিরত থাকা। এছাড়া চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, শিশু পাচার, এসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন, পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন, আত্মহত্যা, চোরাচালানী, মজুদদারী, ভেজাল মেশানো প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকাও এক ধরনের নৈতিকতা। সমাজে বসবাসকারী অপরাপর ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, সংস্থা ইত্যাদির সাথে একজন মানুষের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত তা নির্দেশ ও নির্ণয় করতে নৈতিকতা নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। এটা মানুষের অন্তরের এমন এক অনন্য শক্তির যোগান দেয়, যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ, কর্তব্য নির্ধারণ, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য

---

১০ ড রশীদুল আলম, *দর্শন ও সাহিত্য*, (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ১৩২।

১১ ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, *নীতিবিদ্যা*, (ঢাকা: পুথিঘর লিমিটেড, ৩য় সং. ১৩৯৭ বং), পৃ. ১৪৪।

বোধ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি এটি মানুষকে ভালো ও ন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং মন্দ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। নৈতিক মূল্যবোধ সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করার মধ্য দিয়ে সামাজিক কার্যকলাপে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করে।

নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব

মানব জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। নৈতিক মূল্যবোধের ফলে সমাজ বহু অরাজকতা, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে মুক্তি পায় এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নের একটি প্রধান পূর্বশর্তও বটে। যে জাতির নৈতিক মূল্যবোধ যতো বেশি জাগ্রত হয়, সে জাতি ততো বেশি উন্নত। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসনের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ অনন্য ভূমিকা পালন করে এবং এর উপর একটি জাতির সভ্যতা, নৈতিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয় বরং তারা কতখানি নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা সঞ্জীবিত তা দেখার বিষয়। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে কর্মঠ ও পরিশ্রমী করে তোলে। শ্রম বিমুখতা, দায়িত্বহীনতা এবং উদাসীনতার মতো নৈতিক ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ মহৌষধের মতো কাজ করে। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে অন্যায়ের পথ থেকে বেঁচে থাকার চেতনা যোগায়। ব্যক্তিস্বার্থ, অহংচেতনা, আত্মতুষ্টি, দুনিয়াসক্তি ইত্যাদি সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে দেয় প্রবল ও দৃঢ় মানসিক শক্তি, যার ফলে মানুষ যাবতীয় দুর্নীতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে শেখে; অন্যায় ও অবৈধ পন্থা পরিত্যাগ করে নৈতিক ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে। নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে আলোকিত মানুষের সংখ্যা সমাজে যতই বৃদ্ধি পায়, ততই সমাজ জীবন হয়ে ওঠে কলুষমুক্ত ও সৌন্দর্যমন্ডিত। তাই মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষের জন্য এবং জাতীয় জীবনের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলন ও বিকাশের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই কারণে শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের উৎসারণ এবং তার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা।

সততা, নৈতিকতা ও নীতিজ্ঞান- এ তিনটি একটি অপরটির পরিপূরক। সততা, নৈতিকতা ও নীতিজ্ঞানের পরিপন্থী যে কোনো কাজই অন্যায়। একজন সৎ ব্যক্তির পক্ষে কখনো কোনো অনৈতিক ও নীতিজ্ঞানবহির্ভূত কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ তার কাছে যে কোনো অসৎ, অনৈতিক ও নীতিজ্ঞানবহির্ভূত কাজ অন্যায় হিসেবে পরিগণিত। আর অন্যায় সততা, নৈতিকতা ও নীতিজ্ঞানকে বিনষ্ট করে দেয়। পৃথিবীর যে কোনো দেশ ও সমাজ যতো বেশি সততা, নৈতিকতা ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ দিয়ে সমৃদ্ধ হবে, সে দেশ ও সমাজ ততো বেশি আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, ব্যক্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। নৈতিক মূল্যবোধ সামাজিক অবক্ষয় রোধ করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে অনৈতিকতা ও চিন্তাগত উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংস করে দেয়। তাই আমাদের উচিৎ নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

নৈতিকতার উৎস ধর্ম

নৈতিকতার উৎসই হলো ধর্ম। ধর্ম ও নৈতিক চরিত্র এ দুটো অবিভাজ্য একক, দুটোকে কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবা যায় না। বলা যায় ধর্ম হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের প্রাণশক্তি। আর নৈতিক চরিত্র হচ্ছে ধর্মের অবয়ব। অকলঙ্ক উত্তম নৈতিক চরিত্র পাওয়ার একমাত্র উৎস হলো ধর্ম। ধর্মই মানুষকে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং মানুষকে সব ধরনের অনৈতিকতা থেকে রক্ষা করে। ধর্মই মানুষের আদত-অভ্যাস, আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বিনয়ী ও অনুগত বানায়। ধর্মই ব্যক্তির মন-মানসিকতাকে জীবন্ত রাখে নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিতে এবং তাকে উৎকর্ষ দান করে। পৃথিবীর প্রধান সব ধর্মমত যথা ইসলাম, খ্রিষ্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মে ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণের কথা বলা হয়েছে। সব দেশের প্রচলিত আইনে অন্যায়-গর্হিত কাজ মাত্রাভেদে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মহান ধর্ম ইসলামের পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়ে মূল্যবোধ বা নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। আর ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনই তো নৈতিকতার আকর। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ মানবজাতির জন্য দিক-নির্দেশনামূলক ও নৈতিকতায় ভরপুর।

আজ সমাজ, দেশ ও মহাদেশে মানুষে মানুষে এতো হিংস্রতা, নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা কেনো? তাদের তো 'মায়া মমতায় জড়াজড়ি করে' পরম হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে' এ মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে জীবনযাপন করার কথা। তাহলে দেশে দেশে কেনো এ পৈশাচিকতা? কেনো এ বর্বরতা? কারণ মানুষ তার মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলেছে, বিসর্জন দিয়েছে তার মানবিকতাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ কেনো তার মূল্যবোধ ও মানবিকতাকে হারিয়ে ফেলছে? এর মূল কারণ হলো মানবিকতার উৎস যে ধর্ম তাকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করা। উদাসীনতা অথবা বিদ্বেষবশত তার অনুশীলন থেকে দূরে সরে যাওয়া। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে পার্থিব উন্নতির জন্য বহু বিষয় শিক্ষা দিচ্ছি, ধর্ম শিক্ষা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করছি। ধর্ম অনুশীলন থেকে দিন দিন আমরা নিজেরাও সরে যাচ্ছি। ফলে আমাদের বৈষয়িক উন্নতি হলেও আমাদের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি হচ্ছে না। এতে আমাদের পাশবিক চেতনা সমৃদ্ধ হচ্ছে ঠিক কিন্তু নৈতিক, মানবিক ও আত্মিক চেতনা দুর্বল অথবা বিলুপ্ত হচ্ছে। আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষের মধ্যে পাশবিক ও মানবিক এ দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী

সত্তার অবস্থান রয়েছে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে সত্তা সবল হয়, মানুষ তারই অনুসারী হয়। মানবিক সত্তা প্রবল হলে মানুষ ভালো কাজ করে এবং অন্যায় ও সমাজবিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকে। আর পাশবিক সত্তা প্রবল হলে মানুষ অন্যায়-অপরাধ করে এবং ভালো কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। শুধু ভোগবিলাস, আর্থিক প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা এবং পার্থিব উন্নতি দ্বারা মানুষের পাশবিক সত্তা শক্তিশালী হয়। আর ধর্মীয় চেতনা, ধর্মের অনুশীলন, আখিরাতের জবাবদিহির অনুভূতি ও আল্লাহর ভয় মানুষের নৈতিক ও আত্মিক চেতনাকে শক্তিশালী করে।

উল্লেখ্য যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম অনুসৃত স্বাভাবিক জীবনাচরণকেই আমরা আমাদের 'নৈতিকতার মানদণ্ড' হিসেবে বিবেচনা করবো এবং এর (ইসলামের) আলোকেই আমাদের বর্তমান সময়ে 'নৈতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপট' বিবেচনা করবো। বর্তমানে পৃথিবীতে যতো প্রকার ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, যৌনবাদী, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী মতবাদ আছে, সেগুলোর কোনোটিই নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। এক্ষেত্রে সকল মতবাদই ব্যর্থ, একমাত্র ইসলাম ছাড়া। একমাত্র ইসলামেই রয়েছে নিখুঁত, নির্ভুল ও নির্ভেজাল নৈতিক প্রেরণা সৃষ্টির মৌলিক উপাদান। ইসলাম মানুষকে এমন একটি জীবনব্যবস্থার দিকে আহ্বান করে, যা মানব রচিত কোনো ঠুনকো মতবাদের দ্বারা সাজানো নয়; বরং খোদায়ী ওহীর নির্দেশনার আলোকে অত্যন্ত নিখুঁত ও সাবলীল পন্থায় রচিত। তাই বিশ্বাসীদের জন্য ইসলামই হচ্ছে নৈতিকতার সঠিক মানদণ্ড-নির্ধারক।

ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ

নৈতিকতার আরবি প্রতিশব্দ আখলাক, যা ব্যাপক অর্থবোধক। মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের মাধ্যমে যেসব আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায়, সে সবের সমষ্টি হলো আখলাক। অর্থাৎ সামাজিক জীব হিসেবে মানব চরিত্রের প্রতিটি দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত আখলাকের ক্ষেত্র বিস্তৃত। মানব চরিত্রের সৎ ও অসৎ গুণাবলীর প্রেক্ষাপটে আখলাক দু ধরনের :

১. আখলাকুল হাসানা (সৎ চরিত্র) ও

২. আখলাকুস সাইয়্যিয়াহ (অসৎ চরিত্র)।

কুরআন ও সুন্নাহতে উল্লেখিত ভালো গুণাবলী (যেমন- সততা, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, সদাচার, পরোপকার, সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি) মানব চরিত্রে বিদ্যমান থাকলে তা আখলাকুল হাসানা। আর কুরআন, সুন্নাহ ও সুস্থ বুদ্ধি-বিবেক যেসব গুণাবলীকে মন্দ সাব্যস্ত করেছে এবং যেগুলো মানুষকে হীন ও ইতরে পরিণত করে তা আখলাকুস সাইয়্যিয়াহ। যেমন মিথ্যা বলা, কপটতা বা ভণ্ডামি, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা, গীবত, খিয়ানত ইত্যাদি আখলাকুস সাইয়্যিয়ার অন্তর্গত। এই উভয় প্রকার আখলাকের কিছু স্বভাবগতভাবেই মানুষের মধ্যে থাকে, আর কিছু অনুশীলন বা চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়।

মানব জীবনে আখলাকুল হাসানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি এমন এক চালিকাশক্তি যা মানুষের আকাঙ্খা পূরণের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ ও বৈধ-অবৈধ নির্দেশ করে, মানুষকে বৈধ-অবৈধ সীমারেখার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখে এবং তা অন্যায় ও অবৈধ পথে অর্জন থেকে বিরত রাখে। এই নৈতিক শক্তি মানব মনের পাশবিক প্রবৃত্তির ওপর লাগাম পরিয়ে দেয়। তা শুধু মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রিত রাখার নির্দেশ করে না, বরং মানুষকে উন্নত ও মহান উদ্দেশ্যে এবং তাৎক্ষণিক পার্থিব ভোগ-বিলাসের পরিবর্তে উন্নত ও চিরস্থায়ী আখিরাতের মহান লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে। এটা তাৎক্ষণিক পার্থিব সুবিধা কামনা করে না। এটা মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ পরিবর্তে ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয় এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে শেখায়। এই নৈতিক শক্তিই কেবল মানব সভ্যতার সম্মুখে সত্যিকার অর্থে উন্নতি ও প্রগতির পথ খুলে দিতে পারে। তাই চরিত্র ভালো হলে ব্যক্তি ভালো হয়। আর চরিত্র খারাপ হলে ব্যক্তিও খারাপ হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরস্পরের আচরণ সৌহার্দপূর্ণ রাখতে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

أَكْمِلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا.

"মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার আচার-আচরণ উত্তম। আর তোমাদের মাঝে তারাই উত্তম যারা আচার-আচরণে তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।"[১২]

আখলাকই দ্বীনের মূল উদ্দেশ্য। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে আখলাক বা চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সব মৌলিক দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তন্মধ্যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এজন্য তিনি বলেছেন,

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ.

"আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"[১৩]

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে নৈতিক চরিত্র অর্জন ও চারিত্রিক মাধুর্যতার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে নৈতিক আদর্শ রক্ষা এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ড রোধের ক্ষেত্রে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা ব্যক্তির চরিত্র উন্নত না হলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচারের সূচনালগ্ন

১২ সুনান তিরমিযী, কিতাবুর রিদা'আ, বাবু মা যাআ ফি হাক্কিল মার'আ আলা যাওজিহা, হা. নং ১১৬৩।

১৩ ইমাম মালিক ইবনু আনাস, আল-মুয়াত্তা, কিতাবু হুসনিল খুলক, হাদীস নং ১৬০৯; ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, কিতাবু হুসনিল খুলক, হা. নং ১১৯।

থেকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। অধিকন্তু তাকওয়াবান ও ধার্মিক হওয়ার জন্য মৌলিক উপাদান হলো উত্তম চরিত্র। উত্তম চরিত্রবান তথা ভালো মানুষ হওয়া ছাড়া ধার্মিক হওয়া যায় না। চরিত্রের উপরই মানুষের ধার্মিকতা গড়ে উঠে। চরিত্রের দিক থেকে যে অধিক অগ্রসর, ধর্মের দিক দিয়েও সে অধিক অগ্রগামী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেন :

إِنَّ خِيَارَ كُمْ اَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا ـ

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট।"[১৪]

اِنَّ مِنْ اَحِبَّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبَكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا ـ

"তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সর্বোত্তম কিয়ামতের দিন সে হবে আমার প্রিয়পাত্র এবং তোমাদের মধ্যে তার আসন হবে আমার অধিক নিকটবর্তী।"[১৫]

জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন :

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ صَدْرِكَ وَ كَرِهَتْ اَنْ يَّطْلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ـ

"উত্তম চরিত্রই পূণ্যশীলতা, আর পাপ হলো যে কাজ মনের মধ্যে খটকা সৃষ্টি করে এবং এ কাজ সম্বন্ধে কেউ অবগত হোক তা অপছন্দ করা।"[১৬]

سُئِلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَ كْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কোন জিনিস মানুষকে বেশি পরিমাণে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন, তাকওয়া ও সচ্চরিত্র।"[১৭]

উত্তম চরিত্র নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের প্রধান উপাদান। ভালো ও আদর্শ মানুষ তৈরিতে যেমন সৎ চরিত্র একটি অপরিহার্য বিষয়, তেমনি পরকালীন সফলতার জন্য সৎ চরিত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

---

১৪ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং ৩৩৬৬; কিতাবুল আদাব, হা. নং ৫৬৮৮।

১৫ সুনান তিরমিযী, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.নং ২৯০৬।

১৬ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, হাদীস নং ২৫৫৩।

১৭ সুনান তিরমিযী, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.নং ২০০৪।

مَا شَيْئٌ اَثْقَلُ فِـىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِئَ.

"কিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য মিযানের পাল্লায় সদ্ব্যবহারের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছু হবে না এবং আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল ও কটুভাষীকে অবশ্যই ঘৃণা করেন।"[১৮]

আখলাকের মাধ্যমেই ব্যক্তির ভালো অথবা মন্দের পরিচয় ফুটে উঠে। তাই ইসলাম মানুষের ভালো-মন্দ নিরূপনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ ও কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দকে মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

خَيْرُ كُـمْ مَنْ يُّرْجٰى خَيْرُهُ وَيُـؤَمِّنُ شَـرُّهُ وَشَـرُّ كُـمْ مَنْ لَّا يُرْجٰى خَيْرُهُ وَلَا يُؤَمِّنُ شَـرُّهُ ـ

"তোমাদের মধ্যে ভালো হচ্ছে যার থেকে কল্যাণের আশা করা যায় এবং অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আর তোমাদের মধ্যে মন্দ হচ্ছে যার থেকে কল্যাণের আশা করা যায় না এবং অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকা যায় না।"[১৯]

তিনি আরো বলেছেন :

خَصْلَتَانِ لَا تَـجْتَمِعَانِ فِـىْ مُؤْمِنٍ اَلْبَـخِيْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ ـ

"দুটি নিকৃষ্ট স্বভাব মু'মিনের মধ্যে থাকতে পারে না, কৃপণতা ও অসচ্চরিত্র।"[২০]

প্রকৃতপক্ষে আখলাকের মূলকথা হলো এক উন্নত ও চিরন্তন অবিনশ্বর সত্তা মহান আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর সন্তোষ অর্জন করার লক্ষ্যে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তাঁর (আল্লাহর) গুণে গুণান্বিত হওয়া। ইসলাম কেবল উত্তম চরিত্র গ্রহণের আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং নৈতিক চরিত্রের বিধিবিধান, রীতি-নীতি ও মৌল আদর্শ নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং তার উপরে সুদৃঢ় ও অবিচল থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। নৈতিক চরিত্র হারালে তার কী নির্মম পরিণতি হতে পারে সে ব্যাপারে মানুষকে সাবধান ও সতর্ক করে দিয়েছে।

সর্বোপরি, মানুষের মধ্যে নফস ও রূহের দ্বন্দ্ব চিরন্তন এবং ন্যায়-অন্যায়ের সঙ্ঘাত মানব হৃদয়ের চিরায়ত সংগ্রাম। নৈতিকতা মানুষকে এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে বিরত রাখে। যে মানুষ তার নৈতিকতার শক্তি দিয়ে নফস বা পশুশক্তিকে দমন করতে পারেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে

---

১৮ সুনান তিরমিযী, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা. নং ২০০৮।

১৯ মুসনাদে আহমাদ, খ. ২, পৃ. ৩৭৮, হা. নং ৮৯০৭।

২০ সুনান তিরমিযী, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.নং ১৯৬২।

আদর্শবান মানুষ। বর্তমানে এ ধরনের আদর্শবান মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। উপরন্তু আদর্শবান মানুষ সমাজে অবমূল্যায়িত হচ্ছেন। যে কারণে সমাজে অপরাধ প্রবণতার হার খুব দ্রুত গতিতে বাড়ছে।

মানবিকতা

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মসংযম– এই তিনটি গুণ মনুষ্যত্ব বা মানবতার শ্রেষ্ঠ প্রসূন। এখান থেকেই বিকশিত হয় মানবিকতা। সুনির্দিষ্ট আত্মিক ও সামাজিক প্রয়োজনে অনুশীলনলব্ধ বাঞ্ছিত মানব গুণই মানবিকতা। মানবিকতা এমনই এক গুণ যা মানুষের আবেগ-অনুভূতির আস্তরণে আবৃত– পরোপচিকীর্ষা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের অবসানে আন্তরিক প্রয়াস, সর্বোপরি বিশ্বজনীন মানব সভ্যতায় বিশ্বাস ও আস্থা। আবার স্নেহ-প্রীতি, ভালোবাসা, সৌজন্য-সহৃদয়তা, কৃপা-করুণা, দান-দাক্ষিণ্য, প্রতিবেশীর দু:খ-যন্ত্রণা এবং রোগে-শোকে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা, দুঃস্থ-রুগ্নের সেবায় আগ্রহ, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংযম-নির্লোভতা, মানবিক সাম্যে আস্থা, মৌল মানবাধিকারের স্বীকৃতি প্রভৃতি গুণাবলীও মানবিকতার নির্দেশক। আবার প্রচলিত শাস্ত্রিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধি-নিষেধের প্রতি আনুগত্য, যুক্তি-বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেকের প্রতি অনুগত থেকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, অন্যায়-অপকর্মের প্রতিবাদ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ প্রয়াস, পারিবারিক জীবনে আত্মীয়-স্বজন পরিজনের লালন-পালন ও পোষণে প্রত্যাশিত দায়িত্ব পালন, যে দুঃখ-যন্ত্রণা, বিপদ-ক্ষতি প্রভৃতি নিজের জন্য কাম্য নয়, তা অপরের জীবনেও কথায়-কাজে ঘটানোতে নিমিত্ত না হওয়া, শুধুই অন্যায় শাসন-শোষণ পীড়ন থেকেই নয়, অশিক্ষা ও অবিদ্যা, দারিদ্র্য, নিরাশ্রয়তা, রুগ্নতা, পঙ্গুতা, অপ্রীতি, স্বভাব-দ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা, ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতি সর্বপ্রকার যুলুম-নির্যাতন থেকে মানবমুক্তির ও নিরাপত্তার যৌক্তিকতা তথা ভাবনা-চিন্তা-কর্ম-আচরণে যথাশক্তি পরিব্যক্ত করাই হচ্ছে মানবিকতা। মৌলিক মানবীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষকে মানুষ বলা হয় এবং জন্তু-জানোয়ার থেকে তাকে আলাদা করা হয়। মানবিক মূল্যবোধের কারণেই মানুষকে অন্যান্য জীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক মূল্যবোধ

যে সমস্ত সামাজিক আদর্শ, বিশ্বাস, সাধারণ মানদণ্ড, ভালো-মন্দ নির্ধারণ ও প্রত্যাশিত কল্যাণ প্রবণতা সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করে সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে, ভাল কাজে উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজে বাঁধা দেয় সেই সমস্ত অমূর্ত (abstract) সামাজিক উপাদানের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।[২১] Francis E. Merrill বলেন, "A social value may be defined as a pattern of belief whose maintenance is

২১ সম্পা দাস, সমাজকর্ম : প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকা: বুক চয়েস- ২০০৫), পৃ. ১৩৭।

considered important to group welfare."[২২] অর্থাৎ সামাজিক মূল্যবোধ বলতে এমন এক ধরনের ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাসকে বুঝায় যেগুলো দলীয় বা সামষ্টিক কল্যাণের জন্য জনগণ কর্তৃক বিবেচনা করা হয়।

যে বিষয়গুলো কোনো সমাজকে সুস্থ, সুন্দর ও সম্প্রীতি ভিত্তিক মূল্যবান সোনালি সমাজে রূপান্তরিত করে, সে বিষয়গুলোর সক্রিয় চেতনাবোধকেই সামাজিক মূল্যবোধ বলা হয়। অর্থাৎ সর্বজন স্বীকৃত যেসব ভালো, উত্তম, সুন্দর, চমৎকার, শালীন, সৌহার্দপূর্ণ ও কল্যাণকর বিষয় কোনো সমাজকে কল্যাণময় সোনালি সমাজে পরিণত করে, সেগুলোর চর্চা ও সংরক্ষণের সক্রিয় চেতনাবোধকে সামাজিক মূল্যবোধ বলা হয়। সেই মূল্যবোধগুলোই হয়ে থাকে সেই সমাজের অলংকার ও মণিমুক্তা। মণিমুক্তাসম সেই মূল্যবোধগুলোর কয়েকটি হলো: মানবতাবোধ ও মানবিকতা; দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালোবাসা; হিতকামনা, পরোপকার, মানব কল্যাণ; পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শন; জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চার প্রবল আকাঙ্খা; সাহসিকতা ও বীরত্ব; কর্মোদ্দীপনা, কর্মকৌশল, কর্মদক্ষতা; শালীনতাবোধ ও শালীনতাচর্চা; ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায্যতাবোধ ও সুবিচার; সুস্থ ও সুষ্ঠু পারিবারিক বন্ধন; নীতিবোধ ও নৈতিকতার চর্চা ইত্যাদি।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে সমাজ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ সামাজিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হতে হয়। সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যেই নিহিত থাকে সমাজের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কিত ধারণা। মূল্যবোধের মধ্যে ব্যক্তিনিষ্ঠতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বর্তমান থাকে। তাই সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি, সামাজিক লক্ষ্য অর্জন, সামাজিক সংহতি সৃষ্টি, সামাজিক প্রয়োজন পূরণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার অন্যতম উপায় বলে বিবেচিত। সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমেই কোনো সমাজের সামাজিক প্রতিক্রিয়া পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক রীতিনীতির উচ্চতর মানদণ্ড হিসেবে সমাজের ভালো-মন্দ, প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত ও ন্যায়-অন্যায়ের নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে।[২৩] সামাজিক মূল্যবোধ একটি জাতির দীর্ঘ দিনের লালিত বিশ্বাস, চেতনা ও কাঙ্ক্ষিত আচরণের ফল।

সমাজ জীবনের সাথে ব্যক্তি জীবনকে যুক্ত ও সুসমন্বিত করার ব্যাপারে ইসলামের বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামী দর্শন মতে ব্যক্তি তার স্বীয় স্বার্থকে বৃহত্তম সমাজ কল্যাণের কাছে সর্মপণ করবে, আর সমাজকেও ব্যক্তির মূল্যবোধ ও নীতিবোধ বিকাশের দিকে নযর দিতে হবে। সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তিকে তাকিদ দেয় তার চারদিকের মানুষ ও

---

২২ Francis E. Merrill, *Analyzing Social Problems,* (New york: Nordskog and Others, 1950) p.13.

২৩ হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমদ ও অন্যান্য, ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ : তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ, বর্ষ ১ সংখ্যা ২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৬৮-৬৯।

সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ্‌কে খুঁজে পেতে। এতে ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সবরকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় এবং ব্যক্তির স্বার্থকে একাত্ম করে তোলা হয় সামাজিক কল্যাণের সাথে। ভ্রাতৃত্ব-সম্প্রীতি, মানবিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ-সহনশীলতা, সাম্য, সামাজিক সুবিচার, ন্যায়পরায়নতা ও সম্পদের সুষম বন্টন ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধের মৌলিক দিক। তবে সমাজভুক্ত মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির পরিবর্তন হলে সমাজও পরিবর্তন হয়। কিন্তু পরিবর্তনশীল সমাজ যদি সঠিক ও সুস্থ ধারায় পরিবর্তন না হয়ে অসুস্থ ধারায় পরিবর্তিত হয়, তখন দেখা দেয় সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং এর কুপ্রভাব সবক্ষেত্রে পড়তে বাধ্য।

উপসংহার

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও করণীয় ভুলে গিয়ে মানুষ দিশেহারা হয়ে দুর্বার গতিতে ছুটে চলছে বিভিন্ন মরীচিকাপূর্ণ ভ্রান্ত পথে। আত্মবিস্মৃত মানব উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রবঞ্চনার মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছে সুখ ও শান্তি। পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ইসলামকে ধ্যানে-জ্ঞানে ও মনে-প্রাণে গ্রহণ না করে বস্তুবাদ, ভোগবাদ ও দুনিয়াকে গ্রহণ করাই মানব জাতির বিভিন্ন সংকট, দুর্দশা, দুর্গতি, অশান্তি ও অকল্যাণের মূল কারণ। বর্তমান সংঙ্কটাপন্ন মানবজাতির এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা অনিস্বীকার্য। এর মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি মানুষের মাঝে সম্প্রীতি, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সংঘবদ্ধতা, পারস্পরিক দায়িত্ব, দায়বদ্ধতা ও সহাবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব। নৈতিক উন্নতি ছাড়া মানবজাতির সার্বিক মুক্তি, কল্যাণ ও উন্নয়ন অসম্ভব ব্যাপার। কারণ পশুর সাথে মানুষের যে কয়টি বিষয়ে পার্থক্য দৃশ্যমান সেগুলোর মধ্যে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা অন্যতম। পশুর জীবনাচারে নৈতিকতার বালাই নেই বলে তাদের মূল্যবোধও নেই। তা নিয়ে কেউ প্রশ্নও তোলে না। কারণ তাদের নৈতিকতাহীন জীবনাচার সমাজজীবনে কোনো প্রভাব ফেলে না। কিন্তু মানুষের নীতি-নৈতিকতাহীনতা ও মূল্যবোধহীনতা মানবসমাজকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। এমতাবস্থায় মুক্তি পেতে নৈতিকতার আকর ইসলামই চূড়ান্ত আশার আলো ও নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। কেননা একমাত্র ইসলামেই মানব জাতির ইহলৌকিক কল্যাণ, পারলৌকিক মুক্তি এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার অতি চমৎকার দিকনির্দেশনা রয়েছে। সমাজে মূল্যবোধের বিকাশ তথা মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণের জন্যই পৃথিবীতে ইসলামের অভ্যুদয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবজীবনের উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতন সব কিছুই তার মানসিক বিকাশ ও নৈতিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল। ইসলামী মূল্যবোধে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ-অকল্যাণ এক সূত্রে গাঁথা। এজন্যেই ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ স্বার্থেই নৈতিক স্খলন ও অপরাধমুক্ত থাকতে সচেষ্ট হয়। ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ ও শান্তিময় পরিবেশ বিরাজ করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

প্রতারণা প্রতিরোধে ইসলাম

মোঃ হাফিজুর রহমান*

[Abstract: Cheating is a crime that destroys people. Islam and any other human religion does not support deception and fraud. Fraud is the act of obtaining one's interests based on evasion or deceit while keeping the true situation hidden. In today's society, new tricks of cheating are being caught. If we try to implement Islamic law in this society of humanity, fraud will be reduced to a great extent. Different types of fraud in today's society are highlighted in this article. For example: In the case of worship, education, treatment or in the case of trade and transactions, the issue of cheating has been highlighted. In today's world, lying, perjury and understatement have become the nature of traders. Concealing the true condition of goods in business and even acting to increase the price is a major fraud, as clarified in the Qur'an, Hadith and Islamic scholars. Today, people are trying to attract people's attention with attractive posters and advertisements without fixing the quality of the product, which is a fraud. In today's society, the fact that cheating has become easier through technology than in other areas is highlighted in the article. Hence deception destroys human humanity. The deceiver gradually turns away from the path of Allah and the Messenger and is humiliated in society. There will be no success in this present welfare and hereafter liberation of the deceiver which is clarified in the article. Therefore, I hope that the essay on Islam to prevent fraud will play an important role in this regard. Even if I put a small role in this matter in this article, my effort will be worthwhile. Amen.]

ভূমিকা

প্রতারণা মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূপ। প্রতারণা এমন একটি অপরাধ যা দ্বারা মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। হারিয়ে যায় হৃদয় থেকে মহান আল্লাহর ভয়। মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে প্রতারণার শিকার হচ্ছে। প্রতারণার সুনির্দিষ্ট কোন মাত্রা বা ক্ষেত্র নেই। কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদেশ গমন, এমনকি আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রেও মানুষ প্রতারণা করছে এবং প্রতারিত হচ্ছে। এছাড়াও মিথ্যা বলা, আমানতের খেয়ানত করা,পণ্য-দ্রব্যে ভেজাল ও দোষ-ত্রুটি গোপন করা, লটারীর মাধ্যমে প্রতারণা, খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন মেশানো, জাল টাকার প্রচলন, ওজনে কম দেয়া, ভাল জিনিসের সাথে খারাপ জিনিস মেশানো, মিথ্যা শপথ ও সাক্ষ্য দেয়া, অন্যের হক নষ্ট করা, শিক্ষাক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বনে সচেষ্ট হওয়া, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষকে ঠকানো এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দ্বারা মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে।

* এমফিল গবেষক, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

যা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিস্তার লাভ করেছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র ও অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে সর্বত্র। দেশ ও জাতির কল্যাণে এ পরিস্থিতির অবসান একান্ত জরুরী। কতিপয় প্রতারক ব্যক্তির প্রতারণার কারণে গোটা জাতি প্রতারিত হবে এটা কারো কাম্য নয়। তবে এরূপ সংকটজনক অবস্থা থেকে ধর্মীয় অনুভূতিই পারে মানুষকে বিরত রাখতে। কেননা ইসলাম ধর্ম ও বাকী মানবিক কোন ধর্মই ধোঁকা ও প্রতারণাকে সমর্থন করে না বরং ইসলাম ধোঁকা ও প্রতারণার মত অপরাধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে কুরআন ও হাদীসে প্রতারণার খারাপ দিক সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে এবং এ থেকে বাঁচার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যা অনুসরনের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র হতে এ জঘন্য অপরাধ দুরীভূত সম্ভব। সমাজকে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় প্রতারণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য এ সম্পর্কে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা জানা ও প্রতিপালন একান্ত প্রয়োজন। এ দিক-নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ থেকে ধোঁকা ও প্রতারণা দূর করা সম্ভব।

প্রতারণা কী?

প্রতারণার আরবী প্রতিশব্দ হলো غش।[১] যার অর্থ ধোঁকা দেয়া, প্রবঞ্চনা, নকল, জাল ভেজাল, বঞ্চনা, ছলনা, জুয়াচুরি ঠকামি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করা। সত্যের বিপরীতই হলো প্রতারণা। যে প্রতারণা করে তাকে বলা হয় প্রতারক, প্রবঞ্চক, প্রতারণাকারী, ইত্যাদি। ইংরেজিতে প্রতারণার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, Cheat, Deception, bamboozle, befool, cozen, cheating.[২] প্রতারককে ব্রিটিশ ইংরেজিতে "cheat" এবং আমেরিকান ইংরেজিতে "cheater" বলা হয়।

"প্রতারণা হচ্ছে অসদুপায় অবলম্বন করে কোন কিছু সমাধানের সক্ষমতার কারণে পুরস্কার গ্রহণ করা। সাধারণত প্রতারণা করা হয় আইন অমান্য করে, যাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে অসম সুবিধা পাওয়া যায়। এর বিশদ সংজ্ঞার পরিধিতে ঘুষ, ক্রোনিজম, নেপোটিজম, স্লিইজ এবং অন্য যে কোন পরিস্থিতি যেখানে অবৈধভাবে অন্যকে সুযোগ দেয়া হয় ইত্যাদি সবকিছুই যুক্ত।[৩]

"প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার উপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলে" الغش বা প্রতারণা হলো প্রত্যেক সেই বস্তু বা কাজ যা মূলের বিপরীত। বর্তমান সমাজে শুধুমাত্র লেন-দেনের ক্ষেত্রে প্রতারণার বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়েই প্রতারণার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি রয়েছে।

---

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, পঞ্চদশ সংস্করণ (রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা), পৃ. ৫৩৫।

২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, বাংলা-ইংরেজি-আরবী, অষ্টম সংস্করণ (রিয়াদ প্রকাশকনী, ঢাকা), পৃ. ৪৫১।

৩. *California State University, East Bay." Csuh.iii.com.* সংগ্রহের তারিখ : ২০১৩-০৭-২১

বর্তমান সমাজে প্রতারণার ধরন

প্রতারকদের নিত্য-নতুন কৌশলে ধরাশায়ী হচ্ছে আজকের সমাজ। সমাজে প্রতারককে খুঁজে বের করা খুব কঠিন কাজ। আবার খুঁজে বের করলেও শাস্তির আওতায় আনা সুকঠিন। সেক্ষেত্রে সমাজ সচেতন হলে প্রতারক তার অভ্যাস পরিবর্তন করতে এক পর্যায়ে বাধ্য হবে। প্রতারণার ভয়াবহতা ক্রমান্বয়ে মানবজীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলছে প্রতিনিয়ত। তাছাড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতারণার করাল গ্রাস থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হচ্ছে না বরং প্রতারণার আধিক্য ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। মানবতার এ সমাজে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হলে প্রতারণা অনেকাংশেই কমে যাবে। মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রতারণার বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতি উল্লেখপূর্বক এ প্রসঙ্গে ইসলামের সুনির্দিষ্ট দিন-নির্দেশনা উল্লেখ করা হলো :

১. 'ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতারণা

আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতের ক্ষেত্রেও মানুষ প্রতারণা করছে। অথচ আল্লাহপাকই মানুষকে জীবন দান করেছেন। মানুষের জীবনধারণ ও কল্যাণের জন্য অন্যান্য মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। তাই একক ইলাহ্ হিসেবে মানুষের 'ইবাদত পাবার হক্বদার এককভাবে আল্লাহ তা'আলা। এটি মানুষের প্রতি আল্লাহর অধিকার। আর অধিকারে অন্য কাউকে অংশীদার করাই হলো শিরক। আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তাঁর 'ইবাদত করতে বলেছেন এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا

"আর তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত কর, তাঁর সাথে অন্য কিছুর শিরক করো না"।[৪]

একই মর্মে হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"।[৫]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ

"আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, অতএব আমার 'ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর "।[৬] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "মহানবী (সা) হযরত মু'আয (রা)

৪. আল কুরআন, ৪: ৩৬।

৫. ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ১ম খন্ড (দিল্লী : কুতুবখানা রশিদিয়া, তা.বি.), পৃ. নং ৪৪।

৬. আল কুরআন, ২০:১৪।

কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান আল্লাহর প্রতি বান্দার হক্ব কি এবং বান্দার প্রতি আল্লাহর হক্ব কি ? হযরত মু'আয (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা) এ ব্যাপারে ভালো জানেন। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহর প্রতি বান্দার হক্ব হচ্ছে তারা তাঁর 'ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর বান্দার প্রতি আল্লাহর হক্ব হচ্ছে, যারা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না তাদের তিনি ক্ষমা করে দিবেন "।[৭]

বর্তমান সমাজে শিরকের আধিক্য বৃদ্ধি পেয়েছে; বিশেষ করে লোক দেখানো 'ইবাদতের মাধ্যমে। যা শিরকে আসগর হিসেবে পরিগণিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا .

"আর যখন তাঁরা সালাতে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে"।[৮]

তাই এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, মহান আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত হবে একনিষ্ঠ। কিন্তু মানুষ অজ্ঞতাবশত বা জেনে শুনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে খুশি করার মাধ্যমে নিজেকে প্রতারিত করছে।

যারা 'ইবাদতের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতারিত করছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾

"আল্লাহ্ এবং মু'মিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা নিজেরা ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করেনা, এটা তারা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যধি রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যধি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী"।[৯]

ইবনে জুরায়েজ বলেন- মুনাফিকের কথা ও কাজ পরস্পর বিরোধী। তার বাহিরের সাথে ভেতরের কোন মিল নেই। সে মুখে এক রূপ, মনে অন্য রূপ। তার প্রকাশ্য দিক ও অপ্রকাশ্য দিক বিপরীতমুখী। সুতরাং মানবজাতির উচিত লোক দেখানো 'ইবাদত পরিত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 'ইবাদত করা, প্রতারণা করা নয়।

---

৭. সহীহ মুসলিম, প্রগুক্ত পৃ. নং-৪৪।

৮. আল কুরআন, ৪ : ১৪২।

৯. আল কুরআন, ২:১০।

২. বিবাহের ক্ষেত্রে প্রতারণা

বর্তমান সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন, এক মেয়েকে দেখিয়ে অন্য মেয়ের বিবাহ দেয়া, মেয়ের দোষ-ত্রুটি ও পারিবারিক অবস্থা গোপন করা, ছেলের পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থা গোপন করা, ছেলের পেশা সম্পর্কে আসল তথ্য না দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা ইত্যাদি। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পাত্রীকে দেখতে চাওয়া হলে পরিবারের পক্ষ থেকে সাজসজ্জার বাহুল্য করে তার আসল রূপকে ঢেকে রাখা হয়। যা হয়তো এক সপ্তাহ অতিবাহিত হবার পরেই সেটা প্রকাশ হয়ে যায়। এ ধরনের কৌশল প্রতারণার একটি বড় ফাঁদ। মানুষ এর পরিণতির কথা একেবারেই ভুলে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রতারণা বিবাহের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে।

অথচ বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর সাক্ষাৎকে উৎসাহিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ.

"আর তোমরা মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভাল লাগে তাদেরকে বিবাহ কর"।[১০]

এ আয়াতে সুস্পষ্ট যে, বিবাহের পূর্বে কন্যাকে দেখে নেয়া বৈধ। রাসূল (সা) বিয়ের পূর্বে মেয়ে দেখার তাগিদ প্রদান করেছেন।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

"আমি রাসূল (সা) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় রাসূল (সা) এর কাছে এক ব্যক্তি এলো। সে আনসার বংশের এক মহিলাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত রাসূল (সা) কে জানালো। তখন রাসূল (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে দেখেছ? লোকটি বলল, না। রাসূল (সা) তখন তাকে বললেন, এখনই যাও এবং তাকে দেখে নাও। কেননা আনসার বংশের মেয়েদের চোখে কিছু একটা (ত্রুটি) থাকে।[১১]

এ হাদীস দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েকে দেখবে আর মেয়েও ছেলেকে দেখবে যেখানে কোন ধরনের প্রতারণার স্বীকার হতে হবে না।

---

১০. আল কুরআন, ৪:৩।

১১. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত পৃ. নং- ৪৫৬।

৩. দাম্পত্য জীবনে প্রতারণা

দাম্পত্য জীবন বলতে সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বুঝায়। এ সম্পর্ক শুরু হয় বিবাহের মাধ্যমে। দাম্পত্য জীবন হতে পারে সুখময় জীবন, যদি সেখানে থাকে সততা ও সত্যবাদিতা। বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি আইনগত ও ধর্মীয় চুক্তিই শুধু নয়, দুটি জীবনের পূর্ণতা। এ চুক্তির অন্যতম শর্ত হলো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে যে বিষয়টি অধিকহারে দৃষ্টিগোচর হয় তা হলো বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর অন্যতম কারণ পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকা ও চাহিদা পূরণ না করা। অথচ ইসলাম তাদের এরূপ আচরণকে সমর্থন করে না।

বরং স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ আর তোমরাও তাদের ভূষণ"।[১২]

ইবনে আব্বাস (রা) হতে আওফী বর্ণনা করেছেন- জাহেলী যুগে মদিনাবাসীদের প্রথা ছিল, যখন কোন ব্যক্তি মারা যেত তখন তার কোন বন্ধু এসে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর উপর কাপড় নিক্ষেপ করত। ফলে সে এককভাবে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে বিয়ে করা বা না করার অধিকারী হয়ে যেত। অন্য কেউ মৃতব্যক্তির স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারত না। এবং যতদিন পর্যন্ত সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী মৃত ব্যক্তির বন্ধুকে মুক্তিপণমূলক কিছু অর্থ-সম্পদ না দিত ততদিন পর্যন্ত সে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে আবদ্ধ করে রাখত।[১৩]

মহান আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবন- যাপন করবে"।[১৪]

এ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন-

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ

১২. আল কুরআন, ২:১৮৭।

১৩. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (রঃ), তাফসীর ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন),পৃ. নং -৭৭৭।

১৪. আল কুরআন, ৪:১৯।

"স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহর উপর ভরসা করেই তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহ্‌র কালেমা দ্বারাই তোমরা তাদের থেকে দাম্পত্য অধিকার লাভ করেছ" ।[১৫]

স্বামীর দায়িত্ব যেমন স্ত্রীর সার্বিক চাহিদা পূরণ করা তেমনি স্ত্রীরও দায়িত্ব স্বামীর আনুগত্য করা, তাকে মেনে চলা ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। একে অপরকে বিশ্বাস করে নির্ভরশীল হওয়া।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন-

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ

"অতএব নেককার নারীরা অনুগত হয় এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে নিজেদের সংরক্ষণ করে" ।[১৬]

রাসূল (সা) বলেছেন :

لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

"আমি যদি (আল্লাহ ব্যতীত অন্য) কাউকে সেজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে নারীদেরকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সেজদা করার জন্য " ।[১৭]

উক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের প্রতি দায়িত্বশীল। এবং পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সঠিকভাবে যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করলেই কেবল দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে সফলতা আসবে। অন্যথায় ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে একজন অন্যজনের অধিকার খর্ব করলে উভয়কেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সেক্ষেত্রে না হবে ইহকালীন কল্যাণ আর না হবে পরকালীন মুক্তি। সুতরাং দাম্পত্য সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী বৈধ সম্পর্ক। দাম্পত্য সম্পর্ক নারী-পুরুষের জীবন ও ধর্মকে পরিপূর্ণতা দান করে। দাম্পত্য জীবনের একে অন্যকে বোঝার মাধ্যমে নারী-পুরুষ সর্বোচ্চ সুখী জীবন যাপন করে। তাই পরকীয়া বা ক্ষণস্থায়ী অবৈধ সম্পর্কের প্রতি আকর্ষণ পরিহার করে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যথাযথ দায়িত্ব কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে সুখী জীবন-যাপন ও পরকালীন মুক্তি লাভ করাই সকলের কাম্য। তারাই হবে সফল মানুষ এবং এর মাধ্যেই ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি মানুষের জন্য নিশ্চিত রয়েছে।

---

১৫. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত পৃ. নং-৩০০৯।

১৬. আল কুরআন, ৪:৩৪।

১৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ আল কাযভীন, সুনান ইবনে মাযাহ, (ভারত, কলিকাতা, তা.বি.), পৃ. নং- ৫৯৫।

৪. স্ত্রীর মোহর আদায়ে প্রতারণা

মোহর হলো সেই সম্পদ ইসলামী শরিয়তের বিধান অনুসারে স্বামী তার স্ত্রীকে যে সম্পদ নগদ প্রদান করে বা পরবর্তী সময়ে স্বামী তার স্ত্রীকে প্রদান করবে বলে অঙ্গীকার করে।

মোহর স্ত্রীর জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে নির্ধারিত একটি বিশেষ অধিকার। আর মোহর আদায়ের ক্ষেত্রে এটাই আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে এক নির্ধারিত সীমারেখা।

আল্লাহ্পাক মোহর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন-

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

"বিয়ের মাধ্যমে যে নারীরা তোমাদের জন্য হালাল হবে তাদেরকে নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও। মোহর ধার্য্য করার পর তোমরা স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে যদি এর পরিমাণ কমবেশী করে নাও, তাতে দোষের কিছু নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ হলেন সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়"।[১৮]

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মোহরের বিনিময়েই স্ত্রীর উপর স্বামী অধিকার লাভ করে থাকে এবং মোহর পরিশোধ করা স্বামীর জন্য ফরয। এ অধিকার আদায়ের সর্বোত্তম পন্থা হলো বিবাহের পর দাম্পত্য সম্পর্ক শুরুর পূর্বেই স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয়। যদি কোন কারণে তৎক্ষণাৎ আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে বিলম্বে আদায় করবে তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু বর্তমান সমাজে অধিকাংশ পুরুষ বিবাহের পর স্ত্রীর মোহর আদায়ে অনীহা প্রকাশ করে। যা সরাসরি প্রতারণা। কারণ মোহর হচ্ছে একটি অঙ্গীকার যা আদায়ের মাধ্যমে পূরণ হয়। আর এ আদায়ের মাধ্যমে স্ত্রী তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পায়।

হাদীসে আছে, এক নিঃসম্বল সাহাবী এক নারীকে বিবাহ করতে চাইলে রাসূল (সা) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

هل عندك من شئ قال لا قال ذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القران شيئ قال معى سورة كذا قال اذهب فقد انكحتكها بما معك من القران.

"তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর দিল, না। রাসূল (সা) বললেন, যাও খুঁজে দেখ, কিছু যোগাড় করতে পার কিনা, তা লোহার একটি আংটি হলেও। লোকটি গেল, খোঁজ করল এবং ফিরে এসে বলল, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না। এমনকি একটি লোহার

১৮. আল কুরআন, ৪:২৪।

আংটিও নয়। রাসূল (সা) বললেন, তুমি কি কুরআনের কিছু মুখস্থ জানো? সে উত্তরে বলল, আমি অমুক অমুক সূরা মুখস্থ জানি। রাসূল (সা) বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ জান তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম "।[১৯]

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا.

"আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। পরে তারা খুশি মনে এর কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা সানন্দে ভোগ করতে পার "।[২০] এ আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, স্ত্রী ইচ্ছা করলে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু যদি স্ত্রী তা না করে এবং মোহর পরিশোধ করার পূর্বে স্বামীর মৃত্যু ঘটে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে। তাই মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামীদের সতর্ক ভূমিকা পালন করা উচিত।

মোহর আদায় করা প্রসঙ্গে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন-

احق ما اوفيتم من الشروط ان تولوا به ما استحللتم به الفروج

"সব শর্তের মধ্যে যে শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য তা হল, যে শর্ত দ্বারা তোমরা নারীদের বিশেষ অঙ্গ উপভোগ করা বৈধ করে থাক"।[২১]

রাসূল (সা) আরও বলেছেন-

من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوى ادائه فهو زان

"যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মোহর ধার্য করে কোন মেয়েকে বিয়ে করে আর মনে মনে নিয়ত করে যে, এটা আদায় করবে না, তবে সে একজন ব্যভিচারী "।[২২]

সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, স্বামীর নিকট থেকে মোহর পাওয়া স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার। আর এ অধিকার আদায় না করা স্ত্রীর সাথে এক বড় ধরনের প্রতারণা করা।

৫. শিক্ষাদানে প্রতারণা

শিক্ষাই পারে মানুষকে অন্ধাকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। আর এ কাজে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি হচ্ছেন শিক্ষক। বর্তমান সময়ে শিক্ষকরা ক্লাসে পাঠদানের

১৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, খ. ৫, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), পৃ. ৬৪।

২০. আল কুরআন, ৪:৪।

২১. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত পৃ. নং- ৬৯।

২২. হাফিয আবদুল আযীয, আল মুনযিরী, আততারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ৩, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ), পৃ. ৩৩৬।

চেয়ে প্রাইভেট পড়াতে বেশী পছন্দ করে। এর অন্যতম কারণ নৈতিকতাবোধের অভাব। তারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রতারক বলা যেতে পারে। আর এ ধরনের শিক্ষকদের জন্য সমাজ ধীরে ধীরে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ছে। অথচ আল-কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালা শিক্ষার প্রতি তাগিদ দিয়ে মানবজাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۔

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"।[২৩]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন-

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوْنَ ۔

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তেলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়"।[২৪]

এছাড়াও রাসূল (সা) বলেছেন - إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"[২৫]

তিনি আরও বলেছেন- بُعِثْتُ لأتمم مكارمَ الأخلاقِ "আমি সচ্চরিত্রকে পরিপূর্ণতা দান করতে প্রেরিত হয়েছি।"[২৬]

উক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীস সমূহ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা) কে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাই বর্তমান আধুনিক যুগের শিক্ষকদেরও রাসূল (সা) এর মত সৎ, আদর্শবান, সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে। তাহলেই ছাত্রসমাজ প্রতারণার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং দেশ ও জাতি সমৃদ্ধশালী হবে শিক্ষার মাধ্যমে। আর যদি শিক্ষক সমাজ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে

২৩. আল কুরআন, ৯৬:১।

২৪. আল কুরআন, ২:১৫১।

২৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ আল্ কাযভীন, সুনান ইবনে মাজাহ, (কায়রো, দারু ইহয়া আল কুতুব আল্-আরাবিয়া, ১৯১৮)

২৬. আবু আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস, মু'আত্তা মালিক, (কায়রো, দারু ইহয়াউ আল্-কুতুব আল-আরাবিয়া, তা.বি) পৃ. নং- ৮।

ব্যর্থ হয় তাহলে তাদেরকে প্রতারণার দায়ভার মাথায় নিয়ে ইহকাল ও পরকালীন জীবনে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৬. ব্যবসা-বাণিজ্যে ও লেন-দেনে প্রতারণা

মহান আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। আল কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত জীবিকার্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ব্যবসা। ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি যত বেশি মনোযোগী হয় অর্থনৈতিকভাবে সেই জাতি তত বেশি সফলতা, সমৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছেন। তবে প্রকৃত সফলতা অর্জনের মূল শর্ত বৈধ ব্যবসা।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .

"আল্লাহ্ ব্যবসাকে করেছেন হালাল ও সুদকে করেছেন হারাম"।[২৭]

রাসূল (সা) বলেছেন-

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

"সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী হাশরের ময়দানে নবী, সত্যবাদী ও শহীদগণের সাথী হবেন"।[২৮]

উক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে বলা যায় নিঃসন্দেহে ব্যবসা একটি মানবকল্যাণমূলক উত্তম পেশা। কিন্তু বর্তমান সমাজে ব্যবসা প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে নিজের কল্যাণকামিতা হারিয়ে মানবজাতির জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ মুনাফালোভী ব্যবসায়ী এমন সব জঘন্য ও ঘৃণিত প্রতারণার সাথে জড়িত যা ইসলামের দৃষ্টিতে একেবারেই অবৈধ। যাদের সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে বড় পাপী হিসেবে উঠানো হবে, তবে সে সব ব্যবসায়ীকে নয়, যাঁরা আল্লাহ্কে ভয় করে, সৎভাবে লেনদেন করে, সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে।[২৯]

এই হাদীসের আলোকে বলা যায়, অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনাকারী পাপী, আর পাপীর স্থান জাহান্নাম। ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণা এবং এর শাস্তি সম্পর্কে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

---

২৭. আল কুরআন, ২:২৭৫।

২৮. আবু আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস, মু'আত্তা মালিক, (কায়রো, দারু ইহয়াউ আল্-কুতুব আল-আরাবিয়া, তা.বি) পৃ. নং- ৮।

২৯. আল জামে আত তিরমিযী, প্রাগুক্ত পৃ. নং - ৪৮৯।

৬.১. মিথ্যা বলা

অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। মৃত প্রাণীকে জীবিত হিসেবে বিক্রয় করা এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে। স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানেও এরূপ চিত্র চোখে পড়ে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের জন্য মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ হারাম ঘোষণা করে বলেছেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ.

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের মাংস"।[৩০]

উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ অমান্য করে যারা মৃত প্রাণী জীবিত বলে বিক্রি করছে তারা জনগণের সাথে প্রতারণা করছে। মিথ্যা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ওয়াছিলাহ ইবনে আসকা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَيْنَا، وَكُنَّا تُجَّارًا وَكَانَ يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ.

রাসূল (সা) বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন, আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী, তিনি বলছিলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! মিথ্যাকে ভয় কর।[৩১] সুতরাং মিথ্যা সকল পাপের মূল। আর সে মিথ্যা যদি হয় ব্যবসার ক্ষেত্রে তাহলে মানবজাতির প্রতি যুলুম ও নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। তাই সকল ক্ষেত্রে মিথ্যা থেকে বিরত থাকা সকলের কর্তব্য। তাছাড়াও ব্যবসাতে আল্লাহ্ পাক যেমন বরকত দিয়েছেন তেমন প্রতারক ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে তেমন অভিশাপ দিয়েছেন।

৬.২. মিথ্যা শপথ করা

মিথ্যা সকল পাপের মূল এ কথা জানা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা পণ্য বিক্রয়ের জন্য শুধু মিথ্যাই বলে না বরং মিথ্যা শপথ করে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন-

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

৩০. আল কুরআন, ৫:৩।

৩১. ইমাম তাবরানী, আল মুজামুল কাবীর, তাহকীক: হামদী ইবনি আব্দুল মাজীদ আস-সালাফী, (আল-মুসিল: মাকতাবাতুল উরুম ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩), পৃ. ১৩২।

"তিন সম্প্রদায়ের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না। তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। রাসূল (সা) এটিকে তিনবার করে বললেন। আবু যর (রা) বললেন, তারা ব্যর্থ, তারা ক্ষতিগ্রস্থ। হে আল্লাহর রাসূল তারা কারা? তিনি বললেন, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, অনুগ্রহ করে খোটা দানকারী ও মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য বিক্রয়কারী "।[৩২]

অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছে,

أَنَّ أَبَـا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ : (الحلف منفقة للسلعة' ممحقة للبركة.

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, শপথ পণ্যদ্রব্যকে চালু করে বটে; কিন্তু উপার্জনের বরকত নষ্ট করে দেয় "।[৩৩]

তাই পণ্যের বরকত রক্ষা করে তাকে মানব কল্যাণমূলক করার লক্ষ্যে ব্যবসার ক্ষেত্রে মিথ্যা শপথ থেকে বিরত থাকাই সকলের জন্য মঙ্গলজনক। অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে জনগণের সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে।

৬.৩. ওযনে কম দেয়া

ওযনে কম দেয়া কতিপয় ব্যবসায়ীদের স্বভাবে পরিনত হয়েছে। অনেক ব্যবসায়ী এমন আছে নিজে পণ্য ক্রয়ের সময় সঠিক মাত্রায় গ্রহণ করে কিন্তু বিক্রির সময় ওযনে কম দেয়, এটি একটি মারাত্মক প্রতারণা।

পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ،

"ওযনের ন্যায্যমান প্রতিষ্ঠিত কর ও ওযনে কম দিওনা"।[৩৪]

এমনও কিছু ব্যবসায়ী আছে ওযন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাড়িপাল্লার যে অংশে পণ্য তোলা হয় সে অংশের নীচে অন্য কোন বস্তু লাগানো থাকে, যা ক্রেতার দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাটখারার গায়ে লেখা ওযনের সাথে প্রকৃত ওযনের সামঞ্জস্য থাকে না। ওযনে কম দিয়ে প্রতারণা ইসলামে সরাসরি নিষিদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

---

৩২. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা নং- ৪৫৯।

৩৩. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা নং- ৬৮।

৩৪. আল কুরআন, ৫৫:৯।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ١ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ٢ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ٣ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ٥ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٦

"ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি দৃঢ় বিশ্বাস করে না যে, নিশ্চয় তারা পুনরুত্থিত হবে, এক মহা দিবসে? যেদিন মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের জন্য দাঁড়াবে"।[৩৫]

পবিত্র কুর'আনের উক্ত আয়াতগুলিতে ওযনে কম দিয়ে ক্রেতার সাথে প্রতারণার সাথে সাথে ওযনে বেশি নিয়ে বিক্রেতার সাথে প্রতারণাকেও কঠোর ভাষায় নিন্দা জানানো হয়েছে এবং তাদের ধ্বংস যে অনিবার্য তার ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে। ওযনের ক্ষেত্রে বর্তমানে আর এক ধরনের প্রতারণা লক্ষ্য করা যায় তাহলো বিক্রয়ের পূর্বেই পণ্যের সাথে বা পেটে (যদি প্রাণী হয়) পাথর বা খাবার জাতীয় উপাদান ঢুকিয়ে ওযন বৃদ্ধি করা হয়। যেমন, চালের মধ্যে সাদা পাথর মেশানো, ইলিশ মাছের পেটে জালের কাঠি, মুরগী বিক্রির আগে অতিরিক্ত চাল বা আটা খাওয়ানো ইত্যাদি। এর ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে।

৬.৪. পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক ধরনের মারাত্মক প্রতারণা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় আর তাহলো পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা। ইসলামে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা বা প্রকাশ না করা মারাত্মক অপরাধ। রাসূল (সা) এর সময়েও এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল।

এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন-

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

"একদা রাসূল (সা) একস্তুপ খাদ্যের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। হঠাৎ তিনি হাতটি খাদ্যের স্তুপের মাঝে প্রবেশ করালেন এবং ভেজা বা আদ্রতা অনুভব করলেন (অথচ খাদ্যের স্তুপটি ওপর থেকে শুষ্ক দেখাচ্ছিল)। অতঃপর বললেন, হে খাদ্যের মালিক, এমনটি কেন? মালিক বললো বৃষ্টির পানিতে এমন হয়েছে (আসলে ব্যাপারটি এমন ছিল না, মালিক মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল)। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়"।[৩৬]

---

৩৫. আল কুরআন, ৮৩:১-৬।

৩৬. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ৭০।

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দোষ-ত্রুটি গোপন করার অপরাধ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন, "যখন কোন দুই ব্যক্তি স্বচ্ছতা ও সত্যবাদিতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করলো তখন তাদের এ কাজের মধ্যে কল্যাণ দান করা হয়। আর যদি বিক্রিত বস্তুও দোষ-ত্রুটি গোপন করে তবে তাদের সেই বেচা-কেনার বরকত উঠিয়ে দেয়া হয়"।[৩৭]

সূতরাং উক্ত হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করলে যা স্পষ্ট হয় তাহলো বস্তুর ত্রুটি গোপন করাই প্রতারণা বা বঞ্চনা।

৬.৫. মূল্য বৃদ্ধির জন্য ক্রয়ের অভিনয়

কতিপয় ব্যবসায়ী এমন আছে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য এমন কিছু লোককে নির্ধারিত করে রাখে যারা প্রকৃত ক্রেতা নয়। যখন প্রকৃত ক্রেতা কোন পণ্য পছন্দ করে দরদাম করতে থাকে তখন এ সকল নকল ক্রেতা সেই পণ্যটি কেনার প্রতি খুব আগ্রহ দেখায়, এর ফলে প্রকৃত ক্রেতা পছন্দের পণ্যটি হাতছাড়া হবার ভয়ে অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করে প্রতারিত হয়। যা একটি বড় ধরনের প্রতারণা ও ইসলামের দৃষ্টিতে একটি মারাত্মক অপরাধ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النجش.

"ইবনে উমর (রা) বলেছেন, রাসূল (সা) মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রয়ের অভিনয়কে নিষেধ করেছেন"।[৩৮]

৬.৬. আকর্ষণীয় **পোষ্টার ও বিজ্ঞাপন**

পন্যের গুণগত মান ঠিক না রেখে অনেক ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় পোষ্টার ও বিজ্ঞাপন প্রচার করে, যা ক্রেতাকে ধোঁকার মধ্যে নিমজ্জিত করে। আকর্ষণীয় পোষ্টার ও বিজ্ঞাপনের সাথে পণ্যের সঠিক মিল পাওয়া যায় না। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইসলামে স্বীকৃত নয়। ইসলাম এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় কোনভাবেই অনুমতি দেয় না। এটি সাধারণ মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। কারণ জনগণ আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন বা পোষ্টার দেখে পণ্যের গুণগত মান ভাল হবে এরূপ বিশ্বাস নিয়েই পণ্য ক্রয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষিত হয়।

৬.৭. অবৈধ দালালী

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবৈধ দালালীর দৌরাত্ম ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। সমাজে এর আধিক্য এত বেশি যে, সাধারণ মানুষ চরমভাবে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার শিকার হচ্ছে। একই ব্যক্তি কর্তৃক ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষে দালালী করে তাদের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণ করাই অবৈধ দালালী। আর যে এভাবে দালালীর চক্রে

---

৩৭. সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬।

৩৮. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা নং ৭০।

পড়ে তার বড় ধরনের ক্ষতি বা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াটা স্বাভাবিক। আর এটি ইসলাম সম্মত নয়।

রাসূল (সা) বলেছেন- وَلَا تَنَاجَشُوا "তোমরা দালালী করো না"[৩৯]

সুতরাং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী, জমি, ঘর-বাড়ি, গরু-ছাগল, বেচা-কেনা, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ, বদলী, প্রমোশন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবৈধ দালালী প্রতিরোধ করা সম্ভব হলে সাধারণ জনগণ প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাবে। এ ধরনের যুলুম থেকে বাঁচবে মানব সমাজ।

৭. পণ্যে ভেজাল মিশ্রণ

অধিক মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় মানুষ বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে শঠতা, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করছে। যেমন: হলুদ ও মরিচের গুড়ার সাথে ইটের গুড়ার মিশ্রণ ঘটাচ্ছে, পচনশীল খাবারে জীবনহানিকর ফরমালিন ও কার্বাইড মিশাচ্ছে, বিদেশী পণ্যের মোড়কে দেশে তৈরী নিম্নমানের পণ্য ঢেলে অধিক দামে বিদেশী পণ্য হিসেবে বিক্রি করছে। এতে ক্রেতারা প্রতারিত ও জুলুমের শিকার হচ্ছে। পণ্যে ভেজালের আধিক্য সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় ক্রেতারা বাধ্য হচ্ছে উপার্জিত কষ্টের টাকায় ভেজাল পণ্য ক্রয় করতে। এ বিষয়গুলো জেনে শুনেও সাধারণ মানুষ এগুলো নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে।

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

"তোমরা বাতিল উপায়ে অন্যের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করো না"।[৪০]

পণ্যে ভেজাল মেশানো হলো ক্রেতার সাথে বিক্রেতার বিশ্বাসঘাতকতা করা। রাসূল (সা) বলেছেন,

"এর চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কিছুই নেই যে, তুমি এমন ব্যক্তির সাথে মিথ্যার আশ্রয় নেবে যে, তোমাকে বিশ্বাস করে"।[৪১]

সুতরাং বলা যায়, পণ্যদ্রব্যে ভেজালের আধিক্যের কারণে জীবন রক্ষাকারী খাদ্য এখন জীবন হানিকারক হয়ে পড়েছে। তাই ইসলাম খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

---

৩৯. সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা নং ৭৪।

৪০. আল কুরআন, ৪:২৯।

৪১. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আল আশ-আস আল-আজদী আস-সিজিস্তানি, সুনান আবু দাউদ, খ. ৩, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ),পৃ. ৭৫।

৮. তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতারণা

বর্তমান সমাজে অন্যান্য ক্ষেত্র গুলোর চেয়ে প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতারণা সহজসাধ্য হয়ে পড়েছে। তথ্য প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভিন্নরকম প্রতারণার ফাঁদে ফেলে সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে এক শ্রেণির প্রতারক। মানুষ যতটা সতর্কতার সাথে রাস্তা–ঘাটে চলতে চেষ্টা করছে ততটাই পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের প্রতারণার অভিনব কৌশল। তথ্য প্রযুক্তি খাতের এমনি কিছু প্রতারণার কৌশল নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীর বিভিন্ন নম্বর থেকে প্রায়ই ম্যাসেজ পাওয়া যায় যে, আপনি এতো টাকার (টাকার পরিমান) লটারী বা বীমা পলিসি জিতেছেন। এরপর তার ন্যাশনাল আইডি নম্বর, ই-মেইল নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও ব্যক্তিগত পরিচয় চাওয়া হয়। এগুলি দেয়ার পর কিছু টাকা বিভিন্ন চার্জ এর কথা বলে বিকাশ করতে বলা হয়। তারা এমন কিছু বিশ্বাসযোগ্য কথা বলে যা তাকে না বলা কঠিন হয়ে পড়ে। এটিও এক ধরনের প্রতারণার ফাঁদ। অনেকেই এই ফাঁদে পা দিয়ে প্রতারিত হচ্ছে।
- ফেসবুক বর্তমান সময়ে যোগাযোগের বহুল প্রচলিত একটি সামাজিক মাধ্যম। যেখানে একসঙ্গে সারা পৃথিবীর খবর প্রচারের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। এই মাধ্যমে প্রতিনিয়ত মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। ফেসবুকের কারণে পরকীয়া ও মিথ্যাচারিতার অধিক্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেসবুকে পরিচয় গোপন করে মানুষ আইডি তৈরী করে মানুষকে প্রতারিত করছে। এমনকি দেখা গিয়েছে একজন ছেলে আরেকজন ছেলের সাথে অথবা একজন মেয়ে আরেকজন মেয়ের সাথে ফেক আইডি খুলে অযথা সময়ক্ষেপন করছে যা প্রতারণার শামিল। ফেসবুকের কারণে সমাজে কিডন্যাপ, ধর্ষণ, ব্যভিচার, পরকীয়া, চাঁদাবাজি, মৃত্যুর হুমকি ইত্যাদি ধরনের অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, ধোঁকা ও প্রতারণা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এর অন্যতম কারণ মানুষ আল্লাহ ও রাসূল (সা) এর বিধান পরিহার করে পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর এই ভোগ বিলাসের প্রতি আকৃষ্টতাই মানব জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব তথ্য-প্রযুক্তির যে বিষয়গুলোর দ্বারা মানুষের কল্যাণের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হচ্ছে সেগুলো কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রন করা।

প্রতারণা প্রতিরোধে কতিপয় সুপারিশ

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সর্বত্র প্রতারণার যে আধিক্য রয়েছে তা প্রতিকারের প্রত্যাশায় কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো। যথা:

- রাষ্ট্রের বিদ্যমান আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করার পাশাপাশি ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা। যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ফিরে আসবে।

- রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষ থেকে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে কাউন্সেলিং করা।
- কর্মক্ষেত্রের স্তরে স্তরে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দান করা।
- সর্বক্ষেত্রে ও সকল পর্যায়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করা।
- অবৈধ দালালী বা মধ্যস্বত্বভোগীদের সকল কর্মক্ষেত্র থেকে প্রতিরোধ করা।
- রাষ্ট্রীয় কার্যকরী পদক্ষেপের কারণে বিভিন্ন পদে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তির উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালিত হবে এটিই জনগণের প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা পূরণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টা চালানো।
- প্রত্যেক নাগরিককে দ্বীন ইসলামের দিকে ধাবিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ পর্যায়ে সৎ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিয়োগ নিশ্চিত করা ও দায়িত্ব পালনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, প্রতারণা মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে, প্রতারণাকারী ক্রমান্বয়ে আল্লাহ ও রাসূল (সা) এর পথ থেকে দূরে সরে যায়, তার দু'আ কবুলের পথ বন্ধ হয়ে যায়, ঈমান ধ্বংস হয়ে যায় এবং সমাজে সে অসম্মানিত হয়। কারণ, আল্লাহর দ্বীন থেকে সে এতো বেশি দূরে পৌছে গেছে যে, সেখান থেকে ফিরে আসা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিৎ প্রতারণার মত জঘন্য ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত থাকা। আর এ জঘন্য অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কুরআন ও হাদীসের বিধান মেনে চলার কোন বিকল্প নেই। পরকালে মানুষকে তার কর্মের হিসাব দিতে হবে। সেদিন মানুষ তার কৃত পাপের জন্য লজ্জাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই শেষ বিচারের দিনে লজ্জাজনক পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকতে বর্তমান সমাজে প্রচলিত যাবতীয় প্রতারণা ও মানুষের অধিকার বিনষ্টকারী নীতি থেকে সকলের দূরে থাকা উচিত। পৃথিবীতে মানুষের অন্ধকারের পথে চলার কৌশল অনেক হতে পারে কিন্তু আলোর পথে পরিচালিত হবার পথ একটিই। তাছাড়া প্রতারণা মুনাফিকীর লক্ষণ। আর মুনাফিকের স্থান চিরস্থায়ী জাহান্নাম। তাই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভের জন্য মানবজাতির উচিত সকল ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণার পথ পরিহার করে ইসলামের বিধান মেনে চলা। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে ভালোবাসা, শান্তি ও সম্প্রীতির সুবাস বইবে। হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করবে। দুনিয়া এবং আখিরাতে পূর্ণ সফলতা আসবে। প্রতারণা প্রতিরোধে ইসলাম শীর্ষক প্রবন্ধটি এক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করি। এ প্রবন্ধে এ বিষয়ে সামান্যতম ভূমিকা রাখলেও আমার এ প্রয়াশ স্বার্থক হবে। ইনশাআল্লাহ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

ঐতিহ্যবাহী বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গা : ইতিহাস ঐতিহ্য ও ভূমিকা

মোঃ আরিফুল ইসলাম*

[**Abstract:** The traditional large mosque, located in the heart of the present Chuadanga district under the then Nadia and later in the greater Kushtia district, was built in imitation of the Mughal royal architectural style at the historic Fatehpur Sikri. The three-domed rectangular plan with drums of architectural style, colonial architectural features of the large mosque adjacent to the Chuadanga Academy School junction has been designed. During the Mughal rule, the rectangular mosque with three domes gained the most popularity in Bengal in terms of architectural style. And the notable mosque with three domes built in this kind of beautiful architecture is the big mosque-Chuadanga. The mosque has been well known in Kushtia, Jhenaidah, Chuadanga and Meherpur areas since that time. The glorious teachings of Islam spread to the remote areas around this mosque. Since the establishment of the mosque, many people in the area have been praying. The mosque was able to make a huge social and religious contribution to the masses. Judging by the Muslim architecture, the mosque is an ancient, eye-catching, architectural monument of the greater Kushtia region. Therefore, research on the mosque has become a demand of the time.]

ভূমিকা : চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী বড় মসজিদটি ঐতিহাসিক ফতেহপুর সিক্রিতে নির্মিত মুঘল রাজকীয় স্থাপত্য শৈলীর (Mughal imperial style) অনুকরণে নির্মিত হয়। মসজিদটির দেওয়ালগুলি ইট ও পাথরের তৈরি এবং পোড়ামাটির অলংকরণ দ্বারা সজ্জিত। চুয়াডাঙ্গা একাডেমী স্কুল মোড় সংলগ্ন বড় মসজিদটির স্থাপত্য, গঠনশৈলী, ঔপনিবেশিক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের ড্রাম সম্বলিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তকার পরিকল্পনার নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। মুঘল শাসনামলে বাংলায় তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তকার মসজিদ স্থাপত্যশৈলীর দিক দিয়ে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। আর এ ধরনের সুন্দর স্থাপত্য কলায় নির্মিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য মসজিদ হলো বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গা। অত্র মসজিদটি তৎকালীন সময় থেকেই কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অঞ্চলে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। অত্র মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলামের সুমহান শিক্ষা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর হতে অত্র এলাকার অনেক মানুষ নামাজী হয়। মসজিদটি গণমানুষের মাঝে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হয়। মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের বিচারে মসজিদটি বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলের প্রাচীন, নয়নাভিরাম, স্থাপত্যিক নিদর্শন। কাজেই মসজিদটি নিয়ে গবেষণা হওয়া সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। আশা করি উক্ত মসজিদটি নিয়ে গবেষণা

* *এমফিল গবেষক, আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

করলে মুসলিম স্থাপত্যের অতি মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত আবিষ্কৃত হবে যা অবগত হয়ে কৌতূহলী মন অজানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে এবং ধর্ম-প্রাণ মুসলিম নর-নারীর মাঝে মসজিদ স্থাপনে নব চেতনা জাগ্রত হবে ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে সেই সাথে খতিব, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং মুসল্লিগণ মসজিদ কেন্দ্রিক ইসলামী শিক্ষা ও সালাত প্রতিষ্ঠায় উপযোগী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি ভরসা করে আলোচ্য প্রবন্ধে "ঐতিহ্যবাহী বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গা: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভূমিকা" সম্পর্কে মসজিদটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী তুলে ধরার প্রচেষ্টায় আল্লাহ তা'আলার তাওফীক কামনা করে শুরু করছি। وما توفيق الاّ بالله

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

পৃথিবীর ইতিহাসে ইবাদত বা উপাসনার উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রথম ঘর 'বায়তুল্লাহ' তথা আল্লাহর ঘর। যে নগরীতে উক্ত ঘরটি স্থাপিত হয়েছিল তার নাম মক্কা বা বাক্কা নগরী। সে ঘরটি বিশ্ববাসীর জন্য সুপথের দিশা ও বরকতময়।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বলেন :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ [১]

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বিশ্ববাসীর জন্য বরকতময় ও পথপ্রদর্শক।'

যুগে যুগে যত নবী, রাসূল বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত হয়েছে তারাই বসবাস ও ইবাদতের জন্য গৃহ নির্মাণ করেছেন। তবে অত্যধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ) ও ইসমাঈল (আ) নির্মিত খানায়ে কা'বা বা কাবাঘর নির্মাণ। যে ঘরটি মানুষের জন্য সম্মিলনক্ষেত্র ও নিরাপত্তাস্থল। যে ঘরটিকে নামাজের স্থান, তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَّاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ [২]

অর্থাৎ, 'আর (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন কাবাঘরকে মানবজাতির সম্মিলনক্ষেত্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম (এবং বলেছিলাম) তোমরা মাকামে ইব্রাহিম (ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গা) কেই নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ কর। আর আমি ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।'

---

১ *আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, ০৩:৯৬*

২ *আল-কুরআন, সূরাতুল বাকারাহ, ০২:১২৫*

মহানবী মুহাম্মাদ (সা) মক্কী জিন্দেগীতে মাসজিদুল হারামে কাবা চত্বরে ইবাদত-বন্দেগী করেছেন হিজরতের পর 'কুবা' নামক স্থানে প্রথমে মসজিদ নির্মাণ করেন ও পরবর্তীতে মাসজিদে নববী স্থাপন করে সে স্থানকে ইবাদত-বন্দেগী পালনের উপযুক্ত স্থানরূপে ব্যবহার করেন তাছাড়া অন্যান্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষালয় হিসাবে রূপদান করেন যার শিক্ষার্থী ছিল 'আহলে সুফ্ফা' সুনামধন্য সদস্যগণ ও নব মুসলিম সাহাবাগণ এবং উক্ত মসজিদটিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রাজ্য পরিচালনার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেন। রাসূল (সা) শুধু নিজে মসজিদ নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হননি সেই সাথে অন্যকে মসজিদ নির্মাণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেমনটি উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত মসজিদ নির্মাণের ফজীলতপূর্ণ হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন,

مَن بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ، بَنَى اللهُ له في الجَنَّةِ مِثْلَهُ .وفي رواية :بَنَى اللهُ له بَيْتًا في الجَنَّةِ .[৩]

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ (ঘর) নির্মাণ করবেন। অন্য বর্ণনায় : আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে বাড়ী বানাবেন।'

তাইতো আমরা মসজিদে নববীর আদলে সমগ্র বিশ্বময় অনেক নান্দনিক মসজিদ দেখতে পাই। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সুলতান ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী[৪] নদীয়া আগমনের পর হতে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় সাতশ বছর ধরে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও অন্যান্য ইমারাত নির্মাণ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। পাবনার ঐতিহাসিক ইমারাত প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, খুলনা বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব মসজিদ ও অন্যান্য ইমারাত নির্মিত হয়েছে তা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে যেমন- 'এক. সুলতানী আমলের নির্মিত স্থাপত্য (১২০৪-

---

৩ *ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, হা/৫৩৩। (হাদীসটি সহীহ)*

৪ ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী: জাতিতে ছিলেন তুর্কি। আফগানিস্থান ছিল তার জন্ম স্থান। গরমিশ শহরে এ মহান পুরুষ বসবাস করতেন। জীবনের এক পর্যায়ে তিনি দ্রাবিড় পীড়নে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বখতিয়ার খিলজী জীবিকা ও ভাগ্যর অন্বেষণে ভারত চলে আসেন। দেখতে খর্বদেহ, দীর্ঘবাহু, বিশ্রী চেহারা ছিল তার। তবে তিনি অসীম সাহসী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ও কর্মদক্ষ ছিলেন। তার বঙ্গ বিজয়ের সময় সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে তবে তা ১২০৩ বা ১২০৪ খ্রিঃ হবে। তিনি দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করে ১৭জন মতান্তরে ১৮জন সৈন্য নিয়ে নদীয়া আক্রমণ করেন। তিনি হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে হিন্দু যুগের অবসান ঘটিয়ে এ দেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। নদীয়া বিজয়ের পর বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্ণণাবতী বা গৌড় দখল করেন এবং সেখানেই তার রাজধানী স্থাপন করেন।বাংলা বিজয়ের প্রথম নায়ক বখতিয়ার খিলজী তার অবদানের জন্য বাংলার মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন শত শত বছর। এ মহান পুরুষ ১২০৬খ্রিঃ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

১৫৭৬ খ্রি), দুই. মুঘল আমলের নির্মিত স্থাপত্য (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি), তিন. বৃটিশ আমলের ঔপনিবেশিক স্থাপত্য। (১৭৫৭-১৯৪৭খ্রি)।'[৫]

দিল্লীর মোগল সম্রাটগণ অবিভক্ত ভারতবর্ষে ৩০০বছরের অধিককাল রাজত্ব করেন। এ দীর্ঘ সময়কালে মোগল সম্রাটগণ এবং তাদের উচ্চপদস্থ আমলারা বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ইমারাত যেমন: শাহী মসজিদ, মিনার, খানকা, বিচারালয়, দূর্গ ও কেল্লা নির্মাণ করেন যা আজো স্থাপত্য শিল্পের বিরল ও উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে বিরাজমান। এগুলোর মধ্যে আগ্রার তাজমহল, সেকেন্দ্রা, দেওয়ানে আম, আগ্রার দূর্গ, দিল্লীর লাল কেল্লা ও দিল্লির শাহী জামে মসজিদ অন্যতম। দিল্লীর বিখ্যাত জামে মসজিদের অনুকরণে মোগল জমিদার আমান উল্লাহ খান ১১৫৪ হিজরি সাল, ১১৩৯ বাংলা মোতাবেক ১৭৪১ সালে অর্থাৎ প্রায় তিনশত বছর পূর্বে বজরাশাহী মসজিদ নির্মাণ করেন যা আজও মোগল স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে দেশি-বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। 'আবহমান বাংলার প্রত্নকীর্তি' বইতে উল্লেখ রয়েছে-'ঢাকার স্বর্ণ যুগের সূচনা হয় নবাব শায়েস্তা খানের আমলে। তার সুবাদারী আমলে (১৬৬৪-৭৭ এবং পুনরায় ১৬৭৯-৮৮ খ্রি) চকবাজারে শায়েস্তা খানের মসজিদ, শাহ গুজার বড় কাটরার অনুকরণে ছোট কাটরা বা সরাইখানা নির্মাণ, মুহাম্মদপুর সাত গম্বুজ মসজিদ প্রভৃতি তাঁর স্থাপত্যিক নিদর্শন।'[৬]

মসজিদটি নির্মাণের প্রেক্ষাপট

তৎকালীন অবিভক্ত নদীয়া জেলা যার অধিকাংশ বর্তমানে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। অত্র জেলায় যদিও ইসলাম ধর্ম প্রচারের সঠিক কোনো ইতিহাস জানা যায় না। তবুও বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ মনে করেন সেন রাজত্বকালের ১২০১ খ্রি: সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম প্রচার হয়নি। তৎকালীন লিখিত 'সদুক্তি কর্ণামৃত' ও 'সেক শুভোদয়া' বই দুটিতে মন্তব্য করা হয়েছে যে, সেনরা মুসলমান বিদ্বেষী ছিলো। সেন বংশের সর্বশেষ রাজা লক্ষণ সেন অনেক সময় মুসলমান দেখলে হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। 'ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী ১২০১ অথবা ১২০৩ সালে; কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ১২০২ অথবা ১২০৪ সালে মাত্র ১৭জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নদীয়ার রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা জয় করেন।'[৭]

এরপর থেকে অত্র এলাকায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার বাড়তে থাকে আর মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হতে থাকায় মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, বৈঠকখানা ও অন্যান্য ইসলামী

---

৫ আয়েশা বেগম, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারাত, (ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২) পৃ.৩১।*

৬ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আবহমান বাংলার প্রত্নকীর্তি*, (ঢাকা: ঝিঙেফুল, প্রকাশকাল-২০০৫), পৃ.৪২-৪৩।

৭ আব্দুল করিম,*বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল;* en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Bakhtiyar_Khilji

স্থাপনা নির্মিত হতে থাকে। বাংলার যে সব অঞ্চলে ইসলামের কার্যক্রম শুরু হয় সে অঞ্চলগুলিকে ঐতিহাসিকগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন যে সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিয়ে প্রখ্যাত ইতিহাসবীদ জিয়াউদ্দিন বারানী[৮] বর্ণনা করেন : 'ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশে বাংলাদেশের যে তিনটি বিভাগের কথা উল্লেখ আছে তা হলো : (১) ইকলিম-ই লাখনৌতি। (২) আরসা-ই-বাংগালা। (৩) দীয়ার-ই-বাংগালা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়াতে যে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটেছিল, উহা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ও বিস্তার লাভ করে বাংলাদেশের বর্তমান মুসলিম ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। '১৩৮৯-১৪০৯ সালের মধ্যে গৌড়ে মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তার পুত্র জালাল উদ্দীন নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজত্বকালে কুষ্টিয়া ও অন্যান্য দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচার চলতে থাকে।'[৯] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া বিজয়ের পর হতে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হতে ব্যাপকভাবে দক্ষিণ বঙ্গের বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় মুসলমানদের আগমন ঘটতে থাকে। 'শাহী বাংলার আমলে নির্মিত বিপুল সংখ্যক মসজিদ স্থানীয় জনগণের যে দ্রুততার সাথে ইসলাম গ্রহণ করে তা নির্দেশ করে। ১৪৫০ এবং ১৫৫০ এর মধ্যবর্তী সময়কাল একটি নিবিড় মসজিদ নির্মাণের যুগ ছিল। এই মসজিদগুলি গ্রামাঞ্চলের মাঝামাঝিতে, ছোট থেকে মাঝারি আকারের এবং দৈনিক ইবাদতের জন্য ব্যবহৃত হতো।'[১০] পঞ্চদশ শতাব্দীতে খানজাহান আলী কর্তৃক দক্ষিণ বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে ও পরে কিছু সংখ্যক পাঠান এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন শুরু করেন। তবে খান জাহান আলীর সময়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অধিক সংখ্যক পীর, দরবেশ, সুফি সাধক, অলি আওলীয়া আগমন করেন ও তার সাথে আগত সাথীরা প্রয়োজনীয় বসতি স্থাপন করে, বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম স্থাপত্য মসজিদসমূহ নির্মাণ করেন এবং অত্র অঞ্চলের মানুষদেরকে ইসলামী আদর্শে মুগ্ধ করে ধর্মপ্রাণ, সম্পদশালী মুসলমানদেকে মসজিদ নির্মাণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। যার মধ্যে বাংলাদেশের খুলনা বিভাগীয় স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত একাডেমী স্কুল মোড় সংলগ্ন আলমডাঙ্গা রোডের বড় মসজিদটি অন্যতম।

মসজিদটির নাম, প্রতিষ্ঠাতা ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

মসজিদের নাম: বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গা (মসজিদটি যদিও বড় বাজারে অবস্থিত নয় তবুও মসজিদটি বড় মসজিদ নামেই পরিচিত)। মসজিদটি আনুমানিক ১৭৮৬ সালে নির্মিত হয়েছে

---

৮ জিয়াউদ্দিন বারানি (১২৮৫-১৩৫৭) ছিলেন সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় দিল্লি সালতানাতের একজন মুসলিম ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। তার রচিত তারিখ-ই-ফিরোজশাহী বইয়ের জন্য তিনি অধিক পরিচিত। এটি মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক কর্ম। তথ্য সূত্র: অনলাইন লিংক।

৯ অধ্যাপক শামসুল ইসলাম লতিফী, *কুষ্টিয়ায় ইসলাম প্রচার*, পৃষ্ঠা নং-০২-০৩।

১০ *Grabar, Oleg (1990)| Muqarnas: An Annual on Islamic Art and Architecture (ইংরেজি ভাষায়)| Brill Archive| আইএসবিএন 978-90-04-09050-7*

বলে লিখিত থাকলেও স্থানীয়রা জানান প্রায় ৩০০ বছর ধরে মসজিদটি অত্র শহরের প্রথম মসজিদ হিসাবে এভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা: জোয়ার্দ্দার পরিবারের সহধর্মীনি ধর্মপ্রাণ মুসলিম, মহিয়সী, রমনী কুসুম বিবি। কুসুম বিবির একক প্রচেষ্টায় তার নিজস্ব অর্থ দিয়ে বড় মসজিদটি স্থাপিত হয়। পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে জানা যায় যে, কুসুম বিবি নিজস্ব নতুন বাড়ী তৈরির সময় মাটির নিচে মাটির পাত্রে পাঁচ হাজার রৌপ্য মুদ্রা পান তা মসজিদ নির্মাণের জন্য দান করে দেন। অন্যমতে, কুসুম বিবির অঢেল সম্পত্তি ছিল তা থেকে উক্ত মসজিদটি তৈরির জন্য অনেক টাকা দান করেন তা থেকে মসজিদ সন্নিকটে ইটের প্লাজা তৈরি করে প্রায় সাত লাখ ইট প্রস্তুত করে মসজিদটি নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। উল্লেখ্য যে, মসজিদে প্রবেশ পথের পূর্বদিকের বাম পাশে মিনার সংলগ্ন স্থানটিতে কুসুম বিবির কবর রয়েছে। উক্ত মসজিদের প্রথম মুতাওয়াল্লী: মরহুম আনোয়ার আলী জোয়ার্দ্দার[১১] পিতা: মরহুম আলম আলী জোয়ার্দ্দার। যিনি কুসুম বিবির যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। তিনি স্থীয় সম্পত্তির কিছু অংশ ওয়াক্ফ করেন যাহার ওয়াক্ফ রেজিঃ নং-১৪৬২৭। তিনি ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে উনার রেকর্ডিও সম্পত্তির কিছু অংশ উল্লিখ পূর্বক ওয়াক্ফ দলিল ওয়াক্ফ প্রশাসকের বরাবর বড় মসজিদের অনুকূলে শর্ত স্বাপেক্ষে রেজিষ্ট্রি করে দেন। যা আনোয়ার আলী ওয়াক্ফ এষ্টেট নামে পরিচিত। প্রথম মোতাওয়াল্লীর মৃত্যুর পর ওয়াক্ফ দলিলের শর্ত মোতাবেক উনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোঃ আব্দুর রশিদ জোয়ার্দ্দার দ্বিতীয় মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হন। উনার মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ড. রুহুল হাসান জোয়ার্দ্দার বর্তমান মুতাওয়াল্লী হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন। মসজিদটির বর্তমান সভাপতি দায়িত্ব পালন করছেন: জনাব মোঃ ইবরুল হাসান জোয়ার্দ্দার। মসজিদের নামেই অত্র মহল্লার নাম 'মসজিদ পাড়া'। পাশেই রয়েছে পূর্বাপরের অনেক নামকরা গুণিজনদের ও আগত পীর মাশায়েখ, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও জোয়াদ্দার পরিবারের বিশিষ্টজনদের কবর। যা বাঁধানো কবরগুলোতে লিখিত তথ্যমতে জানা যায়। সাথেই রয়েছে সুউচ্চ মিনার ও তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ। যুগে যুগে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মসজিদটির সংস্কার কাজ হয়েছে দিনে দিনে মুসল্লি বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদটির মূল কাঠামো ঠিক রেখে পিছনে ও পাশে নামাযের জায়গা বর্ধিত করা হয়েছে। মসজিদটি চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার হতে এক কিলোমিটার দূরে একাডেমী স্কুল মোড়ে, আলমডাঙ্গা রোডে প্রবেশ করেই হাতের ডানে অবস্থিত। একাডেমী মোড় থেকে সুউচ্চ মিনার অতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, চতুর্পাশ্বে একটু তাকালেই যা চিনতে বা খুঁজে পেতে মোটেই বেগ পেতে হয় না।

মসজিদটির অলঙ্করণ সজ্জা

বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গার নির্মাণশৈলী ও অলঙ্করণ বিন্যাস চমৎকার বর্ণ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। মসজিদের অভ্যন্তরে সম্মুখভাগে বিশেষ করে মেহরাবের অংশটিতে যে লতা, পাতা,

১১ *মরহুম আনোয়ার আলী জোয়ার্দ্দার, পেশায় মোক্তার; তার পূর্ব পুরুষগণ জমিদার ছিলেন।*

ফুলের অলঙ্করণ সজ্জা, খাজকাটা, বিটকরা অলঙ্করণশৈলী বিদ্যমান ছিল তা এক কথায় অসাধারণ; যার নমুনা এখনো লক্ষ করা যায়। যা তৎকালীন কারিগরেরা শিল্পীর তুলিতে সূক্ষ্ম ও দক্ষতার সাথে নকশা অংকন করেছিলেন। এমন সুন্দর অলঙ্করণ সজ্জার কথা বাংলাদেশের অন্যত্র শাহী মসজিদের ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, সাসানীয় আমল থেকে চুন-বালির সজ্জা রীতি চমৎকার ডেকোরেটিভ মোটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং মুঘল আমলেও এ প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের উপরে নির্মিত তিনটি গম্বুজ ও ছাদের উপরে দশটি ক্ষুদ্র নিরেট বুরুজ রয়েছে। আর গম্বুজ ও বুরুজের উপরিভাগে বৃত্তাকারে আঁকা ফুল কিছুটা পাতা নকশায় ছাতার মতো মনে হয় এবং তরঙ্গায়িত ধাপে ধাপে, খাজকাটা টানা পাড়ের ছাদ মসজিদটির অনন্য শোভা বৃদ্ধি করেছে। মসজিদটি নির্মাণে উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে-দামি পাথর, ইট, চুন-সুরকি, লোহা ও কাঠ ইত্যাদি। মসজিদটির ডানে-বামে, উত্তর-দক্ষিণে লম্বাকৃতির দুটি ভেনিসীয় রীতির জানালা রয়েছে যা এখন দরজায় রূপান্তরিত। এছাড়াও অসাধারণ নির্মান কৌশলে নির্মিত মসজিদটিতে দৈর্ঘ্য প্রস্থে ছোট আকারের তিনটি প্রবেশ পথ, সংক্ষিপ্ত মিহরাব যদিও মিহরাব পরে বর্ধিত করা হয়েছে। এরকম নির্মাণ কৌশলে নির্মিত প্রাসাদের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে 'রাজশাহী জমিদারের প্রাসাদ স্থাপত্য' নামক বইতে যেমন- 'মজবুত করিন্থীয় আকৃতির পোস্তা (Plaster) ছাদের কার্নিশের নীচে টানা পাড় (Frieze) নকশা প্রভৃতি স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মসজিদটিকে একটি বিশেষ স্থাপত্যিক নিদর্শন হিসাবে মর্যাদা দান করেছে।'[১২]

নকশা ও গঠনশৈলী

আয়তকার পরিকল্পনায় নির্মিত বড় মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমের প্রস্থ প্রায় ৩০ফুট। মসজিদটির উত্তর-দক্ষিণে একটি করে দুইটি জানালা রয়েছে। প্রাচিরের পুরুত্ব বিভিন্ন অংশে কমবেশি থাকায় দেয়ালের পুরুত্ব ২৪ইঞ্চি থেকে ৩০ইঞ্চি হবে। মসজিদের ভিতরে দুইটি কাতার আছে প্রতি কাতারে প্রায় ১৫-২০জন নামায আদায় করতে পারে। মসজিদের বাহিরে বারান্দা রয়েছে যেখানেও অনুরূপ মুসল্লী নামাযে শামিল হতে পারে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৪ফুট ৪ইঞ্চি, প্রস্থ ১০ফুট। মসজিদের ভিত হতে উচ্চতা গম্বুজের গোড়া পর্যন্ত প্রায় ১৮ফুট। পরবর্তীতে মসজিদের উপরিভাগে গম্বুজের নিচে লোহার এ্যাঙ্গেল, পাইপ ও রড দিয়ে বৈদ্যুতিক পাখা টানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরে দুই পাশে দুটি সাহান ও রিওয়াক আছে। ছাদ বরাবর থেকে গম্বুজের উচ্চতা আনুমানিক ১০ফুট হবে তবে মাঝের গম্বুজটি তুলনামূলক একটু বড় যা প্রায় ১২ফুট। গম্বুজের উপরিভাগে সুন্দর নকশা এবং চতুর্দিকে ফুলের আস্তরণ অঙ্কিত রয়েছে। মধ্য গম্বুজের শেষাংশ সুঁচালো তিরের ফালার মত হয়ে

১২ কাজী মো: মোস্তাফিজুর রহমান, *রাজশাহী জমিদারের প্রাসাদ স্থাপত্য* (১৭৯৩-১৯৫০), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৯), পৃ.২৬০-২৬৩।

আকাশের দিকে মিশে গেছে। প্রায় ৪ফুট থেকে ৫ফুট উচ্চতার দশটি বুরুজ অনেকটা মিনারের মতো দেখা যায়; যা মসজিদের গঠনশৈলীকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। বুরুজগুলোও গম্বুজের অনুরূপ সুন্দর নকশার কারুকার্যে সুশোভিত। মসজিদটি এমনভাবে নির্মিত যে, মসজিদ অভ্যন্তরে ছোট আওয়াজের কথাও প্রতিধ্বনিত হয়ে স্পষ্ট শুনা যায়; সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করলে বা সাধারণ কথা-বার্তা বললে এত সুন্দর, স্পষ্ট, উচ্চ আওয়াজে শোনা যায় যে, শব্দ বাড়ানোর জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। মসজিদটির অভ্যন্তরে গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা আর শীতকালে গরম তবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কিছুটা উক্ত অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। মুঘল আমলের নির্মাণ কৌশলে নির্মিত ব্যবস্থাপনাটি বিজ্ঞানভিত্তিক ও অত্যন্ত উপকারী। তৎকালীন সময়ে বর্তমানের মতো প্রকৌশলী ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার না থাকলেও সাম্প্রতিক সময়েও উক্ত নির্মাণ কৌশলে নির্মিত ব্যবস্থাপনাটি অনুসরণযোগ্য।

দরজা সম্পর্কিত তথ্য

মসজিদটির মূল অংশে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকের দেয়ালের সাথে মাঝখানে একটি তুলনা মূলক বড় প্রবেশ পথ ও দুইপাশে সমান দূরূত্বে আরো দুইটিসহ মোট তিনটি খিলান পথ রয়েছে। এছাড়াও উত্তর, দক্ষিণের ভেনিসীয় রীতির দুটি জানালাকে পরবর্তীতে দরজায় রূপান্তরিত করা হয়। মূল মসজিদের অভ্যন্তরে যতটুকু জায়গা তাতে একটি করে প্রবেশ পথ হলেই যথেষ্ট মনে হয়। তবুও বেশি দরজা রাখার অন্যতম কারণ হলো-এটা মূলত মুঘল আমলে নির্মিত মসজিদের অনুকরণে তৈরি স্থাপত্যশৈলীর এক অনুপম নিদর্শন। যাতে করে একই সাথে সবাই মসজিদের ভিতরে যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারে এবং সহজে ইচ্ছামত বাহিরে বের হয়ে আসতে পারে। তাছাড়া নামাযে কাতারবদ্ধ হওয়ার রীতি অনুযায়ী ইমামের ঠিক পিছনে মাঝখান থেকে কাতার গাঁথা শুরু করতে হয়। আর এ ব্যবস্থাপনার দরুন ভিতরকার সর্বশেষ কাতারে দাঁড়িয়ে মাঝখানের দরজা বন্ধ করে দিলেও দুইপাশের দুটি দরজা দিয়ে সহজেই কাতারে শেষ পর্যন্ত শামিল হওয়া যায়। এ যেন মুসল্লি দিয়ে মসজিদ পূর্ণ করতে পারার এক যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও মিনারে উঠার জন্যও একটি দরজা আছে আর প্রতিটি দরজায় কারুকার্য খচিত সুন্দর নকশা রয়েছে। দরজাগুলো আকারে ছোট ও উপরের দিকে অর্ধবৃত্ত ডিজাইন সম্বলিত।

ছাদ সম্পর্কিত বিবরণ

মসজিদটির সামনের অংশ তিন গম্বুজেই সম্পূর্ণ করা ছাদ নির্মাণ একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্থাপত্য কীর্তি। গম্বুজের বাহিরে ছাদের অংশ খুবই কম। বারান্দার উপরে আগেকার প্রযুক্তিতে গড়া ছাদ ছিল যাতে কাঠ ও পুরু টালি ব্যবহার করা ছিল পরে অবশ্য সিমেন্ট, বালি, খুয়া দিয়ে ঢালাই ছাদ দেওয়া হয়েছে; আর সে অংশের উপর দুটি বুরুজ ছাড়া কোন গম্বুজ নেই। মসজিদের ছাদ নির্মাণে বিশেষ কৌশল হিসাবে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি লোহার ভীম থেকে ইটগুলো পর্যায়ক্রমে স্থাপন করে ইটের উপর চুন-সুরকি দিয়ে ছাদ মজবুত ও শক্তিশালী করে

তৈরী করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ছাদের ভার নিম্নমুখী চাপ না দিয়ে বরং পাশে চাপ প্রদান করে ফলে ছাদ শক্তিশালী হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করে। এ উপমহাদেশের মানুষ উচ্চতায় সাধারণত ৫ফুট থেকে ৬ফুট উচুঁ হয়ে থাকে সেখানে ছাদ মাটি থেকে ১৮ফুট উঁচুতে নির্মিত; আর এতে করে মসজিদের ভিতরে আলো বাতাসের ভরপুর সমাহার থাকে। পিলারবিহীন এক আইল বিশিষ্ট (Ailse) সমগ্র জুল্লাহ্ (Total prayer chamber)-এর কেন্দ্র করে মসজিদের ছাদ সংস্থাপিত। ছাদের উপরে তিন গম্বুজের চারিপার্শ্বে মিনারের মতো মোট আটটি বুরুজ ও এক কাতারের বারান্দার উপর পূর্বদিকে দু'টিসহ মোট ১০টি বুরুজ স্থাপন করা হয়েছে এবং বুরুজের উপরাংশ পাতা-পাতা ডিজাইন করা যা দেখতে কিছুটা ছাতার মতো মনে হয়। ডিজাইনটি গম্বুজের শুধু নয় বরং ছাদেরও অনেক শ্রীবৃদ্ধি করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'মুসলিম ইমারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশালতা এবং আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য ছাদ উঁচু করে নির্মাণ। ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষ করে আহমদাবাদের মসজিদসমূহে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।'[১৩]

মিহরাব সম্পর্কিত বিবরণ

বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গার মিহরাবের বিশেষ শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য হলো: মিহরাবটি মসজিদের সম্মুখভাগের মাঝ বরাবর জায়গায় সুন্দর কারুকার্য খচিত অসাধারণ সজ্জায় স্থাপন করা হয়েছে। মিহরাবের উপরে ছোট আকারের গম্বুজ রয়েছে যা অন্যান্য শাহী মসজিদগুলোতে এভাবে দেখা যায় না। 'মসজিদের অবতলাকার মূল বা আদি মিহরাবটি (সংস্কারের পূর্বে) শীর্ষদেশ থেকে উত্থিত বহু ভাজ বিশিষ্ট খাঁজ খিলান (Multi cusped arch) নকশা মিহরাবের সুন্দর্যতাকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। খাঁজকাটা খিলান মুঘল স্থাপত্য শৈলীর একটি আকর্ষণীয় নিদর্শন। এ উপমহাদেশের স্থাপত্য ইতিহাসে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে সর্বপ্রথম খাঁজ খিলান দেখা যায় এবং পরবর্তীতে (প্রায় তিনশত বছর পর) এ ধররে খিলান বাংলার বাইরে চলে যায় এবং সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যে এর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।'[১৪] ওলেগ গ্রাবার সম্পাদিত একটি বইতে পেরিউন হাসানের মতে, 'শাহী বাংলার মসজিদের বিভিন্ন সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নির্দেশিত খিলান, একাধিক মিহরাব, কর্ণার টাওয়ার এবং পোড়ামাটি এবং পাথরের সাজসজ্জা।'[১৫] বিশেষত, 'মিহরাব শিল্পটি বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের চেয়ে নিখুঁত এবং অনন্য।'[১৬]

---

১৩ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম স্থাপত্য (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৭), পৃ. ৫১।*

১৪ কাজী মো: মোস্তাফিজুর রহমান, *বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যে দেশজ উপাদান*, (Rajshahi University Studies, Arts and Law, Parts-A, Vol.33), (Rajshahi University, Rajshahi.2005), p.18।

১৫ *Grabar, Oleg (১৯৯০)। Muqarnas: An Annual on Islamic Art and Architecture (ইংরেজি ভাষায়)। Brill Archive। পৃষ্ঠা ৭২। আইএসবিএন 978-90-04-09050-7।*

১৬ *Badshah-ka Takth and the gem of Bengal, Kusumba Mosque"। The Daily Star (ইংরেজি ভাষায়)। ১৬-১২-২০১৯। সংগ্রহের তারিখ সংগ্রহের তারিখ: ০১-০২-২০২০।*

মসজিদের মিহ্রাবের পোস্তার শীর্ষদেশ, খাজ খিলানের উপর দিকে আয়তকার কাঠামোতে এবং উভয় প্রান্তে রঙ ও তুলির সাহায্যে নকশা করা ছিল যা বর্তমানে টাইলসের আড়ালে ঢাকা পড়েছে যা মনোমুগ্ধকর অলঙ্করণের শৈল্পিক বিন্যাস মিহরাবের সুন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে। মিহরাবের উভয় পাশে পশ্চিম দেয়ালে একটি করে অর্ধ-বৃত্তকার খিলান বিশিষ্ট মিহরাবের মতো দুটি গভীর আয়তকার প্যানেল ছিল। এ প্যানেল দুটিকে পরবর্তীতে আলমারীতে রূপান্তর করে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশে আরো দুটি কুপি বাতি রাখার ছোট খোপ কাটা জায়গা রাখা ছিলো এর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় পরবর্তীতে তা ইট, সিমেন্ট ও বালির মসলা দিয়ে প্লাস্টার তথা ঢেকে ফেলা হয় যার অস্তিত্ব এখন অদৃশ্যমান।

গম্বুজ সম্পর্কিত তথ্য

বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গার অন্যতম আকর্ষণীয় স্থাপত্যিক নিদর্শন হলো, ছাদের উপরে ভাসমান দৃষ্টি নন্দন গম্বুজসমূহ। এই মসজিদটিতে প্রায় একই আকৃতি বিশিষ্ট তিনটি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের গম্বুজ নির্মাণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য–গম্বুজ সরাসরি ছাদের উপর নির্মিত না হয়ে কিবলা দেয়ালের বহির্গত বর্ধিত অংশে একই সারিতে প্রায় সম আকৃতির উত্তর-দক্ষিণ সারিতে বৃহদাকার গম্বুজ তিনটি সাজানো হয়েছে। মধ্যবর্তী গম্বুজটি রয়েছে ঠিক মাঝখানে মিহরাবের পিছনে অবস্থিত। মাঝখানের গম্বুজটি তুলনামূলক একটু উঁচু ও বড় গম্বুজ হিসাবেই দৃষ্টিগোচর হয়। বড় গম্বুজের উভয় পার্শ্বে প্রায় সমআকৃতি বিশিষ্ট একটি করে আরো দুটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। আর তিন গম্বুজেই মূল মসজিদ অংশের সম্মুখভাগ পূর্ণ ছাদ সম্পূর্ণ হয়েছে। একটি গম্বুজ শেষ হতে না হতেই আরেকটি গম্বুজ শুরু হয়েছে। মাঝে পিলার বা দুই গম্বুজের মাঝখানে কোনো দেয়াল স্থাপন করার প্রয়োজন হয়নি। অথচ মসজিদটি ভেঙ্গে পড়ার তেমন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় না। নিঃসন্দেহে এটি একটি অভিনব নির্মাণ কৌশল। মসজিদ অভ্যন্তরে দুই পাশের প্রতিটি গম্বুজ বিশিষ্ট কক্ষের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ফুট ও মাঝখানের বড় গম্বুজ কক্ষের দৈর্ঘ্য ১৮ফুট। মিহরাবের উপরেও ছোট আকারের একটি গম্বুজ আছে। 'মসজিদের গম্বুজ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয় ডিমের কুসুম ও সুরকির সংমিশ্রণ। বিভিন্ন গ্রাম থেকে গাড়ি গাড়ি ডিম সর্বরাহ করা হয়েছিল বলে কথিত আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'একটি বা তিনটি বা ততোধিক গম্বুজ নির্মাণ মুঘল স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য, যা মুঘলরা দিল্লীর মুঘল স্থাপত্যরীতির অংশ হিসাবে বাংলায় প্রবর্তন করেছিলেন। পরবর্তীকালে এর দ্বারা স্থানীয় স্থাপত্য রীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।'[১৭]

শাহী মসজিদগুলির অধিকাংশ যদিও তিন গম্বুজ বিশিষ্ট তবে কিছু মসজিদ আয়তক্ষেত্রাকার, বর্গক্ষেত্রাকার ও এক গম্বুজ বিশিষ্ট বা বহু গম্বুজযুক্ত আছে। মুগল শাসনামলে

---

১৭ *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১৭, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ৫৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ও ইসলাম, স. (সম্পা.), গ্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।*

বাংলাদেশে তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ নির্মাণের জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং অন্যান্য রীতির তুলনায় এ শৈলীটি সুদীর্ঘকাল ধরে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। বাংলাদেশের সম-পরিমাপের তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ স্থাপত্যের প্রাচীনতম বিদ্যমান উদাহরণ হলো, বগুড়া জেলার শেরপুরের খেয়ারা মসজিদ (১৫৮২খ্রি)' দৃষ্টিনন্দন তিন গম্বুজের সমন্বয়ে গড়ে তোলা মসজিদটির অসাধারণ সোন্দর্য হৃদয় ছুঁয়ে যায়। পাবনার চাটমোহরের শাহী মসজিদ (১৮০২ খ্রি), কুষ্টিয়া জেলার ঝাউদিয়া শাহী জামে মসজিদ, এ ছাড়াও যশোর বারবাজার এলাকায় এরূপ অনেক মসজিদ মুঘল স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে নির্মিত অমর কীর্তি।

মিনার সম্পর্কিত তথ্য

মসজিদটিতে একটি দৃষ্টিনন্দর মিনার রয়েছে। মিনারটি মসজিদের মূল অবকাঠামো নির্মাণের অনেক পরে পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সালের দিকে নির্মিত। যা অনেক দূর হতেও দৃষ্টি গোচর হয়। সে সময় উঁচু উঁচু দালান কোটা, বহুতল ভবন, ঘর, বাড়ী ছিল না তাই এর কদর ছিল অনেক বেশি। মানুষ দূর দূরান্ত হতে দেখতে আসতো ও ঘুরে ফিরে দেখে দেখে মন-প্রাণ জুড়াতো। মিনারটি ৪১ ফুট চওড়া ও ৭১ ফুট উঁচু।'[১৮]

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, অত্র মসজিদের নিয়মিত মুছল্লী মোঃ মোজাম্মেল হক প্রদত্ত তথ্য মতে: মিনারের উপর থেকে সাবেক মুয়াজ্জিন মরহুম ক্বারী মুন্সীর মাইক ব্যতীত খালি কণ্ঠের আজান বহুদূর হতে শুনা যেত। মাইক স্থাপনের পরেও মিনারের উপরে স্থাপিত মাইকের আজান ধ্বনি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সেকালে অনেকেই আজানের সাথে মিল করে দিন ও রাতের কাজ-কর্মের সময়-সূচি নির্ধারণ করতো ও আজানের সুমধুর সুরে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদ পানে ছুটে আসতো ও নামায আদায় করে নিজেকে ধন্য করতো। মিনারের উপরিভাবে সুন্দর নকশা করা ও উপরের দিকটা তীরের ফলার মতো চিকনভাবে আকাশের দিকে মিশে গেছে। মিনারটিতে উঠার জন্য সিঁড়ি আছে তবে তা বর্তমানে প্রায় অব্যবহারযোগ্য। মিনারটির প্রবেশ পথে আগেকার দিনের মূল্যবান কাঠের ডিজাইন করা একটি দরজা আছে। মিনারের উপরে উঠে চুয়াডাঙ্গা শহরটিকে খুব ভালোভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

বুরুজ সম্পর্কিত তথ্য

মসজিদের মূল অংশটির ছাদ তিন গম্বুজ দিয়ে পূর্ণ আর প্রতিটি গম্বুজের চতুপার্শ্বে একটি করে বুরুজ দ্বারা সৌন্দর্য্য মণ্ডিত। মূল অংশের ছোট্র বারান্দায় পূর্ব দিকের দুই প্রান্তে প্রবেশ দারের দুই কর্ণারে ছোট আকৃতির সাধারণ বুরুজের তুলনায় একটু মোটা মিনার সদৃশ্য দুইটি বুরুজ রয়েছে। সুতরাং গম্বুজের চতুর্দিকে স্থাপন করা ৮টি বুরুজসহ মোট বুরুজের সংখ্যা ১০টি। যার নিচের অংশ কয়েকটি ভাজে ভাজে ডিজাইন করা ও ছাদ অংশের চারি পার্শ্বে পাতা জাতীয়, ফুলের ডিজাইন করা। বুরুজগুলো খুব বেশি উঁচু নয় তবে চার হতে পাঁচ ফুট

---

১৮ *তথ্য প্রদানে: ইবরারুল হক জোয়ার্দার, সভাপতি, বড় মসজিদ, চুয়াডাঙ্গা।*

পর্যন্ত উঁচু হবে অনুমান করা যায়। বুরুজগুলোর পুরুত্ব হবে প্রায় তিন হতে চার ফুট পর্যন্ত আর বুরুজের উপরাংশ পাতা-পাতা ডিজাইন করা যা দেখতে কিছুটা ছাতার মতো মনে হয়। দূর থেকে তিনটি গম্বুজের পাশা-পাশি কাছা-কাছি বুরুজগুলোও স্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়। বুরুজগুলো মূলত ছাদ ও গম্বুজের সৌন্দর্যতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। তিন গম্বুজের মোট আটটি টাওয়ারের ন্যায় বুরুজ কিনারা পর্যন্ত প্রসারিত। কিউপোলাবিশিষ্ট কর্ণার টাওয়ার মুঘল স্থাপত্য শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যার স্বরূপ 'হরিনারায়ণপুর শাহী মসজিদ, কুষ্টিয়া' নামক প্রবন্ধে বর্ণিত যেমন-'সুলতানী আমলে কর্ণার টাওয়ার বিকশিত হলেও মুঘল আমলে এর শীর্ষভাগে কিউপোলা সংযোজিত হয়ে তা একটি বিশেষ শৈলীতে পরিণত হয়। মুসলিম শাসকরা উত্তর ভারতীয় স্থাপত্য ঐতিহ্যের অনুকরণে বাংলাদেশে স্থাপত্য নির্মাণ আরম্ভ করলেও ধীরে ধীরে তাতে স্থানীয় প্রভাব পড়ে এবং দেশজ বা বাংলা শৈলী নামে একটি নতুন স্থাপত্য রীতি গড়ে উঠে। মসজিদের চার কোণের প্রতিটিতে একটি করে লাগোয়া টাওয়ার বা বুরুজগুলোর অস্তিত্ব বাংলা চালা ঘরের (কুঁড়ে ঘরের) বাঁশের খুঁটিগুলোর ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।'[১৯] এ প্রসঙ্গে 'মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ্য করা হয়েছে যে, 'সুলতানী আমলের স্থাপত্যে বিশেষভাবে মসজিদ স্থাপত্যে কোনে ব্যবহৃত অষ্টকোন টাওয়ারগুলো ছাদের উচ্চতার উপরে বর্ধিত হয় না।'[২০] এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ও স্থাপত্য বিশারদ আহমেদ হোসেন দানী[২১] বলেন,

'The bengal hut roof types are copied in brick architecture, but the curvature of the Battlements and the cornice, so tasteful to the bengali eye,

---

১৯ *মোঃ আতিয়ার রহমান, 'হরিনারায়ণপুর শাহী মসজিদ, কুষ্টিয়া', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।*

২০ *ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, 'মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা' (রাজশাহী ঃ শালিমার ১৯৯৬), পৃ. ১৮০-১৮১।*

আহমাদ হাসান দানী, (১৯২০-২০০৯) প্রত্নতত্ত্ববিদ, ইতিহাসকার, বহুভাষাবিদ। ২০জুন ১৯২০ সালে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক দানী একাধারে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, শিল্প স্থাপত্য, ক্যালিওগ্রাফী এবং বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-Record of Its Changing Fortunes (1956), Muslim Architecture in Bengal (1961), Indus Civilization: New Perspectives (1981), Thatta: Islamic Architecture (1982), Human Records on Karakorum Highway (1995), Peshawar: Historic City of the Frontier (1995), New Light on Central Asia, (1996), Central Asia Today (1996), Romance of the Khyber Pass (1997), History of Northern Areas of Pakistan up to 2000 AD (2001) এবং Historic City of Taxila (2001). অধ্যাপক দানী জীবনের শেষ পর্যন্ত জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার কাজে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য এ অঞ্চলের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ২০০৯ সালের ২৬ জানুয়ারী ইসলামাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। (আব্দুল মমিন চৌধুরী)

is hardly to be seen, অর্থাৎ 'বাংলা কুঁড়ে ঘরের আকৃতি ইষ্টক নির্মিত স্থাপত্যে রূপান্তরিত করার ফলে ঈষৎ বক্রাকার কার্নিশের সৌন্দর্য যে নান্দনিকতার সৃষ্টি করে তা সাধারণত অত্যন্ত দুর্লভ।'[২২]

মসজিদটির সম্পদ

বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গার সম্পদ সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের মতামতের ভিত্তিতে জানা যায়, মরহুমা কুসুম বিবি বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গার নামে পাঁচ হাজার রৌপ্য মুদ্রা মতান্তরে অনেক টাকা দান করেন এবং ৭৩শতাংশ মতান্তরে ৭৬শতাংশ জমি ওয়াক্ফ করেছিলেন যার উপর নির্মিত হয় সুনামধন্য ঐতিহ্যবাহী মসজিদটি। পরবর্তীতে মরহুম আনোয়ার আলী জোয়ার্দ্দার[২৩] পিতা: মরহুম আলম আলী জোয়ার্দ্দার। তিনি স্থীয় সম্পত্তির কিছু অংশ 'বড় মসজিদের অনুকূলে ১০৬ শতক জমি ওয়াক্ফ করে যান যাহার ওয়াক্ফ রেজিঃ নং-১৪৬২৭। তিনি ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে উনার রেকর্ডিও সম্পত্তির কিছু অংশ উল্লেখ পূর্বক ওয়াক্ফ দলিল ওয়াক্ফ প্রশাসকের বরাবর বড় মসজিদের অনুকূলে শর্ত সাপেক্ষে রেজিষ্ট্রি করে দেন। যা 'মরহুম আনোয়ার আলী জোয়ার্দ্দার ওয়াক্ফ এষ্টেট' নামে পরিচিত। যে ওয়াক্ফকৃত জমির অংশ রেলবাজার সন্নিকটে বড় পুকুরে ও আলমডাঙ্গা রোডে অবস্থিত কাঁনা পুকুরে ও অন্যান্য স্থানে রয়েছে। 'মরহুম আনোয়ার আলী জোয়ার্দ্দার ওয়াক্ফ এষ্টেট' মসজিদটির উক্ত সম্পদের দেখভালের দায়িত্ব পালন করে আসছে। আজও সেই পরিচালনার ধারাবাহিকতা সুনামের সাথে বংশ পরম্পরায় মুতাওয়াল্লী কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। মসজিদ এরিয়ায় ইমাম সাহেবের থাকার আলাদা রুম ছিল যা জীর্ণশীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সেই ঘরটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে অজু খানার উপরে দ্বিতীয় তলায় আধুনিক ব্যবস্থাপনায় ইমাম সাহেবের থাকার ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। নবরূপে মসজিদটির প্রধান ফটকটি নির্মাণ করা হয়েছে যা দেখতে বড়ই মনোহর। রাতের বেলায় মসজিদের নাম ও সময় সম্বলিত লেখা যখন স্ক্রলিং হয় তখন অনেক সুন্দর দেখা যায়। মসজিদ বাউন্ডারীতে নারিকেল গাছ ও আগে পরে লাগানো আম গাছ এবং অন্যান্য গাছগাছালী আছে।

বিভিন্ন সময়ে মসজিদটির সংস্কার

বড় মসজিদ চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন অংশ দীর্ঘদিন পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ও যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। যে সংস্কার কার্যক্রম প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সরকারীভাবে, বেসরকারীভাবে ও জনগণের সাধারণ দানে বিভিন্ন সালে হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও মসজিদের উদ্দেশ্যে আসা বিভিন্ন ধরনের দানের অর্থ দিয়ে স্থানীয়ভাবে দুইবার মূল মসজিদের বারান্দা ও ডান পার্শ্বে নামাযের জায়গা বৃদ্ধি করা হয়।

---

২২ Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961), P.30.

২৩ *মরহুম আনোয়ার আলী জোয়ার্দ্দার, পেশায় মোক্তার; তার পূর্ব পুরুষগণ জমিদার ছিলেন।*

মসজিদটির অবস্থা ও অবস্থান: মসজিদটির নির্মাণকাল সম্পর্কে অত্র মসজিদের প্রায় ত্রিশ বছরের খাদেম, 'মুন্তাজ আলী'[২৪] বলেন: আমার বাবা মৃত আব্দুর রহমান ও নানা মৃত ক্বারী মুন্সি প্রায় শত বছর উক্ত মসজিদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। আর আমার বাপ, দাদারা মসজিদটিকে এভাবে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। আমরা বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের সংস্কার কাজ দেখেছি বারান্দা বৃদ্ধি করা হয় ১৯৮০-'৮২ সনের দিকে। ইদানিংকালেও সর্বশেষ সংস্কার কাজটি ২০১৭ সালে হয় তখন মসজিদটির ভিতর ও বহিরাংশে প্লাস্টার, মুজাইক ও টাইলস করত আধুনিক ছোঁয়ায় সৌন্দর্য মণ্ডিত করা হয়েছে তবে লতা, পাতা, পুষ্প, খোপকাটা, বিট করা অঙ্কিত অনেক নকশা সংস্কারের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। দরজা, জানালা ও জানালায় গ্রীল লাগানো হয়। মসজিদের মেঝেতে টাইলসের কাজও করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় দানবীরদের মাধ্যমে সুন্দর একটি গেট, ইমামের জন্য পরিবারসহ থাকার ঘর, অজু খানা, প্রস্রাবখানা, পায়খানা, মসজিদের বিভিন্ন অংশে প্লাস্টার ও রঙের কাজ এবং আনুসঙ্গিক সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

মসজিদটির চিত্র

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ও সামাজিকভাবে সালাত প্রতিষ্ঠায় বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গার ভূমিকা

মসজিদ শুধু উপাসনালয় নয়; মসজিদ মুসলমানদের পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও শিক্ষা গ্রহণের ও ইবাদত পালনের পবিত্রতম স্থান। বড় মসজিদ চুয়াডাঙ্গার রয়েছে আকর্ষণীয় দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং অনন্য ভূমিকা। উক্ত মসজিদটি সামাজিক ও ধর্মীয় মিলনমেলা এবং Mass communication centre বা গণযোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবেও স্বীকৃত। যার প্রেক্ষিতে মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এর মাধ্যমে সবার দারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। মানুষ সামাজিক জীব আর মসজিদ একটি সামাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সালাত প্রতিষ্ঠায় ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম। যুগ যুগ ধরে ইসলামী শিক্ষা প্রচার, প্রসার

২৪ *মুনতাজ আলী, মসজিদ পাড়া, চুয়াডাঙ্গা। তারিখ: ২০-০৯-২০২১খ্রি:*

ও বিস্তারে মসজিদটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে উক্ত মসজিদটি অতীতে অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় অবদান রেখেছে ও বর্তমানেও রাখছে যার কিছু নমুনা সংক্ষিপ্তভাবে নিচে উপস্থাপন করা হলো।

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা

মসজিদ সামাজিক যোগাযোগ রক্ষার ও মিলনমেলার প্রাণকেন্দ্র এবং জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ইসলামী শিক্ষার অনেক সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে কিন্তু তৎকালে এমন প্রতিষ্ঠান ছিল বিরল। মসজিদ মহল্লার ও মসজিদ আওতাধীন এলাকার মানুষের জন্য ইসলামী শিক্ষার মারকাজ। তারই ধারাবাহিকতায় অত্র এলাকার শিশুদের শিক্ষার হাতেখড়ি হতো উক্ত মসজিদের আঙিনা থেকেই। মক্তব শিক্ষা যখন বহুল প্রচলিত ছিলো; ভোরবেলায় মসজিদের আঙিনা শিশুদের কলকাকলিতে মুখরিত থাকত। নগর সভ্যতায় গ্রামীণ সেই মনোরমা স্নিগ্ধ সকাল এ প্রজন্মের প্রায় অচেনা। বিশেষ করে সাধারণ মুমিন, মুসলমানদের জীবনে মসজিদ সামষ্টিক কল্যাণে নাগরিক পরামর্শশালা হিসেবে বহু আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। মসজিদকে ঘিরে মুসল্লিরা একতাবদ্ধ হয় ঐক্যের দীক্ষা নিয়ে শ্রেষ্ঠ জাতীতে পরিণত হয়। নামাযে মুসল্লিরা ধনী-দরিদ্রের তফাৎ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে মহান রবের সান্নিধ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে যে মানবিক সাম্যের দৃষ্টান্ত তৈরি করে তা বলে শেষ করা যাবে না। আর এই শিক্ষাকে মুসল্লিগণ যেভাবে বাস্তব জীবনে কাজে লাগায় তা অবর্ণনীয়। যার বাস্তব নমুনা নিম্নোক্ত উদ্দৃতি থেকে স্পষ্ট: 'আবহমান কাল হতে মুসল্লিরা সমাজে সেই সাম্য ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় একে অন্যের আপদে পাশে যেভাবে এসে দাঁড়াতেন। কালক্রমে মসজিদ তার সেই বহুমাত্রিক আবেদন ও ঐতিহ্যগত জৌলুস হারিয়ে ফেলছে। বর্তমানে দৈনন্দিন উপাসনার বাইরে মসজিদ কেন্দ্রিক কল্যাণ ও সেবা তৎপরতা এবং বৈচিত্র্যময় কর্মমূখরতা বিরলদৃষ্ট।[২৫]

সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যেখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই মসজিদভিত্তিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে। আমর ইবনুল আস (রা) মিসর জয় করার পর সেখানে প্রথমে মসজিদ নির্মাণ করেন। সে ধারাবাহিকতায় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই মসজিদভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার যাত্রা। বাঙলা অঞ্চলে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে (প্রচলিত ১২১১-১২১২) লাক্ষ্ণৌ অঞ্চল জয় করার পর সেখানে মসজিদভিত্তিক মক্তব শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করেন। সে মক্তবে মুসলিম শিশুদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও লেখাপড়া করত। ফলে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আরবি-ফারসি ভাষা এই অঞ্চলে দ্রুত প্রসার ও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। দিল্লির মুসলিম শাসকরা তাঁদের অধীন অঞ্চলে মসজিদভিত্তিক মক্তব প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক ছিলেন। এটাকে তাঁরা তাঁদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব মনে

২৫ *দৈনিক যুগান্তর, ০৪ এপ্রিল ২০২০, ১০:৩৯ পিএম। (অনলাইন সংস্করণ)*

করতেন। তবে এটাও সত্য, ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ও ইসলামী দাওয়াত শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ছত্রছায়ায় পরিচালিত হয়নি; বরং দ্বীনি কাজের মিশন নিয়ে একদল নির্মোহ আলেম, দরবেশ ও ধর্মপ্রচারকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রাষ্ট্র তাঁদের সহায়তা করেছে এবং বলা যায়, উদারভাবেই সহযোগিতা করেছে। মুসলিম শাসকদের সহায়তায় এবং এসব নির্মোহ ও দ্বীনের জন্য নিবেদিত আলেমের ত্যাগ ও কুরবানির মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষা এ দেশের মূল ধারার শিক্ষায় পরিণত হয়। সে ধারার বৈশিষ্ট্য ছিল, সরকারি জমিতে একটি মসজিদ হতো, মসজিদের পাশে একটি মাদ্‌রাসা হতো এবং সে মসজিদ-মাদ্‌রাসা পরিচালনার জন্য কিছু সরকারি সম্পদ প্রদান করা হতো। এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর মাদ্‌রাসা শিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষা ধ্বংসের মুখোমুখি হলেও মসজিদভিত্তিক মক্তবের ধারা তখনো অক্ষুণ্ন ছিল। ইংরেজ আমলে স্বতন্ত্র মাদ্‌রাসাগুলো 'লাখেরাজ' ও জায়গিরি সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ায় স্থবির হয়ে পড়ে, বহু মাদরাসা তখন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মসজিদের ওপর ইংরেজদের হস্তক্ষেপ তুলনামূলক কম হওয়ায় মসজিদভিত্তিক মক্তবগুলো চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। যদিও এই অভাব-অনটনের প্রভাব এসব মক্তবের ওপরও পড়েছিল। তাই আমরা বলতে পারি, মসজিদভিত্তিক মক্তবগুলো দীর্ঘ সময় ধরে এ দেশের মুসলিম সমাজের প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজন পূরণ করে আসছে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তৃণমূল পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার উপযুক্ত বিকল্প তৈরি না হওয়ার পরও মক্তবগুলো থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ফলে মসজিদভিত্তিক মক্তব থেকে আগের দিনে যে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করত, তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন আছে। আমি বলব, এ প্রকল্পের ভালো-মন্দ দুটি দিকই রয়েছে। ভালো দিক হলো, সরকার অন্তত দ্বীন শিক্ষার একটি ব্যবস্থা রেখেছে। আগ্রহীদের দ্বীন শেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। খারাপ দিক হলো, এটাকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার রূপ দেওয়া হচ্ছে না শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে না। ফলে তা বিকশিত হচ্ছে না এবং লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না। আমরা প্রত্যাশা করি, অন্যান্য বিদ্যালয়ের সময়সূচি ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সমন্বয় করে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা প্রকল্পকে আরো কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে তোলা দরকার। যেন একটি শিশু শৈশবেই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা লাভ করতে পারে।

সূচনালগ্ন থেকে আজ অবধি উক্ত মসজিদকে ঘিরে বিভিন্নভাবে ইসলামী শিক্ষার বহুবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে আসছে। যেমন: শুরুর দিকে মসজিদের পার্শ্বে একটি 'ফোরকানিয়া মাদ্রাসা' পরিচালিত হতো যেখান থেকে অত্র এলাকার বহু মুসলিম কোমলমতি ছোট্র সোনামনি ছেলে-মেয়েরা কুরআন, হাদীস, ইসলামী আক্বীদা, শিষ্টাচার, আমল-আখলাক শিখে জীবনকে ধন্য করেছে ও করছে। যার সুনাম এখনো অনেকের মুখে মুখে। তবে কালের আবর্তে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার অভাবে উক্ত মাদ্রাসাটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে এখনো মসজিদের সম্মনিত ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেব বয়স্ক মুসল্লি ও শিশু শিক্ষার্থীদেরকে সকাল, বিকাল বিশুদ্ধভাবে

কুরআন শিক্ষা প্রদান করেন এবং তাদেরকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষা দিয়ে ও যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলেন। এখান থেকেই মুসল্লিরা, ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা কুরআন, হাদীস, নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইল ও একজন মুসলিম হিসাবে ফরজ ইলম তথা আবশ্যক শিক্ষার অনেকটা অর্জন করে। অজু, গোসল, ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সুন্নাহসম্মত আমলসমূহ শিক্ষা গ্রহণ করে। আক্বিকা, কুরবানী, উত্তম চরিত্র ও আচার ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়ে ধারণা লাভ করে। ইমাম সাহেবের কাছ থেকে জীবন ঘনিষ্ঠ ও ইবাদত সম্পর্কিত অজানা প্রশ্নের উত্তর জেনে সঠিকভাবে ইবাদত পালন করে। উক্ত মসজিদটি তৎকালীন সময় থেকেই ব্যাপকভাবে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে সমাজের মানুষের শিক্ষার খোরাক জুগিয়েছে এবং ব্যাপকভাবে ধর্মীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সময়েও বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অধীনে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা মূলত আগেকার সেই মূলধারার শিক্ষার গুরুত্ব ও অবদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা নিঃসন্দেহে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিশেষভাবে যখন রমযান মাস আসে তখন মুসল্লিরা বেশি বেশি মসজিদে সময় কাটায়, কুরআন, হাদীস ও ইসলাম ধর্ম শিক্ষার প্রতি বেশি মনোনিবেশ করে। সারাদিন শেষে মাগরিবের আগে ইফতারী নিয়ে সবাই মসজিদ আঙ্গিনায় জড়ো হয়। মুসল্লিরা একে অপরের ইফতারী ভাগাভাগী করে। কোনো কোনো দিন একজন দাতা ব্যক্তি সকল মুসল্লিদেরকে ইফতারী করিয়ে পরস্পর আনন্দিত হয় এবং পরস্পর অগাধ সাওয়াব অর্জন করার দিক্ষা নেয়। যা আমলী জিন্দেগী গঠন করে ধর্মীয়ভাবে মুসলমানদের জীবনে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

সামাজিকভাবে সালাত প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব আর সমাজের বড় একটি অংশ মুসলমান। আর মুসলিম সমাজে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। মসজিদকে ঘিরেই সালাতের মতো ইবাদত পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। তাইতো মসজিদের সালাত প্রতিষ্ঠায় রয়েছে অন্যন্য ভূমিকা। ঐতিহ্যবাহী বড়-মসজিদ, চুয়াডাঙ্গার ভূমিকা অগ্রগণ্য।

নামাজের আরবি শব্দ সালাত। 'সালাত'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা, দরূদ, তাসবিহ বা পবিত্রতা বর্ণনা, রহমত বা দয়া, ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। আল-ক্বামূসুল মুহীত গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

الصلاة أي الدعاء والرحمة والإستغفار، صلي صلاة أي دعا، عبادة فيها ركوع وسجود[২৬] .

ইসলামী শরীয়াতের পারিভাষায় 'শরী'আত নির্দেশিত ক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদতকে 'সালাত' বলা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালাম দ্বারা শেষ হয়'।

২৬ মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী, -ক্বামূসুল মুহীত্ব, পৃ. ১৬৮১।

হাদীসে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে-

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ[২৭].

সালাতের পারিভাষিক সংগায় অনেকে বলেন- 'মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ইবাদত আদায় করার নাম সালাত যা তাকবীর দিয়ে শুরু হয় ও সালাম দিয়ে শেষ হয়'। বিশ্বনবী (সা) যখন মিরাজ গমন করেন, তখন মহান আল্লাহ তাআলা তার ওপর সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। সালাত মুসলিম জীবনে একটি অপরিহার্য ইবাদত। এটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে মুক্তি একমাত্র সোপান। নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। মুসলিম সমাজে নামাজ আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য। প্রত্যেক মুসলমানের উপর দিবা রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। যে মুসলমান ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিবে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নামাজের শিক্ষা, গুরুত্ব, তাৎপর্য অপরিসীম। নামাজ আদায়ের ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিরাশিবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশ্ব নবী (সা) অসংখ্যবার নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা বর্ণনা করেছেন।

সালাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। যে সালাত প্রতিষ্ঠার তাক্বিদ মহান আল্লাহ আল-কুরআনে প্রায় ৮২ জায়গায় দিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে রাসূল (সা) বারবার সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সে সালাত শুধু নিজে পড়তে নয় বরং নিজে ও অন্য ব্যক্তি পড়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে। যে সালাত প্রতিষ্ঠা মসজিদকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়। সূরাতুল বাকারা ৪৩নং আয়াতে মহান আল্লাহ সালাত প্রতিষ্ঠার কথা জানিয়ে বলেন:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ[২৮]

অর্থাৎ, 'আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।'

মসজিদ অর্থ সিজদার জায়গা। যদিও কুরআন শিক্ষা, তিলাওয়াত, জিকির, তাসবীব, তাহলীল, ওয়াজ, নসীহাতসহ সবধরনের ইসলামসম্মত ইবাদত-বন্দেগী মসজিদ কেন্দ্রিক পালিত হয় তবে মসজিদে সালাতই প্রধান ইবাদত। জামাতে নামায পড়ার অবারিত সুযোগ কেবল মসজিদগুলিতে পাওয়া যায়। আর জামা'তে নামায পড়ার প্রতি রাসূল (সা) অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা) বলেন:

صَلاَةُ الجَماعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً. [২৯]

---

২৭ মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯১ 'সালাত' অধ্যায়-৪, 'সালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ-১০।

২৮ সূরা বাকারা : ৪৩।

অর্থাৎ, 'জামাতে নামাজ পড়া একাকী নামাজের চেয়ে ২৭গুণ সাওয়াব বেশি।'

এই সালাত গুরুত্ব বিবেচনায় ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল হয়ে থাকে। রুকূ, সিজদাহ নামাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আর বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় তখন যখন সে সিজদাহ অবনত হয়। মসজিদভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মুসল্লিরা আলিফ, বা হতে কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে নামাযের ক্বেরাত ও নামায সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইল শিক্ষালাভ করে সহীহভাবে সালাত আদায় করে। কখনো এককভাবে কখনো ইমামের সাথে মুক্তাদী হিসাবে। বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে সালাতের গুরুত্ব বেড়ে যায় যেমন: শবে বরায়াত, শবে মেরাজ ও শবে কদরের রাতে এলাকার মানুষ বিভিন্ন ধরনের ইবাদত বন্দেগী পালন করে বিশেষভাবে নফল নামাজের প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম ও অন্যান্য মুসল্লিগণ নিজে নামায আদায় করার পাশাপাশি অন্যকে নামাযি বানাতে, নামাযের শিক্ষা দিতে ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। উক্ত মসজিদ কেন্দ্রীক বিভিন্ন সময়ে দ্বীনের দায়ী ও মুবাল্লিগগণ আগমন করেন এবং নামায প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হন। মহল্লায় মহল্লায়, পাড়ায়, পাড়ায়, বাড়ীতে গিয়ে মানুষদেরকে সুন্দর ভাষা দিয়ে ইসলামের সুমহান কথাগুলো শুনিয়ে নামাযের জন্য ডাকেন। মসজিদে নামাযের পরে নামাযের গুরুত্ব বুঝান, নামায পড়লে কি উপকার এবং না পড়লে কি পরিণাম রয়েছে তা জানিয়ে সতর্ক করেন ও নামাযীকে নামায পড়ার ফযীলতপূর্ণ বয়ান শুনিয়ে নিয়মিত নামায পড়ার জন্য অনুরোধ করেন নির্দেশ করেন। এতে করে ধীর ধীরে নামাযী মানুষ বৃদ্ধি পায়, মহল্লার অনেক মানুষ নামাযী হয়েছে যে কারণে মসজিদ মুসল্লিতে ভরে যায় বিশেষ করে জুম'আর দিনে বহু মুসল্লির সমাগম হয় এমনকি অন্যান্য এলাকা থেকেও অনেকে সৌভাগ্য মনে করে ভক্তির সাথে উক্ত মসজিদে নামাযে সমবেত হয় এবং মনে-প্রাণে প্রশান্তি লাভ করে। যা হতে নিঃসন্দেহে বলা যায় উক্ত মসজিদটি সালাত প্রতিষ্ঠায় অনেক বড় অবদান রাখছে।

উপসংহার

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ও সালাত প্রতিষ্ঠায় মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম যা উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হলো। চুয়াডাঙ্গা জেলার ঐতিহ্যবাহী বড় মসজিদটি মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর এক অনুপম নিদর্শন। যা অসাধারণ স্থাপত্য কৌশলে নির্মিত হয়েছে। যার পরতে পরতে মিশে আছে তৎকালীন যুগের মুসলিম মহীয়সী রমণী ও ইসলাম প্রচারক অলী আল্লাহ, সুফি, সাধক, পীর মাশায়েখদের অমর কীর্তি। যার ইতিহাস ঐতিহ্য স্মৃতির পাতায় লেখা আছে থাকবে চিরকাল। মসজিদটি ইবাদত বন্দেগীর প্রাণকেন্দ্ররূপে বহাল আছে আগামীতেও থাকবে ইনশা আল্লাহ। মসজিদটি ইসলামী শিক্ষা বিশেষভাবে কুরআন শিক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত করার সহীহ পদ্ধতি জানা ও নামায সংক্রান্ত মাসআলা শিক্ষার মারকাজ হিসাবে ও ইসলামের বাণী প্রচারের

---

২৯ *ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৪৬, হাদিসটি সহীহ।*

মাধ্যমে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধার পবিত্র স্থান মসজিদটি কতিপয় ধর্মান্ধ, বিদ'আতী, মুশরিকদের কুসংস্কারে কলঙ্কিত হচ্ছে যা অবশ্যই অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। এ মহান কাজে প্রত্যেককে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে, সাধ্য সামর্থ্যের আলোকে করণীয় কর্ম সম্পাদনের উদাত্ব আহবান জানাচ্ছি। বড়-মসজিদ-চুয়াডাঙ্গা যুগ যুগ ধরে ইসলাম প্রচার, প্রসারে ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এবং সালাত প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট অবদান অতীতে রেখেছে, বর্তমানে রাখছে, ভবিষ্যতেও রাখবে আশা করি। তবে সরকারীভাবে মসজিদ কেন্দ্রিক পরম শ্রদ্ধার পাত্র, বিশ্বাসের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি খতিব, ইমাম ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদেরকে আরো বেশি বেশি যুগ উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইসলামী শিক্ষাকে তথ্য প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করে প্রশিক্ষণ দিতে পারলে ও মাসিক সম্মানজনক বেতন দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করতে পারলে তারা আরও বেশি ইসলামের ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারবে। তাই তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করার জোর দাবি জানাচ্ছি। সর্বশেষে এ কথাই বলতে চাই, ব্যক্তি জীবনে মুক্তির জন্য নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা বাস্তব জীবনে যে যা কিছু করি না কেন পরকালীন শান্তির জন্য নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজ ব্যাপারে হাদীস কুরআনে অনেক বর্ণনা রয়েছে। সেসব বিষয় ছোট আলোচনায় টেনে আনা সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নামাজের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি। পরিশেষে সকলকে মসজিদটি পরিদর্শন করে ঈমানী চেতনাকে জাগ্রত করে ইবাদতে মশগুল হওয়ার এবং সামর্থ্যের আলোকে মসজিদ নির্মাণের সহযোগিতা করবার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। হে আল্লাহ, সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধভাবে জীবন-যাপনের তাওফীক দান কর।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

The Perspective of Islam concerning Violence and Terrorism

Mohammad Zafar Ullah*
Mohammad Moniruzzaman**

[Abstract: Islam, a religion of peace, communal harmony, sympathy, love and affection, teaches for building up close fraternal ties among the communities around the world. In the eye of Islam, a Muslim is one from whose evil acts all Muslims and non-Muslims remain safe. Indeed, Islam has asserted the safety,security and sanctity of lives and properties of all people that occupy a fundamental place in Islamic rules and regulations. Killing and taking away someones, life unjustly is strictly prohibited in the law of Islam. The terrorists of these days are adamant to impose their futile attempts killing innocent people brutally and indiscriminately in the mosques,prayer halls, market places, public places and government offices which are completely unlawful acts and punishable crimes. For such kind of violence and brutality, Islamic law has declared very humiliating and ignoble torments in this world and intolerable punishments in the Hereafter.So it is crystal clear that there is no scope and space of violence and terrorism in the eyes of islam. But, it is a matter of great regret that the international news media consistently try to highlight the Muslim as terrorists and relate all kind of terrorist and extremist activities to the Muslim world.They are not interested in upholding the positive, balanced, harmonious and constructive aspects of Islam.They are completely blind to the peaceful concepts, philanthropic philosophy and humanitarian doctrines of islam. However, they do not cover up and highlight in their news media the Muslim communities' condemnatory and opposite views and attitudes regarding prevalent extremists, militants, terrorists and their cowardly and heinous activities all over the world.]

Indeed, the current generation of young Muslims all over the Islamic world is experiencing intellectual distractions and degradation of faith and religious tenets. The proponents of this doctrine justify their actions in the name of jihad, in this way, they distort the holy Shari'a (Islamic sacred law) provision of Islam. This situation, especially, among the youth, led some Muslims to become skeptical due to confusion over the concept of jihad, because those who commit these atrocities are self-blaming Muslims. They and their groups practice Islamic rituals, perform worship, and display the outward forms of religiousness embedded in Sharia (Islamic sacred law). This puts not only the general Muslims in a fix, but also a significant portion of Islamic scholars have been involved in

* Professor - Department of Arabic, University of Chittagong
** Deputy Director (in-charge), Islamic Foundation, Habiganj.

the demolition activities of this doctrine. Under the above scary situations, we think that it is only necessary to highlight the Islamic view of terrorism in the Western world and in the Islamic world in the light of *Quran, Sunnah* (hadith), classical books of jurisprudence and theology. The underlying purpose is to present this perspective in understanding the institutions of education, important intellectuals and influential decision-making agencies, so that Muslims and non-Muslims who are skeptical about Islam are able to get a clear concept about the view of Islam on terrorism.

Contents:

1. Introduction
2. The significant meaning of Islam
3. Islam's view of killing Muslims unfairly and indiscriminately
4. Islam's view on suicide
5. Islam's view on indiscriminate non-Muslims killing
6. Statement of four *Imams* against terrorism and rebellion
7. Conclusion

1. Introduction: Islam is a religion of peace, harmony and security, it urges others to pursue the path of peace and harmony. The most significant evidence of this is that Allah has named it as Islam.[1] The word Islam is derived from the Arabic word *salam* or *salima*. It means peace, security, safety and protection. As for its literal meaning, Islam denotes absolute peace. As a religion it is peace incarnate. It encourages human kind to be moderate, peaceful, kind, balanced, tolerant, patient and forbearing. Modern-day terrorists in the name of Islam are the previous *Kharijites*[2]. They have no connection with Islam, no matter what religious trappings they take on. They are outside the fold of Islam and have passed through it just as an arrow passes through a hunted game, their criminal acts cannot be associated with Islam or the Muslim. Both the early and later day Islamic scholars have unanimously agreed that -in the light of the *Quranic* verses and *Hadith* reports-the *Kharijite* terrorists have no connection with Islam.[3]

---

1 Allah says: `Truly, Islam is the only din (religion) in Allah's sight?[Quran: 3:19] `And I have chosen for you Islam as a din [Quran: 5:3]and `He (Allah) has named you Muslim [Quran:22:78]

2 The Khrijites are who censured `Ali (r) because of the act of arbitration and disavowed themselves from him and Uthmam (r) and his family and fought against them. [ibn Harjar al-Askalani, Fathul Bari, 1:459]

3 Imam Mohammad b. `Abdal-Karim al- Shahrastani said in his famous book of gresiology, al Milal wa al Nahal:

`Anyone who revolts against the Muslim government that enjoys the support of the community (jama`a) is called a *Kharijite* whether this revolt was against the Rightly Guided Caliphs during the time of the companions or against those after them who followed them with excellence (the second, al Tabiin) or the Muslim rulers of ever subsequent era.[page: 114]

Imam Ibn Taymiyya stated-

`Since they were armed and inclined to fight, their opposition to the community (jama`a) manifested when they started killing the people. How ever , as for today most people (due to

2. The significant meaning of the word 'Islam'

The word Islam is derived from the root word *salima, yaslam, salaman* and *salamatan* as well as other variations Allah says-

Oh believer, Enter Islam (*as-salim*) perfectly and wholly.[Quran, 2:208]

The famous philologist Abu`Amar al-Shybani interpreted the word *silm* as Islam.

The prophet (sm.) said-

A Muslim is he from whose tongue and hands the other Muslims are safe.[narrated by Bukhari, as Sahih, Hadith no. 1o]

Embracing Islam, therefore, means to enter the door of peace and protection, until people become safe from his harm and evil.

According to Abu Mansur Mohammad al-Azhari, Abu Ishaq al-Zujaj narrated from Muhammad b. Yazid in *Tahdhib* al-*Lugha* who interpreted the durance verse-

`Say, peace be upon you, Your Lord has made Mercy incumbent upon himself.'[6:54]

In Arabic the word *salam* has four meanings. Firstly, *Salam* is the verbal noun of `*salima*' (to be free of blemish). Secondly, it is plural form of *salama*(safety and security). Thirdly, it is one of the beautiful names of Almighty Allah (al-*Salam*, the flawless) and fourthly, it is a tree which is shady and evergreen.

According to Al-Zujaj, *Salam* comes from *salama*, which denotes supplication for man to remain safe and secure from hardships and troubles. It implies deliverance from miseries and disasters. *[Tahdhib al-Lugha 4:292]*

Examples from *Quranic* verses and prophetic traditions-

Allah says-

1. *`But Allah saved (sallam) [Quran,8:43*]
2. *`Enter them with peace (bi salam) and security.[Quran,15:46]*
3. *`By this Allah guides those who seek His pleasure to the paths of peace (subuls-salam). [Quran, 5:16]*

Prophetic traditions:

a) *The one from whose tongue and hand the other Muslims are safe.*

[Bukhari, as-Sahih, Kitab al-Iman, Hadith no.10]

Through the reply of the Prophet (sm) in this *hadith* he has removed the objection of some people, who question,` whose Islam should we accept and Islam should we reject? He (sm) provided a crystal clear vision of Islam and said that the best Islam is of those from whose hands and tongues all human are safe.

---

their religious garb and appearance) do not know of them.... and their `passing through the religion' is their leaving it because of their having declared lawful the blood and wealth of the Muslims. [al-Nabuaat, page-222]

b) *That you serve food and give the salutation of peace to the one whom you know and the one whom you do not know.*

[Bukhari, as-Sahih, Kitab al Iman, Hadith no.12]

c) According to ibn `Umar (r) the Messenger of Allah said-

The Muslim is the brother of his fellow Muslim. He does not wrong him or leaves him helpless. Whoever attends to his brother's need, Allah will attend to his need. If some one relieves a Muslim of a distress in the world, Allah will relieve him of one of the distresses of the day of Resurrection. And if some one covers the fault of a Muslim, Allah will cover his faults on the day of Resurrection.

[Bukhari, as-Sahih, Kitab al Mazalim, Hadith no,2310]

d) According to `Abd Allah b. Mas`ud (r) the Prophet (sm) said-

Reviling a Muslim in immorality and fighting him is disbelief.

[Bukhari, as-Sahih, Kitab al Iman, Hadith no. 48]

According to this *Hadith*, using foul words and abusive language against some one is corruption and fighting and killing with the disbelief; how worse it would be to take up arms and kill civilian?

Various verses of *Quran* and prophetic traditions provide the proof for the first lexical meaning of Islam. They also illustrate that every noun or verb derived from Islam and every derivative or word conjugated from it, essentially denotes peace, protection, security and safety.

The lexical and literal meaning of the word Islam, illustrates that it inherently means peace, security, protection, safety from violence and killing and also means protection and security. There is no room in Islam for strife, mass murder, destruction, anarchy and chaos.

That is why all Islam neglects extremism and terrorism fervently.

3. Islam's view of killing Muslims unfairly and indiscriminately

a) The sanctity of believers is greater than Ka'ba

There are some people who declare that the majority of the Muslims are disbelievers, polytheists and innovators on account of political, ideological or religious difference and subsequently massacre them ruthlessly. They must know the sanctity and honor of a believer's life in the sight of Allah and His Messenger (sm) The Prophet (sm.) declared the honor and dignity of believer greater than that of the *Ka`ba*, the sacred house of Allah. Imam Ibn Majoh transmitted a *hadith* on this subject. `Abd Allah b. `Umar said-

`Once' I saw the messenger of God circumambulating the K`aba and he was addressing it. `How excellent you are and how sweet your smell is; How grand you are and how grand your sacredness is; By the one is whose hand is Mohammad's soul. The inviolability of a believer's property and blood is greater in the sight of Allah than your sacredness. We must think only well of believer."

[Ibn Majah in al-Sunan: kitabul Fitan -3932]

b) Merely pointing a weapon at a believer is prohibited

Killing people with explosives or other weapons is a grave sin, but even pointing a weapon towards a believer is forbidden and the one who does it is cursed. Abu Hurayra reported that the Messenger of Allah (sm.) said-

`None of you should point a weapon at his brother, for he does not kno, for perhaps the devil may draw it out while it is in his hand, resulting is his falling into a pit of Hell.

[Muslim, as Sahih, Hadith no. 2617]

Jabir (R.) said-

The Messenger of Allah (sm.) forbade that an unsheathed sword be handed to someone else.

[Tirmidhi, al sunan, kitab al Fitan, Hadith- 2163]

While a drawn sword -or any other weapon for the matter-may cause injury, displaying it might provoke one to violence. What can be a greater proof of Islam`s status as a religion of peace, security and advancement, for the word *`Maslul'* used in the aforementioned *hadith* essentially indicates that defence institutions charged with keeping when must also adopt foolproof security measurse to ensure that their weapons will not be misused.

c) The illegitimacy of violence against Muslim

Islam not only outlaws the mass killing of Muslims but the whole of humanity without any discrimination on the basis of caste, colour, race or religion. One can appreciate the value and inviolability of human life in Islam by realizing that the act of killing a human being has been equated with slaughtering the entire human race. In connection of human dignity, Allah says in the *Quran*.

`Whoever kills a person, except as a punishment for murder or [as a prescribe punishment for bloodshed, robbery and spreading] disorder in the land, it is as if he killed all of humanity. [Quran: 5;32]

This verse highlights the sanctity of human life in general. The sanctity of a man or women the old or the young, the rich or the poor has not been specified. The point being that the *Quran* not only prohibited killing a man without any justification, but has also declared that it is akin to the murder of humanity entire. As for the law of retribution which authorizes capital punishment for a murder, it has been legislated for safeguarding the sanctity of human life.

d) Becoming An accomplice to terrorists is also a crime

The Prophet (sm.) categorically forbade people to provide help or material support to terrorists. He ordered us to isolate them and deny any numerical strength, financial assistance and moral support. Abu Hurayra (r) reported that the Prophet (sm.) said-

`If anyone helps in the murder of a believer even if with only a few words he will meet Allah with the words written on his forehead; `Hopeless of Allah`s mercy"

[Ibn Majoh in al sunan, Kitabul diyat, Hadith no. 2620]

This *hadith* also indicates that it is not only financial and numerical assistance that must be denied to terrorists. But according to the expression *`bi shatri kalimatin'* (a few words) speeches or writing which lend support to the enemies of peace are also condemnable and must be banned. Such support can only deprive us of God's forgiveness and mercy. This *Hadith* contains a strict warning to those who mastermind terrorist acts misinterpret the *Quran* by brainwashing youth with glad tidings of Paradise for murdering peaceful civilians.

e) Those who attack Muslim are the greatest wrongdoers

Islam not only teaches its adherents to maintain peace and observe tolerance with other communities, but it also instills in them a respect for the beliefs and view points and norms of those who do not share their faith and creed. To launch attacks against opponents, their properties and sacred sites on account of religious, ideological or political difference is not only against the express spirit of Islam but is inhumane as well. Those who violate the sanctity of the house of Allah and kill peaceful and devout worshippers' through bomb explosions and suicide attacks are neither true believers nor people of guidance. Those who hinder people from making mention of Allah's name in mosque, by spreading terror and intimidation, through violence and terrorism are grave sinners and enemies of peace; the *Quran* in fact, declares them the greatest wrongdoers and warns them of an immense suffering in the Hereafter.

`And who is more unjust them he who forbids the remembrance of Allah's name in the place of prostration and strives to demolish them?[Quran,2:144]

f) Killing Muslims is a greater sin than destroying the world

How can wrongdoers, who brutally kill peaceful citizens to realize their vicious objectives, claim to be the stalwarts of peace and security? They are engaged in the wanton killing of thousands of non-combatant Muslims through their terrorist activities; however, the Prophet (sm) declared that killing a Muslim is a greater sin than destroying the whole world.

`Abd Allah b. `Amr reported that the Messenger of Allah said-

Certainly, the passing many of the entire world is less in the sight of God then the murder of a single Muslim.

[al Tirmidhi, in al Sunan, kitab al-diyat, no.1395]

g) Bloodshed is the greatest of all crimes

Mass murder, bloodshed and unjust killing are such a grave offence that God Most High will take those who commit them to task before any thing else on the Day of Resurrection. `Abd Allah b. Mas'ud (R) reported that the Prophet (sm) said while describing the enormity of shedding blood unlawfully.

`The first issue that will be judged between people on the Day of Resurrection is that of blood (i.e. murder)

[al Bukhari, al-Sahih, kitab al diyat, no.6471]

`Abd Allah b. `umar (r) reported that the Prophet (sm) warned about the disastrous consequences of fighting and bloodshed and said-

`Of the serious matters from which no one who brings it upon himself and falls into it will escape is that of blood that was shed unlawfully.

[al- Bukhari, al Sahih, kitab al diyat Hadith no. 6470]

4. Suicide:

a) Islam's view on suicide

Suicide is forbidden in Islam. The one who commit suicide defies God and becomes a resident of Hell. Before examining the revealed texts that forbid suicide, let us consider why it is forbidden.

Human life is neither owned nor acquired, it is a gift and trust from God. The blessing of life serves as a basis for all other blessings. It is for this reason that Islam directs people to safeguard their lives and forbids suicide. Islam does not allow any human being to take his or her own life. On the contrary, the teaching of Islam emphasizes the safety and security of life and body. These teachings aim at preserving human life and ensuring the continuation of human life and ensuring the continuation of humanity.

The *Quranic* texts and *hadith* reports on suicide:

As mentioned earlier, the real owner of life and death is Allah. So, just as murdering a person is akin to murdering all of humanity; so, too is suicide considered a despicable act.

Allah says-

`And do not cast yourselves into destruction with your own hands and adopt righteousness, verily, Allah loves the righteous.[Quran, 2:195]

Allah also says-

Do not kill yourselves' [Quran, 4:291]

In the *Hadith* reports from the Messenger of Allah we find that the one who commit suicide is threatened with severe torment in the Hereafter Abu Hurayra reported that the Messenger of Allah said-

`Whoever throws himself off a mountain, thereby killing himself, he will throw himself down a mountain in Hell forever. And whoever drinks poison, there by killing himself, he will hold poison in his hand, eternally drinking it in Hell. And if someone kills himself with iron he will eternally stab himself with it in Hell. [al Bukhar , Al-sahih, kitab Al tibb, Hadith no. 5442]

Thabit b. Al Dahhak reported that the Messenger of Allah (sm.) said-

`Whoever kills himself with something will be tormented by it in the Hellfire.[al Bukari- Al-sahih, Hadith no. 5754]

According to these traditions, the method of suicide will continue in Hell as well. That shows the gravity of this sin. Other transgressions will be punished through the torment of Hell, but suicide is such a heinous offence that the method will continue.

b) Paradise is forbidden for the one who commits suicide

The masterminds of terrorism who groom and brainwash young people for suicide bombings and encourage them with dreams of Paradise by means of ` martyrdom" should realize that God has decreed a permanent terming in Hell awaiting those who commit suicide.

Jundub b. `Abd Allah reported that prophet (sm.) said-

`Amongst those before you, was a man who was wounded. Unable to bear the pain, he took a knife, sliced his wounded hand and died due to excessive bleeding. Allah most high said, ` My slave decided to hasten his own demise, So I made paradise forbidden for him '.

[Bukhari Al-Sahih, kitabul ambia- 3276]

This *hadith* reports do not grant permission to someone suffering from a trouble or ailment to kill himself in order to be freed from misery, It someone commits suicide, he has earned Hell for himself.

c) The Prophet (sm.) did not offer the funeral prayer over people who committed suicide

We can infer the gravity of suicide from the fact that the Messenger of Allah did not offer the funeral prayer over those who committed it. Its seriousness can be further inferred from the fact that the Prophet (sm.) would supplicate even for worst enemies and offer the funeral prayer over a vowed hypocrites until the divine order was revealed, commanding him to abandon that practice but he would not offer the funeral prayer over the one who committed suicide.

Imam Muslim reported from Jabir b. Samura (r.) who said-

`someone who killed himself with a spear was brought to the Prophet (sm.) but he did not pray over him.

[Muslim, as Sahih, kitab Al Janaiz- 978]

A deep study of Islamic teachings and thought reveals that Islam is a religion of peace, security and protection and true believers in the sight of Allah and His Messenger (sm.) are those who embody those qualities. Moreover, they also exemplify the lofty qualities of tolerance, forbearance and moderation.

On the other hand, there are people who- in the name of making Allah`s word uppermost- tread the dangerous path of hatred and prejudice, extremism, violence injustice and oppression. They murder civilians and seize their wealth. Their claims to Islam are null and void. As false bearers of the banner of Islam and self-appointed defenders of faith, they do not have even the remotest link with Islam.

5. Islam's view on indiscriminate non-Muslim killing

In the preceding pages, we demonstrated in the light of the Quran and prophetic traditions that Islam is a religion of peace that guarantees the protection of life, property and honour for all members of society, without any discrimination on the basis of caste, colour, race and religion. In this chapter we

will establish that protection of the life, honour and property of Non-Muslim citizens living in any Islamic state or any Non-Muslim country is a binding duty upon the Muslims in general and the Islamic state in particular.

a) The killing of Non-Muslim citizens makes paradise forbidden for the killer

The non-Muslim citizens of an Islamic state enjoy the same rights and safeguards as their Muslim counterparts. The first right endowed upon them by Islamic state is that of protection against external aggression and domestic oppression and encroachments, so they can live their life peacefully, inwardly and outwardly.

Abu Bakr (R.) reported that the Prophet (sm.) said-

`Any Muslim who unjustly kills a non-Muslim with whom there is a peace treaty, God will make paradise forbidden for him.'

[Al-Nasai, in al Sunan, kitab al qasma -4747]

Therefore, the one who unjustly murders a non-Muslim citizen will not approach paradise; rather, he will be kept away from it by a distance of forty years. Commenting on his *hadith* Anwar Shah Kashmiri writes in his book Fayd al-Bari;

`Anyone who kills a non-Muslim under treaty will not smell the fragrance of paradise, even though its fragrance can be smelt at a distance of forty years, the quintessential meaning of it, dear brother, can be expressed as such: You know the gravity of the sin for killing a Muslim for its odiousness has reached the point of disbelief, and it necessitates that forever. As for killing a non-Muslim citizen, it is similarly no small matter for the one who does it will not smell the fragrance of paradise.

[Anwar sah kashmiri and ; Fayd al-Bari al sahih al Bukari 4:288]

b) The retribution of Muslims and Non-Muslims is the same

In Islam retribution is necessary when someone murders someone else intentionally, whether the victim is Muslim or non-Muslim: however, the payment of monetary compensation is obligatory if it was an accidental killing. Allah says,

`And there is a life for you in retribution O wise people so that you may guard, [Quran : 2:179]

Regarding unintentional killing Allah says,

`Whoever kills a Muslim unintentionally shall free a male or female Muslim and pay blood money to be handed over to the heirs of the person slain unless they forgot it [Quran, 4:92]

In the former verse retribution or the command to kill the murderer for his crime of murder has been described. There is a complete consensus amongst the Muslim community that the unjust killer should be killed by way of retribution, unless the heirs of the killed pardon the killer. The latter verse mentions monetary compensation. In Islamic law, if someone accidentally and

unintentionally kills someone else he or she is ordered to pay blood money to the heirs of the killed.

`Abd al-Rahman b. Baylamani (r.) said-

There was a man from the Muslims who killed a man from the people of the book'. The case was presented to the Prophet (sm.) and he said, ` I am most responsible of all for fulfilling the rights of those under his care[non-Muslim]. Then he ordered[the killing of the Muslim killer by way of retribution] and he was killed.

[Shafii; Al Musnad p. 343]

It is clearly established from these prophetic traditions that Muslims and Non-Muslims share an equal status with respect to monetary compensation and retribution.

The position of the *Hanafi* School of jurisprudence is that a Muslim should be killed in retribution for killing a non-Muslim citizen. This position is supported by the general import of the texts within the *Quran* and *hadith* which make retribution obligatory. Muslim and non-Muslim blood shares an equal amount of inviolability and sanctity without any discrimination. Imam Al-Nakhai ibn Abi layla, Al shabi and Othman Al Batti also share this view held by the *Hanafi* School.

A doubt may emerge from hearing the saying of the Prophet (sm.)

`A Muslim is not to be killed in retaliation for murdering a disbelieves; [Al - Bukhari, Al-sahih kitab al ilm-111]

So what does it mean? The jurists explained this and said that here the word `disbeliever' does not imply a peaceful citizen: it signifies a combatant who is killed. There is to be no retribution in this case. This is an international law in effect in all countries of the world and there is no difference of opinion about it.

The great jurist and *Quranic* exegete, Imam Al-Jassas, stated that in this *hadith,* `a disbeliever' means the non-Muslim in a state of war. It does not mean the non-Muslim who in a citizen of an Islamic state or a peaceful non-Muslim citizen of a non-Muslim state. [*Al Jassas Ahkam Al quran, pp.140-144]*

c) The illegitimacy of killing foreign delegates

Islam teaches peace and tolerance in national and international affairs.

According to the teaching of the *Quran* and *hadith,* it is forbidden to kill a diplomat hailing from a hostile nation who comes to a Muslim state for the purpose of diplomacy. Many non-Muslim diplomats and delegates' would come to the Prophet (sm.) on various occasions and he not only treated them with utmost respect, but also instructed his companions to treat them well. It is even recorded that the representatives of Musaylama the liar, a false claimant to prophet hood, visited the Prophet (sm) and confessed to their apostasy, yet the Prophet (sm) treated them well because they were diplomats.

`Abd Allah b. Masud (r) said-

I was in the presence of Allah's Messenger (sm) when this man [`Abd Allah b. Nawaha] and another man came as official representative of Musylama the liar, the Messenger of Allah (sm) asked them, `Do you bear witness that I am the Messenger of Allah? They said to him, `We bear witness that Musaylama is the Messenger of Allah!' The Messenger of Allah said to them, `I believe in Allah and His Messengers. Were I to execute ambassadors, I would have executed both of you.'

[Al Dailami, al- Sunan, Hadith no-2503]

See that despite the apostasy and disbelief of Musylama's followers, extreme tolerance was shown towards them. They were not punished in any way. Because they were diplomats, they were neither imprisoned nor ordered to be killed.

This statement of Messenger of Allah (sm) set the precedent in international law with respect to diplomatic protection. This further illustrates that all the personal staff in an embassy on diplomatic assignments are entitled to the same treatment and it is impermissible to kill them.

d) The illegitimacy of harming a non-Muslim citizen out of revenge

According to the *Quran* and *Sunna*, every person is responsible for his or her actions. According to this rule, only the doer of an act of injustice is liable to punishment, and no one else can be held responsible for that. The punishment for his or her crime cannot be awarded to his or her family, friends or tribe. Allah says-

`And whatever (sin) each soul earns (its evil out come) falls back upon it. And no bearer of burden will bear another's burden. Then you are to return to your Lord alone, and He will inform you of wherein you used to differ [Quran, 6:164]

Islam does not allow anyone to punish common people for the oppressive actions of oppressors. The Prophet (sm) said-

`No man amongst them [the peaceful non-Muslim citizens] shall be punished as a penalty for the injustice of a co-religionist.

[Abu Yusuf, Kitab al Kharaj, p.78]

All of this clearly demonstrates that those who seek to exact revenge by terrorizing and killing people from other nations oppose and violate the manifest *Quranic* injunctions and prophetic traditions.

e) Humiliating non-Muslim citizens is forbidden

Just as the humiliation and violation of a Muslim's dignity is forbidden in Islam, it is also forbidden to disgrace and dishonour a non-Muslim citizen. No Muslim is allowed to abuse a non-Muslim, or slander or attribute falsehood to him or her. Islam also restrains its followers from making mention of any flaw in person of a non-Muslim, which may be associated with his or herself, family or lineage.

Once the son of `Amr b. al `As the Governor of Egypt, punished a non-Muslim unjustly. When a complaint of this injustice reached caliph `Umar (r) he

made the non-Muslim Egyptian publicly exact the same punishment upon the Governor's son, and uttered the historic sentence, which according to some researchers characterized the struggle during the French Revolution-

`Since when have you regarded people as your slaves, while their mothers gave birth to them as free man?

[al- Hindi, Kanz al Ummal 2:455]

The Prophet (sm) enjoined his followers to treat non-Muslim citizens with excellence. It is the duty of the Islamic state to guarantee the protection, of the non-Muslim citizens against oppression, wrongs and excesses. If the Islamic state fails to deliver justice and security to its non-Muslim citizens, the Prophet (sm) declared that he would be the advocate of such oppressed people and that he would restore to them their rights on the Day of Judgement.

f) The illegitimacy of killing non-Muslim women

Many people are killed in non-Muslim countries, in addition to Muslim countries, in the unending wave of terrorism. The terrorists invoke the anti-Islamic actions of non-Muslim countries to justify their terrorism and contend that since these governments play to role in either killing Muslims or getting them killed through different means, they are justified in killing their citizens in retaliation. This argument is contrary to the fundamental teachings of Islam and contravenes the character of Islam. Islam does not allow the killing of non-Muslim in times of war- much less in times of peace. Islam`s jurisprudential tradition has articulated what is called in the West the Just War Theory, and has detailed regulations that guide the conduct of its soldiers during war. Thus, the killing of women during war is prohibited.

`Abd Allah b. `umar (r.) said-

A woman was found slain in one of the expeditions. Upon this the Messenger of Allah forbade the killing of women and children. [Narrated Al Jihad wa al Siyar -2852]

g) The illegitimacy of killing the children of non-Muslim

The strict and total prohibition prescribed against killing peaceful non-Muslim children is another humane principle of Islam. Compare and contrast the actions of the self-proclaimed defenders of Islam with those of the Prophet (sm); the reality will be laid bare for every one to see and the intentions of these terrorist elements will become clear. Would that they had held the prophetic traditions in due esteem and felt shame while shaping their destructive design!

The Prophet (sm) forbade the companions -with very harsh words from killing the children of non-Muslims and repeated his prohibition for effect. Aswad b. suri, (r) said-

`We were once in a battle and gained the upper hand and killed many of the pagans, including some children. News of this reached the Messenger (sm) and he said-`what is wrong with some people that they went so far as to kill children? Beware! Do not kill children at all! Some one asked why O,

Messenger of Allah? Are they not the children of the pagans'? He replied `Are the best amongst you not from the children of pagans?'

[Nasai, al- Sunan, Kitab al Siyar, no.2463]

h) The illegitimacy of destroying the cattle, crops and properties of the enemy

Islam neither allows the unjust shedding of blood, nor does it approve of the scorched earth policy of total war. Islam calls for reform and peace. Therefore, it takes care that those fighting for its sake do not destroy crops and fruit-bearing trees, or burn down properties.

Imam al Tirmidhi quoted the following saying of the First Rightly Guided Caliph in this regard-

Abu Bakar al Siddiq (r) forbade people to cut down fruit-bearing trees or destroy building [during the war] and the Muslims abided by his instruction after that.

[as-Sunan , kitab-al Siyar, 1552]

In the light of the aforementioned explanations, it is evident that even when war is imposed on Islam, and the Muslims are made victim of external aggression and the Islamic state is compelled to order its armies to fight in defence, children, women and the elderly can not be killed. Furthermore, damaging crops, destroying buildings, properties and places of worship are also strictly forbidden. How can Islam, which does not allow these practices during jihad, condone and approve the killing of non-combatants who are not directly involved in the aggression and who are going about their daily routines? It is abundantly clear that such activities are in direct contravention of the teachings of the *Quran* and *Hadith*.

If any external power chooses to flex its military muscle against the non-Muslim citizens of an Islamic state and aims to attack them in any manner, it is incumbent upon the Islamic government to take urgent measures to protect them.

It is obligatory for us to go out and wage war against them (who Commit aggression against the non-Muslim citizens of an Islamic state) with military might even through we may die in the process.

[Shihad alDin al Qarafi, al-Furuq 3:14-15]

It is clear in the light of the *Quranic* verses, prophetic traditions and sayings of the jurists that no Muslim has the right to kill a non-Muslim citizen nearly on the basis of his being non-Muslim and it is unlawful to plunder his wealth or dishonor him. In addition, Islam not only guarantees the protection of the life, honor and property of non-Muslim citizens, but it also gives complete protection to their places of worship.

6. Fatwas of four Imams against terrorism/The four imams' views on terrorism

After having produced evidence from the Quran and Hadith we present here the views of the Four Imams of jurisprudence. The objective is to make it clear

that Uamma has been unanimous on this issue for the last fourteen centuries and that there has been no departure or deviation from the mainstream.

a) Imam Abu Hanifa

Imam Abu Hanifa has said in his book, *Al-fiqh al-absat*, regarding fighting the terrorists:

So fight against rebels on account of their rebellion, not because of disbelief. Be with the just and moderate group and do not be with the people of rebellion. If there is to be found oppressors and corrupt individuals amongst the mainstream majority group [*Jamaa*]; then there are also righteous people amongst them who will help you against them. If the *`jamaa'* is itself in state of rebellion, withdraw yourself from them and go to others. God Most High says-

`Was Allah`s earth not spacious enough for you to migrate therein? [Quran 4:97] and `Indeed, My earth is vast so worship me alone ; [quran 29 :52]

[Abu Hanifa , al - Fiqh al Absat, p.606-607]

b) Imam Malik

Imam Sahnun recorded in al-*Mudawwna*;

Imam Malik said regarding the *Ibadis*, the *Hruriyya* and the people of vain desires, `I am of the view that repentance should be sought from all of them. If they repent [well and good], otherwise they should be killed; Ibn al-Qasim said, `And Malik said regarding the *Haruriyya* and their ilk, `They should be killed if they do not repent [of their destructive activities]- provided it is a Muslim state. `This shows you that if they rebel against a just ruler and desire to kill him, and call to their way of understanding, they should be invited to the community [jama`a] and the correct belief [sunna], and if they refuse they should be killed. And I asked Malik about the biased partisans who were present in the Levant and he said, `I am of the view that the government should invite them to return and deal justly between themselves, and if they return and deal justly between themselves and if they return [well and good], otherwise they should be fought.'

[Sahnun, al-Mudawwana al-kubra, 3;94]

c) Imam Al-sha`fii

Imam al-Shafii said about terrorists

If there is a group of people who are shedding blood and seizing wealth in either populated areas or barren wastelands, they take the same legal ruling as highway robbers. The gravity of their crimes is equal whether it takes place in a populated area or a barren wasteland; but if they split up, then the crime that takes place in the populated areas in the severer of the two.

[Al-Shafii al-Umm 4;218]

If rebels are invited [to lay down their arms] but refuse to comply they are to be fought..... It is only permissible to fight rebels when they are engaged in fighting; and they are never seen as fighters unless they are pressing forward withholding obedience and doing so resolutely. So whenever these qualities are absent they are no longer in the state in which it is permissible to fight them, and

never do they abandon these things except that their blood is considered inviolable as it was before [Their rebellion]. *[Al-Shafii al-Umm 4;218]*

d) Imam Ahmad b. Hambal

The illustrious Imams have always thought moderation, self-control, tolerance and harmony to save people from mischief, terrorism and bloodshed. Despite immense pressures and severe hardships, including imprisonment and lashing, Imam Ahmad b. Hambal did not provoke the Muslim masses against the government of his day. He suffered his trials due to a well-known controversial issue in Islamic doctrine regarding the createdness or uncreatedness of the *Quran*. Declaring Gods speech, the *Quran* created was the single most dangerous tribulation the *Umma* had faced.

The belief in the createdness of the *Quran* was a product of the extremist beliefs of the *Mutazilites*, who were the intellectual heirs of the *Kharijites* were highly influential in the government. It was for this reason that many of the notable personalities of the Muslim world suffered serious opposition and oppressive measures taken by the government against them.

Imam Ahmad b. Hambal was amongst those who suffered the most during this tribulation. He was lashed and tortured but despite all the oppressions he suffered, he dissuaded people from armed revolt and rebellion against the government. Examples of his forbearance and perseverance have been chronicled in many famous books. Of them, Abu Bakra al-khalal`s al Sunna presents many accounts of his life and surrounding events. Abu al Harith narrated that he asked Ahmad b. Hambal about the rebellion movement launched against the government of the Baghdad. The Abbasid rulers under the influence of the Mutazilites were causing serious troubles to the common Muslim, but when Imam Ahmad b. Hambal was requested to join and support a rebellious movement against the government he said-

> *`Glorified is Lord! In no way do I consider it lawful to shed blood, nor do I command it. For us to be patient in these circumstances is better than tribulation in which blood is shed and in which wealth is seized and people's honour is violated.*
>
> *[al-Khalal in al- Sunna p.89]*

These citations from the illustrious imams and jurists of the four legal schools amply demonstrated that they were in unanimous agreement regarding the impermissibility of rebelling against the Muslim government. It is the responsibility of the government to assert its authority and jurisdiction and the citizens of the Muslim state must provide full support to the government in crushing armed rebellion.

7. **Conclusion**

All these sayings and texts prove that a Muslim is the person who embodies peace, holiness and protection for the entire human race. After all, Islam its broader vision is a religion that assures peace and security for all levels of people

individually and collectively. Our verdict that today's terrorists are *kharijites* is not on the basis of independent reasoning; rather we have concluded on the basis of the *Quran* and the *Sunna*. The *Kharijites* are not just the old group that rebelled against our master, Ali (ra), of course, they were their precursors. All the Islamic scholars of the first and last ages have agreed that according to the Quran and Hadith, Islam has nothing to do with the *Kharijites*. The moral teaching of Islam is that such people are rebellious and it is the duty of the state to eliminate them. It is the state's responsibility to eradicate the *Kharijite* cancer from society. Vigilantism is not allowed in the Islamic sacred law. No individual or private band agency is permitted to hoist weapons with the intention of eradicating terrorists and bringing peace back to society.

Reference:

1. Al Quran al-Mazid
2. Asqalani, Ibn Hajar, Fath al Bari, Beruit, Darul Marifa, 1379 ah.
3. Bukhari, Abu Abdullah, Al-Jami as Sahih, Beruit, Dar ibn Kathir, 1987
4. Hindi, Husan al Din, al Kanzul Ummal, Beruit, Mu`ssasa, al Risala,1979.
5. Ibn Ibrahim, Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, Beruit, Dar al Marifa, n.d.
6. Ibn Taymiyya, Ahmad b. Abd al-Halim, al Nabuwwat, Beruit, Darul Fikr,1308 ah
7. Jassas, Abu Bakr, Ahmad Ibn Ali, Ahkamul Quran, Beruit, Dar Ihya, al-Turath al Arabi, 1405 ah.
8. Nasai, Ahmad b. Shuayb, al Sunan, Beruit, Dar al Kotob al Ilmyah 1995
9. Qarafi, Shibab al Din, Al -Furuk, Beruit, Dar al Kotob al Ilmyah 1998
10. Shafii, Muhammad Ibn Idris, Al Musnad, Beruit, Dar al Kotob al Ilmyah, n.d.
11. Shafii. Muhammd ibn Idris, Al umm Beruit, darul Marifa, 1393ah.
12. Shabrastani, Muhammad ibn abdul Karim , Al Milal, wa al Nihal, Beruit, Darul Marifa, 2001.
13. Sijistani, Abu, Dawud, al Sunan, Beruit, Dar al Fikr, 1994.
14. Tirmidhi, Abu `Isa Muhammad, al Sunan, Beruit, dar Ihya la Turath al `Arabia n.d.
15. Qazwini, Ibn Majah, al Sunan, Beruit, Dar al Fikr, nd.
16. Daylami, Abu Shuja, Al Firdaws bi Mathar a Khitab , Mecca
    Darul kotob al Almiya, Beruit,1986
17. Darimy, Abdul Allah, Al Sunan, Beruit, Darul kitab al Arabi, 1407.
18. Nishaburi, Mushim b. al Hajjaj , al Jami al Sahih, Beruit, dar Ihya al Turath al Arabia, n.d.
19. Tanukhi, Sahnun b. Said b. Habib, Al Mudwwana al Kubra, Beruit, Dar Sadir, n.d.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

دور اللغة العربية في فهم الشريعة الإسلامية

د. عبد الله المعروف محمد شاه عالم*

[Abstract : This article examines the extent of role of Arabic Language in understanding sacred Islamic Shar`ah through its detailed evidences. Main sources of Shari`h law are the holy Quran and holy Tradition of Rasulullah (sm). Islamic jurisprudence has been originated from these to sources which are actually revelation of Almighty Allah. Text of both of the sources is Arabic and authentic books of different school of thoughts and works of Islamic scholars over the ages are written in Arabic. Knowledge of Arabic language contains understandings of characteristics of this language through knowing Grammar, rhetoric, semantics and deferent meaning of words, phrases at the high level. So, now a days, some attempts to teach the holy Quran by some people with very limited knowledge in Arabic is deadly dangerous for the society. This research work is a guideline to realize importance of Arabic language and literature for true understanding of Islamic Shari`ah.]

التمهيد: الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وأله وصحبه أجمعين. لقد منَّ الله على الأمَّة الإسلاميَّة، بل على كافَّة البشريَّة بالدين الإسلامي دينا شاملا وكاملا. فالدين يتكون على ثلاث ركائز أو عناصر مهمَّة وهي العقيدة الصحيحة باسم اللإيمان والقوانين المتقنة باسم الشريعة وتحسين المعاملة وتزكية النفس باسم الإحسان .وقد سأل عن هذه الأمور الثلاثة حامل الوحي جبريل الأمين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جبرائيل"[১] وكانت هذه حادثة غريبة إذ يأتي أجنبى يسأل كتلميذ ثم يقول صَدَقْتَ كمعلم- ولم يكن أحد معلِّما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله عزَّ وجلَّ-عند

* أستاذ في قسم العربية، جامعة داكا وعضو جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجمع الفقه الإسلامى لمنظمة التعاون الإسلامى (OIC)

১ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، صحيح البخارى، كتاب الإيمان، (مكتبة رحيمية، ديوبند، ب ت)، ج১، ص ২-৩.

ذالك كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ستار هذه الأعجوبة فقال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم."[٢]

هنا في هذه الحديث الشريف كلمة: "دينكم" يمثل الإيمان والشريعة والإحسان.

فالإيمان، نقطة الثقل فيه التصديق بالجنان. والأعمال تترتب على هذا الإيقان. أما الشريعة فهى ما يمارسها المؤمن طول حياته في حركاته وقد تستجد الأمور على مر الزمان وعلى اختلاف الظروف والبيئة. وهذا يتطلَّب الفهم والتعمُّق في مصادرها العربية. وأما الإحسان فهذا أكثر ما يتعلق بالقلب في صفائه وذالك أيضا يتورط بالتطبيق والتحقيق في الواقعية اليومية.

فبما نحن لا نتناول العناصر الثلاثة بالتفصيل لضيق المساحة تمَّ اختيار الشريعة بالأدلة التفصيلية. لأن الأدلة مكتوبة باللغة العربية. فإذا لا نقدر على فهم اللغة العربية على ما يرام لا نفهم الشريعة بأدلتها التفصيلية. ولا شك، هناك دور مهم جدًّا للُّغة العربية لفهم مقاصد الله تعالى عبر الشريعة الإسلامية.

فالشريعة هى الاحكام الدينية أو بكلمة أخرى القوانين الإسلامية العملية من المهد إلى اللَّحد حتى من اختيار الزوج والزوجة إلى أن يدفن تحت التراب. فلا تجد أية ثغرة خالية من حكم الإسلام في حياة الإنسان ومماتة وفي تعامل الناس مع الحجر والشجر والحيوانات والنباتات بل جميع الخلائق. وبالتالى دائرة فهم الشريعة دائرة واسعة جدا. ولا يختلف أحد بأن مصادر الشريعة هى باللغة العربية، ألا وهى كلام الله المجيد والسنة النبوية وعليهما يتبنئ الإجماع والقياس. والوحى متلوا كإن أو غيرمتلو، لا يعمل به إلا بعد الفهم الصحيح. ولذالك دور اللغة العربية في فهم الشريعة الإسلامية مالابد منه. وخصوصا عندما يخوض أحد في أدلتها التفصيلية يحتاج إلى فهم قواعد اللغة العربية بأشملها والبلاغة مع فصاحة مفرداتها، وهذه مؤهلة أساسية. مع ذالك، هذا لا يكفي في فهم المفردات الواردة في القرآن والسنة.

---

٢ المرجع السابق

ولذالك يحتاج العالم إلى الحديث لتعيين التفسير للآية القرآنية والتفسير يحتاج إلى المعاني والبيان من البلاغة.

ففى هذه الأيام نلاحظ بعض الحريصين على تعليم القرآن قبل الحصول على علوم القرآن يتكلم ما يشاء مِن هواه أو مِن استقراء القواميس بدون فهم معانى القرآن والسنة على نهج الفصاحة والبلاغة والعرف العربي والحديث النبوى وما إلى ذالك من المقومات لفهم الشريعة. ولذالك نلمح إلى بعض تلك النقاط بالاختصار.

قبل أن نسرد صلب الموضوع، إليكم واقعتان لهما المناسبة الواضحة مع عنوان هذا البحث. فالواقعة الأولى حدثت من البسطاء الذين يدَّعون أنهم يعرفون اللغة العربية لأنهم شاركوا دورة لستة أشهر مثلاً فعرفوا كثيرا حول اللغة العربية. فقال أحدهم في حفلة سمّها حفلة تعليم القرآن الكريم: أول إنسان لتاريخ البشرية كان امرأة وادعى انه ثابت بآية الله البينة: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ".[٣]

هنا "واحدة "كلمة مؤنثة وكلمة "زوج "بمعنى بعلها. لأن الزوج لفط مذكر .أنظروا كيف استدل على وهمه وقدم آية الله العربية بدون فهمها عن قواعدها اللغوية .فإذا قيل له : هنا لفظ "النفس" مؤنث سماعى ولذالك جاءت صفته بالتأنيث وأما لفظ "زوج" فهذا يدل على المرأ والمرأة على السواء. فلا مانع لكون أول الانسان مذكَّرا. وإذا سأل الرجل: ما هو المانع لكون أول الإنسان إمرأة ؟ فأجيب عنه: هذه الآية لا تمنع بادى النظر، أما الآيات الكثيره الأخرى تمنعه منعا باتًّا. فمثلا قول الله عزَّ وجلَّ: "**وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِأٰدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ**". وقال تعالى: "**وَقُلْنَا يَٰٓأٰدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا**".[٤]

ففى الآية الأولى: جاء أمر الله للسجدة لأدم وليس للحواء -وفي الآية الثانية: أريد بـ "زوجك" أم البشرية "حوَّاء "عليها السلام - لأن "الزوج" يطلق على الرجل والمرأة على السواء

---

٣ سورة النساء، الآية: ١

٤ سورة البقرة، الآية: ٣٤-٣٥

وأما كلمة "نفس" هى مؤنث سماعى ولذالك جاء نفس واحدة. وبالنسبة للمؤنث السماعي، فأن العرب كانوا ولايزالون يستعملون بعض الكلمات مؤنثة بدون علامة وهى المؤنثات السماعية- كالشمس "تستعمل مؤنثا في اللغة العربية، كما جاء في القرآن الكريم: "**وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ**".[٥] هنا جاءت كلمة "تجري "فهل توجد أية علامة للتأنيث هنا في الشمس .فهى نجمة كالنجوم- فهل في النجوم ذكر وأنثى؟ بل يرجع تسميتها إلى سماع من العرب .فالنفس هى مؤنث سماعى وليس مؤنثا حقيقيًّا. حتى لفظ "مؤنث" يستعمل مذكرًا، لولا معناه حدد للمرأة.

وما جعلني أن أسجّل هذه السطور إلا لاستعراض السذاجة المضحكة لأولئك البسطاء الذين يدَّعون أنفسم مدرسى القرآن الكريم بعد أن عرف ذُلًّا من المفردات من اللغة العربية . ولم نتجاهل هذه السذاجة لظاهرة فشت في مجتمعنا في أوساط المثقفين الجاهلين بالعربية.

وقد قال سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه: "من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون."[٦]

والواقعة الثانية وقعت في جلسة والمباحثة في المؤسسة الإسلامية لوزارة الشؤون الدينية لبنغلاديش في فبرائر من عام 2017 عندما دار االحوار عن قضية توحيد أعياد المسلمين، فهناك قال أحد المباحثين المعارضين: إننا لانعتمد على العلوم لأن في كتب الفقه عبارة: "لاعبرة لقول المنجّمين". فأجبنا له: يا أسفا لبعض علمائنا! يُضلُّون العوامّ بقلة فهمهم للفروق اللُّغوية. فالمنجّم ليس عالما وليس التنجيم معترفا بالعلوم الحديثة. فالمنجمون هم الكهنة الحَمَلة للظنون المتوارثة .وأما علماء الفلكية أو الفلكيون تعتبر أقوالهم. بل أنتم أيها المعارضون تعتبرونها اعتبارا بالغا حتى تؤدون الصلوات الخمس وتحدِّدون أوقات الإفطار والسحور بتوقيت الساعة على رصغكم وفي جوَّالكم وذالك حسب العلوم الفلكية-فعرفوا

٥ سورة يسين، الآية: ٣٧

٦ أحمد بن حمدان الحرانى، صفة الفتوى والمفتى والمستفتى، ص ه

خطأهم وما تترتب عليه- فهذه الواقعة خير دالة للخسارة التى تنبثق من قلة فهم اللغة العربية في أوساط علماء الدين، فيخلط الحبل بالنابل ولا يفرقون بين "التنجيم (Astrology) و بين علم الفلك. (Astronomy) ففى الحديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.[৭] فهذا عن الكهنة وأصحاب التنجيم .وأما قول الله تعالى: "**الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ**".[৮] أو قول الله تعالى: "**هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِیْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ** ".[৯] فهذه الآية حجة واضحة على ثبوت علم الفلك وعلم تعداد السنين والشهور والأيام والحساب الدقيق.

فعدم فهم الفرق بين كلمتين عربيتين كيف جاء بخسارة فاضحة في تعيبين غرة الشهر لشعب مسلم!

الفهم باللغة العربية يضمن فهم الفصاحة والبلاغة من علم المعاني-لأن هناك فرق بين قواعد النحو والبلاغة. فمثلا، الآية القرآنية "**وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ**".[১০]

فمعناه في منظور النحو "أرسلناك فقط رحمة وليس لأي شئ آخر. وهذا المعنى يعارض قول الله عز وجل : **اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا ۙ وَّدَاعِیًا اِلَی اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِیْرًا**.[১১]

أمَّا معنى الآية عن منظور البلاغة "أرسلناك بصفة عظيمة مهمة وهى رحمة للعلمين، مع أن لك صفات أخرى. "وهذه القاعدة تسمى في البلاغة "قاعدة قصر وحصر ." التى تقال في الانجليزية Stress / Amaphasi فاالترجمة بالبنغالية على منوال علم النحْوِ:
(আমি আপনাকে জগতসমূহের "রহমত" ছাড়া আর কিছু হিসেবে পাঠাইনি)

---

৭ سنن ابى داود.
৮ سورة الرحمن، الآية ০৫
৯ سورة يونس، الآية: ০৫
১০ سورة الأنبياء، الآية: ১০৭
১১ سورة الآحزاب، الأية: ৪৫

والترجمة على منوال البلاغة: (আমি তো আপনাকে জগতসমূহের রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি)

والقرآن كلام الله في شاهق البلاغة والبديع وهكذا السنة النبوية هى جوامع الحكم مليئة بالمجاز والاستعارة والكناية وما إلى ذلك.

إذن فهم الشريعة يعتمد على فهم اللغة العربية ولاشك فيه .يقول ا.د .محمد رواس قعلة جي:[١٢]

"وأما من تلمس الحشمة والادب في التعبير، وخاصة فيما يتصل بالالفاظ الجنسية، وقد لجأت (العربية) بعد الاسلام إلى الكناية والمجاز، وكان لها في ألفاظ القرآن وعباراته أسوة حسنة: "**نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ**"[١٣]، "**وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ**"[١٤]، "**اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء**"[١٥]، **وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ** ..."[١٦]وما إلى ذلك من كريم العبارات ونبيل الالفاظ".

فالمسائل الفرعية تفرعت في النصوص على ضوء المعانى الظاهرة والباطنة من الحقيقة والمجاز والكناية. والكناية أبلغ من الصريح بعد الأحيان- والكناية لها دورها في البيان عندما تسمية الشئ مباشرة تتعذر على لسان الشرف، مثلا حول الحديث عن الجنس: ففى الآية "أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ" معناه **الجماع** كنايةً، إلى ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة (رحمه الله تعالى)- ومعناه **اللَّمس** الحقيقى صراحة إلى ما ذهب اليه الإمام الشافعى (رحمه الله تعالى). ولذالك إذا حدث مجرد اللَّمس مع المرأة ولو بدون اختبار نقض الوضوء عند الشافعى (رح) ولا ينقص عند الأحناف ولكلٍّ وجهة النظر على قاعدته الكلية.

فإذا قام مفتى بإفتاء، لابد له أن يراجع إلى معاني المفردات قديما وحديثا "ومن هنا كانت القاعدة في فقه اللغات بوجه عام، أن الكلمة الواحدة تعطى من المعانى والدلالات بقدر ما يتاح لها من الاستعمالات[١٧].

---

١٢ محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء (بيروت: دار النفائس ١٩٨٥م)، ص ٢١.

١٣ سورة النساء، الآية: ٢٢٣

١٤ سورة النساء، الآية: ٣٤

١٥ سورة النساء، الآية: ٤٣

١٦ سورة النساء، الآية: ٢١

١٧ صبحى الصالح، دراسات في فقه اللغة (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٦م)، ط٦، ص ٢٩٢

وهناك كلمة "صلاة" كانت بمعنى "الدعاء" اصلًا ثم تطورت إلى معنى الصلاة كركن من أركان الإسلام وكعبادة ودعاء بهيئة خاصة وبأعمال متعينة. فكلمة "الصلاة" اصطلاحا لا تقتصرعلى معنى الدعاء فقط. والمعنى القديم له صلة مع المعنى الجديد: "فكلمة مثل "قطار" تدل على قطار سكة الحديد، ولكن معناها المعجمى القديم: الإبل يسير الواحد منها وراء الآخر".[১৮]

وفي المسائل الفقهية: "الماء المتقاطر" لابد لطهارة الثياب. فالتقاطر من قطرة الماء. وجاء هذا من سؤال صحابى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقدار الماء في غسل الثياب للتطهير.

فلابد للمفتى أو الدارس للمسائل الشرعية أن يكون كامل الإدراك بمعنى المفردات مع خواصّ الأبواب الصرفية ومدلولاتها في ذالك العصر .فالعصر النبوي تميز باللغة العربية بمدلولات شتى، حتى نرى أن الأحاديث النبوية تحمل كلمات لها معانى وعلى الشارح اختيار المعنى المناسب. والكتاب "النهاية" لابن الأثير كان لسد هذه الحاجة. فهو كتاب مهم لفهم معنى المفردات في الأحاديث.

فالاستنباط من مصادر الشريعة ثم التعبير عن الحلال والحرام والجائز وغير الجائز أمر ليس سهلا.

يقول الله عز وجل "وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ".[১৯]

قال أبوالحصين الأسدى:

"إن إحدكم ليفتى في المسألة لو وردت على عمربن الخطاب لجمع لها أهل بدر".[২০]

---

১৮ د. محمد رواس قلعه جي و د. حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء (بيروت: دار النفائس ১৯৮৫م)، ، ص ২২

১৯ سورة النحل، الآية: ١١٦

২০ الإمام أحمد بن حمدان الحرانى ، صفة الفتوى والمفتى والمستفتى ، ص هـ

قال الامام الماوردى (المتوفى في سنة ٤٥٠هـ) أما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد، والتصدى للتدريس والفتيا، فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه أن لا يتصدى لما ليس له بأهل فيضل به المستهدى ويزّل به المسترشد وقد جاء الأثر. بأن أجرأكم على الفتيا أجرأكم على جراثم جهنم.[٢١]

وجاء في فيض القدير شرح الجامع الصغير: أن الحديث رواه الدارمي عن عبيد الله بن أبى جعفر مرسلا: أجرأكم على الفتيا أجرؤكم على النار.[٢٢]"

مع ذالك، نرى أن الناس يسئلون آئمة المساجد بجوارهم ما يحلو لهم من المسائل صعبا أو سهلا. وكيثرا ما يحدث أن الإمام يجيب ارتجالا كأنه متقن فيه، وليس كذالك، بل انه يستحى أن يقول: "لا أعرف"- فهذا بلاء عظيم- رحم الله الامام الشعبى "سئل عن شيء فقال: "لا أدرى" فقيل الا تستحي من قولك: لا أدرى وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت "لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا".[٢٣] فإذا كان كبار المشايخ العرب يترددون في الإفتاء فما بالك من الذين لا يعرفون اللغة العربية جيّدا وهم يفتون في المسائل الشريعة الفرعية بالفور؟!

فالذي له رخصة أن يبدأ بالرأى عن الشريعة والمسائل الفرعية هو الذى يتوفر فيه مؤهّلات لازمة بهذا الصدد؛ وعلى رأسها علمه باللغة العربية على مستوى عالى ثم عبوره في الفن "الفقه واصول الفقه". وما يتطلب لهذا الغرض من المؤهلات. والمهم هو يعرف الكتب المعتمدة وعباراتها العربية مع المصطلحات الفقهية.

فقد جاءت في الموسوعة الفقهية الكويتية:

"ونستطيع أن نقرر أن عرفنا الآن لا يطلق لقب "فقيه" إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه.[٢٤]

---

٢١ المرجع السابق

٢٢ محمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج ١، ص ١٥٨، انظر صفة المفتى ص: ه

٢٣ الفتوى ص ٩

٢٤ الموسوعة الفقهية (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت)، ط١، ٢٠٠٤م، ص ١٤.

ولا يفوت بنا أن نوضّح الفرق بين المسائل العقدية والمسائل الفقهية .فالإسلام لا يترك زمام هذا الفن على أيدى العوام بل العوام يقلدون العلماء الأكفاء- وبالتالى لا علم يعتبر إلا بفهم اللغة العربية في حق الإفتاء وإبداء الرأى في موضوعٍ مَّا.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

"والحق أن التقليد في العقائد والمسائل الأساسية في الدين، وهى المعلومة من الدين بالضرورة لا تقليد فيها لعالم، مهما كانت مكانته، بل لابد من اقتناع تام بثبوتها عن صاحب الشرع ولو بصفة إجمالية. أما المسائل الفرعية التى تتطلب النظر في الأدلة التفصيلية، فأن تكليف العامة بالنظر في الأدلة تكليف شاق لا تستقيم معه الحياة، إذ لو كلفنا كل مسلم أن ينظروا في كل مسألة نِظْرَة المجتهد فان الصناعات ستتعطل ومصالح الناس ستهمل -وما لنا نطيل الكلام في ذالك، وسلف الأمة - وهم خير القرون كما شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم- لم يكونوا كلهم مجتهدين، بل كان المجتهدون قلة قليلة، وكان المكثرون منهم لا يتجاوزون الثلاثة عشر شخصا[২৫]."

والمسوسوعة تضيف: "ومن العجب أن بعض هؤلاء المغالين يقول :إنه يكفي الشخص ليكون مجتهدا أن يكون لديه مصحف، وسنن أبي داود وقاموس لغوي، فيصبح بذلك مجتهدا لا حاجة له إلى تقليد إمام من أئمة المسلمين، فلو أنه يكتفي بالمصحف وبسنن أبي داود والقاموس لكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مجتهدين؛ لأنهم إما عرب خلص، أو نشأوا في بيئة عربية خالصة، وشاهدوا أحداث التنزيل، وقريبو عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك الإدعاء يكذبه الواقع".[২৬]

"...فأقلّ ما يجب أن يتصف به المجتهد: أن يكون متعمقا في اللغة العربية، عالما بالناسخ والمنسوخ، والعام والخاص والمطلق والمقيد، إلى غير ذلك مما يتطلب إعدادا خاصا، لا يتوفر إلا للقلة القليلة المتفرغة.[২৭]

---

২৫ المرجع السابق، ص ٤٠

২৬ المرجع السابق، ص ٤١

২৭ المرجع السابق، ص ٤١

والعلم باللغة العربية تتطلب أيضا للمعرفة عن القاعدة الكلية التى بغيرها تتعارض الأحكام الفرعية وتشتت الأحكام في الجزئيات، وهذا غير وارد ولا يرام في هذا الفن.

يقول الإمام القرافي: "ومن جعل يخرّج الفروع بالمناسبات الجزئية، دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت."[٢٨]

فمن البداهة، لا يتأتى فهم الكلية إلا بفهم اللُّغة العربية جيدا حتى يدرك العلة الجامعة بين جزئيتين أو مسئلتين مختلفتين.

فالفقيه مهما ارتقع مستواه أحوج ما يكون إلى الرجوع إلى المفردات العربية وفهمها، لأن اللغة العربية لها لونان قديم وحديث. وقد جرَّبت شخصيا كيف يساعد علم اللغة على فهم المسائل الفقهية .فقد مررت بعبارة فقهية: "فوائد الصيام كثيرة ....منها: سكون النفس الأمارة، وكسر سورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح."[٢٩] ...فتحيرت في تشكيل "سورتها" أو هى "سُورتها" أو "سَوْرتها" أو أو ....فإذا أنا أمام الأبيات للشاعر ابي نواس:[٣٠]

اِكسِر بِمائِكَ سَورَةَ الصَهباءِ ** فَإِذا رَأَيتَ خُضوعَها لِلماءِ

أى هدى شدة الخمر بالماء .....فوجدت أن هذه الكلمة التى استعملها الفقيه المشهور د. وهبة الزحيلى (رحمه الله تعالى) في كتابه "الفقه الإسلامي وأدلته" "وهو سورى جنسيةً، بليغ في الأداء وفصيح في سردا المفردات المناسبة"-هى سَوْرَةٌ أى حِدَّةٌ و وشِدَّة- فمحمدت الله عزّ وجلّ بأنى كاستاذ اللغة العربية وأدبها تمكنت من تبنى الجسر بين الأدب والفقه. واللغة العربية وأدبها معين زلزال يستفيد بريّها فهم الفقه والنصوص الشرعية.

نعم، الشعر العربي معرفته أيضا من المؤهَّلات ليكون صالحا للإفتاء عن الاحكام الشرعية الفرعية.

---

٢٨ د. عبد العزيز محمد عزام، القواعد الفقهية، ص ١٦

٢٩ الدكتور وهبة الزحيلي، اللفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر: ١٩٨٥م)، ط ٢، ج٢، ص٥٦٩

٣٠ ديوان أبى نواس الحسن ابن هانى (بيروت :دار الكتاب العربى، لبنان، ب ت)، الباب الثامن، ص ٢٣٦

العلم بأشعار العرب يعين فهم اللغة العربية وبالتالي يعين على فهم القرآن والسنة، مما يستمد الفقه مسائله.

"وكان ابو عمرو بن العلاء (ت 154ه) يرى أن فهم لغة القرآن الكريم وتدبُّر معانيه غاية كل مسلم، وإن ما حفظ من شعر العرب ونثرهم ينبغى أن يكون أداة فهم لغة القرآن الكريم، لأنه إنما نزل بلغتهم".[৩১]

قديما قال ابو فراس الحمدانى "**الشعر ديوان العرب**، أبدا **وعنوان الأدب**".[৩২]

وإن رئيس المفسرين سيدنا عبد الله بن عباس (رضى الله عنه) كان يستمد من أشعار العرب أيضا. وكان في ذاك الزمن لا يطمئن الناس إلا بشواهد من الأشعار.

فقد روى الإمام السيوطى (رح) في الاتقان[৩৩]: "ان ابن عباس كان جالسا بفناء الكعبة وقد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن، قال نافع بن الازرق لنجدة بن عوير: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم لديه، فقاما إليه، فقالا :إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتُفسِّر لنا، وتأتينا بماصدقه من كلام العرب، فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فقال ابن عباس: سلانى عما بدا لكما.

فقال نافع :أخبرنى عن قول الله عزّ وجلّ: "**عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ**"[৩৪]

فقال ابن عباس :العِزون: خلق الرفاق

قال نافع :وهل تعرف العرب ذالك؟

---

৩১ د. قلعه جى، المصدر السابق، ص ٢٥

৩২ ديوان ابو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان (ولد في الموصل في عهد سيف الدولة)، دار الكتاب العربى، ص ٠٩، ص ٢٠٠، في قصيدة ديوان العرب.

৩৩ جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطى، الإتقان في علوم القرآن (القاهرة: مكتبة الحلبي، ١٣٧٠ه/١٩٥١م، انظر : المدخل ٢٥

৩৪ سورة المعارج، الآية: ٣٧

قال ابن عباس :نعم، اما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : فجاؤوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا.

ومن شروط المجتهد في استنباط الأحكام:[٣٥]

(١) معرفته بالادلة السمعية (٢) التأكد من دلالة اللفظ في اللغة العربية وفي استعمال البلغاء (٣) والقدرة على الموازنة (بين الأدلة)"....

ذكر ابن القيم: أن الامام الشافعى رضى الله عنه قال فيما رواه عنه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقّه : "لا يحل لأحد أن يفتى في دين الله إلا رجل عارف بكتاب الله تعالى .... بصير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم...ويكون بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن... إلى أن قال- وليس كل من اشتغل بالفقه أو الَّف فيه أو حفظ مجموعة من الأحاديث يُعَدُّ مجتهدا".[٣٦]

وبعضهم صرح في ذكر الشروط أن يكون عارفا بعلوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم "...[٣٧]

ويجدر بالذكر أننا لسنا بصدد استقراء الشروط للاجتهاد بل بصدد مدى **أهمية اللُّغة العربية في فهم المسائل الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية.** والأدلة هى بالعربية -اللّهُمَّ، بعض الأمور تتطلب خبرة خاصة وانها في الحقيقة تساند الموضوع- ولا استقلال بالعلوم الكونية، بل فهم اللغة العربية هى البنية التحتية على كل حال .

قال الآمدى: "وأما ما لابد منه استمداد أصول الفقه، فعلم الكلام والعربية والأحكام الشرعية".[٣٨]

---

٣٥ علال الفاسى، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص ١٦٥

٣٦ ابن قيم الجوزية، **اعلام الموقعين** عن رب العالمين، ج١، ص ٤٦

٣٧ د. عبد العزيز محمد عزام، القواعد الفقهية، ص ٢٤٨

٣٨ أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ٦٣١هـ)، **الإحكام في أصول الأحكام**، ج١، ص ١٠ ؛ المرجع السابق، ص ١٧

فالعلم بالعربية حتم لازم لفهم الفقه وأصول الفقه، لان المصادر والمراجع كلها بالعربية ولا يستغنى أحد بعدد من الكتب المترجمة ليدعى أنه فهم الشريعة إلى درجة مرجوة.

يقول د. قلعه جي:

"فاللغة مرآة تنعكس عليها حضارة الأمَّة ونظمها وعقائدها، واتجاهاتها العقلية... فبعد الفتوحات الإسلامية دعت مرافق العمران من زراعة وصناعة وتجارة وملاحة وحياكة، وطراز وهندسة وبناء... وما أشبه ذالك من الحرف والفنون إلى الأخذ عن الامم الأخرى عادات ومصطلحات ومسميات جديدة في المأكل والمشرب والملبس والفرش والزينة والحلى والأوانى والادوات والاسلحة والأجهزة والطب والصيدلة. ولما لم يعهد العرب التعبير عن هذه المستحدثات في حياتهم الأولى، فقد أخذوا في نقل قسم من الفاظها الأعجمية بعد تعريبها والتصرف بها، كما لجؤوا إلى الاشتقاق والتوسع في الكناية والمجاز أيضا، هكذا تولَّدت الفاظ جديدة."[٣٩]

الخاتمة: فمن خلال هذه العجالة استعرضنا بعض الجوانب لأهمية اللغة العربية في فهم الشريعة وذالك كان واضحا في قول الله عز وجل "**مَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ.**"[٤٠]

وكان اللسان لخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو لسان عربي مبين. يقول عز وجل: "**الٓرٰ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ ۔ اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ قُرۡءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ۔ نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ اَحۡسَنَ الۡقَصَصِ بِمَاۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ ۚ وَاِنۡ كُنۡتَ مِنۡ قَبۡلِهٖ لَمِنَ الۡغٰفِلِيۡنَ۔ اِذۡ قَالَ يُوۡسُفُ لِاَبِيۡهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّىۡ رَاَيۡتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوۡكَبًا وَّالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ رَاَيۡتُهُمۡ لِىۡ سٰجِدِيۡنَ.**"[٤١]

فمن البداهة، العلم باللغة العربية من أوجب الواجبات لفهم وتفهيم الشريعة. والتبحر بها ولازم لاستنباط المسائل الفقهية من الكتب المتداولة المعتمدة من الفنون، لا استغناء عنها لمفتى حتى من الطبقة الأدنى.

---

٣٩ د. قلعه جى، المصدر السابق، ص ١٨، معجم الفقهاء، ص ١٨

٤٠ سورة ابراهيم، الآية: ٠٤

٤١ سورة يوسف، الآية: ١-٤

ومع ذلك دعت الحاجة إلى جمع بعض المعلومات المتعلقة لسد الظاهرة الخطيرة في مجتمعنا، وهى جرأة البسطاء بقيام تعليم الشريعة والمسائل الفقهية بدون المؤهلات اللازمة باللغة العربية التى تتطلب لمثل هذه الوظيفة.

وأرجو أن بحثنا هذا يضيء القراء ولو بنطاق ضيق لاستنارة الوعى في هذا المجال ويجلب الخير عاجلا أو آجلا، إن شاء الله تعالى.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬২ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

الإسلام سبيل الحضارة المثلى والمجتمع الأفضل

[ইসলাম উত্তম সমাজ এবং আদর্শ সভ্যতা গড়ার মাধ্যম]

*الدكتور محمد خير الإسلام

**تنوير حسين

Abstract: Islam plays a pivotal role in the construction of an exemplary and virtuous society providing a comprehensive framework for social development. Islam emphasizes on principles fostering justice, compassion, and harmonious coexistence. In an Islamic society there will be some key principles include the promotion of moral integrity, faith, and justice. Islam encourages the establishment of upright character, belief in Allah, and adherence to principles of justice as fundamental components of individual and collective life. Education, culture, and economic progress are actively endorsed in Islam. The religion encourages the pursuit of knowledge, appreciation for diverse cultures, and economic prosperity through both spiritual and worldly means. Islam recognizes the importance of balanced progress encompassing the spiritual, intellectual, and material aspects of human life. Islam places great emphasis on the equitable distribution of rights and responsibilities between men and women. The empowerment of women is seen as integral to the development of a prosperous society. Acts of charity, environmental stewardship, and social empathy are integral to the Islamic social fabric. Islam promotes long-term social tolerance and cohesion through charitable deeds, ethical behavior, and a sense of shared responsibility. By upholding these values, Islam provides a blueprint for the construction of an exemplary society that strives for justice, compassion, and the well-being of all its members.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين و بعد. نحن نشهد في العالم الوأنا من الحضارات في القديم والحديث ولم يشهد حضارة المثل لبناء مجتمع أفضل كحضارة الاسلام . لأن في الاسلام شرائع كثيرة لتنميه الفرد والمجمع مثلا يكون فيه الأمر بالمعروف

* الأستاذ المشارك، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة جغونات، داكا، بنغلاديش

** الباحث، الماجستير في الفلسفة، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة دكا، دكا، بنغلاديش

والنهي عن المنكر وهذه الأوامر ان كان من الامر او النواهي يتبدل الرجل عن الفواحش والقبائح كي يصلح الناس ويبدل القلب عن الحضارات المذمومة في حياته, اذا كان الرجل يتقى عن المحذورات فالمجتمع ايضا يبدل بوقيه عن القذر - وهذه الحضارة تتوارثها الاجيال يرثها اللاحق عن السابق ومامن أمة من الام في عصر من العصور الاولها تأثيرها على هذا المد الحضاري المتوارث تارة بالنماء ولازدهار وتارة بالجمود والتوقف، واخري بالانحراف وسوء التوجيه واذا نظرنا في الحضارات القديمة والحديثة أدركنا وقصورها وانحرافها وسو توجيهها - فالحضارة الاسلامية متأسَّسة من الإيمانية المهتدية التي تنبثق عن عقيدة التوحيد، عقيدة الفطرة التي بعث بها رسول الله ﷺ في فترات التاريخ عبر القرون والاجيال لاستقامة الناس عليها وتخليصهم عن عبودية الاهواء والشهوات وشرك الأحياء والأموات . والحضارة الإسلامية حضارة دينية و لا يفصل بين الدنيا والأخرة. فاذا كان الناس يتبع الحضارة الاسلامية في أمور الحياة يتغير الثقافة والحضارة بنفسها مع تبديل المجتمع

حينما نقول: "الإسلام والحضارة" يتبادر إلى الأذهان أن الحضارة: شيء غير الإسلام، لأن كلمة "الحضارة" جاءت معطوفة على "الإسلام". والعطف يقتضي التغاير –كما هو مقرر في أصول العربية.-

مفهوم الاسلام يضاف إلى ذلك أن كلمة "الإسلام"قد وردت في القرآن بدلالاتها المتعددة، سواء قصد بها أصل الدين الإلهي الشامل لكل ما نزل من عند الله[١] "**اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ**".

أو أريد بها: الإسلام -المتمثل في فعل التكاليف الشرعية الظاهرة- المقابلة للإيمان المستتر، في القلب. كما في قوله تعالى[٢]: "**قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ۗ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ**".

أو أريد بها: ما خُص به محمد صلى الله عليه وسلم، من الدين الخاتم، الذي أتم الله به الرسالات الإلهية، كما في قوله تعالى[٣]: "**اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ**".

---

١ القران الكريم، سورة ال عمران :١٩

٢ القران الكريم، سورة الحجرات :١٤

٣ القران الكريم ، سورة الماءدة :٣

أما كلمة الحضارة: فهي كلمة عربية، يراد بها: ما يقابل البادية، أو يراد بها: سكان الحواضر -من القرى والمدن- بخلاف البدو: الذين ينتقلون في سكنهم، من مكان، إلى مكان، طلبًا للماء، والكلأ. ومن هنا: ارتبطت حياة الحضر، بالاستقرار-الذي يكون نتيجته: الزراعة، والصناعة، والبناء- وكل مظاهر التقدم المادي[٤].

مفهوم الحضارة:

كلمة "الحضارة": لقد شاع استعمال هذه الكلمة في العصر الحديث شيوعا كبيرا، وغدت تتردد في كل وسائل الإعلام من مقروءة، ومسموعة، ومرئية، وأصبحت مناط التفاخر بين الأمم، ومعقد الرجاء عند الشعوب، بعد إن سارت بها أقلام الأدباء، والكتاب. وركز عليها العلماء، والمؤلفون -علما بأن دلالة هذه الكلمة ليست موضع اتفاق- ومن ثم: قد يفهمها البعض بمعنى، ويفهمها الآخرون بمعنى آخر، الأمر الذي يستدعي تحديدا للدلالة، حتى يتم التفاهم، ويزول الالتباس. ومن ثم: نرى ضرورة بيان معناها في اللغة، والاصطلاح، أولا، وقبل كل شيء.

والحضارة لا تظهر في أية أمة من الأمم: إلا في صورة وحي، يهبط من السماء، يكون للناس شرعة، ومنهاجًا. أو هي على الأقل: تقوم أسسها -في توجيه الناس نحو معبود غيبي- بالمعنى العام للغيب، فكأنما قدر للإنسان: ألا تشرق عليه شمس الحضارة، إلا حيث يمتد نظره: إلى ما وراء حياته، الأرضية.[٥]

الحضارة" في العربية:

يرى أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة : أن حضر-الحاء، والضاد، والراء-: إيراد الشيء، ووردوه، ومشاهدته. وقد يجيء ما يبعد عن هذا، وإن كان الأصل واحدا. فالحضر: خلاف البدو. وسكون الحضر: الحضارة[٦]

قال الشاعر:

فمن تكن الحضارة أعجبته *** فأي رجال بادية ترانا

قالها أبو زيد -بالكسر- يريد "الحِضارة".

وقال الأصمعي: هي "الحَضارة" -بالفتح

---

٤ ابن الفارس ، المعجم المقائس (بيروت: المكتبة الإسلامية صفحة، ٢٢٣)

٥ ابن الفارس ، المعجم ا المقائس ،المرجع السابق، ص١٢٠

٦ المرجع السابق

وإذا كانت الحضارة: خلاف البداوة. فإن معرفة البداوة: ربما يسهم في بيان معنى "الحضارة "، ومن ثم يقول ابن فارس في مقاييسه:

"بدو: الباء، والدال، والواو: أصل واحد. وهو ظهور الشيء: يقال: بدا الشيء، يبدو، إذا ظهر. فهو باد. وسمي خلاف الحضر: بدوا، من هذا، لأنهم في براز من الأرض، وليسوا في قرى تسترهم أبنيتها. والبادية: خلاف "الحاضرة"

ولما كانت "الحضارة" تعني: الإقامة في الحضر -أي القرى الساترة: لساكنيها- بخلاف البادية، التي لا ساتر فيها: أصبح المعنى اللغوي لكمة "الحضارة ": متضمنا لمعنى الاستقرار، الذي ينشأ عن سكنى المدن، و القرى، حيث يكون الإنسان حاضرا فيها غالبا، وذلك بخلاف البادية، التي يغيب فيها ساكنها، ويترحل من مكان، إلى مكان طلبا للماء، والكلأ. وهكذا نرى أن الحضور: يفضي إلى المشاهدة، والشهادة. على حين: لا شهود. ولا شهادة: للغائب.

الحضارة في الاصطلاح :

إن معنى "الحضارة" في اللغة- كما انتهينا إليه -يفضي بطبيعة الحال- إلى المعنى الاصطلاحي - الذي نجد خير من عبر عنه-: ابن خلدون في مقدمته، التي خصصها لدراسة الاجتماع، والعمران. حيث يدور معنى "الحضارة" عنده على: "نمط الحياة، المناقض للبداوة، المنشئ للمدن، والأمصار، المستقر فيها. المتصف بفنون منتظمة، من الملك، والإدارة، ومن مكاسب العيش، ومن الصنائع، والعلوم، ومن وسائل الدعة، والرفاه[٧]"

كلمة "التمدن": وكما استعمل ابن خلدون كلمة "الحضارة" فقد استعمل أيضا كلمة "التمدن" بنفس المعنى، حينما قال: "ولهذا نجد التمدن: غاية للبدوي، يجري إليها، وينتهي بسعيه إلى مقترحه منها"[٨]. ويبدو أن الكلمة: مولدة -كما جاء في القاموس المحيط-: "مدن فلان مدونا: أتى المدينة". و"تمدن: عاش عيشة أهل المدن، وأخذ بأسباب الحضارة". ثم قال: "والمدنية: الحضارة، واتساع العمران".

فالحاصل هنا ماذا عرف إبراهيم زيد الكيلاني الحضارة بأنها النظام الاجتماعي الذي يجمع بين مجموعة من العناصر المعنوية والمادية؛ فالمعنوية تكون كالأفكار والأعراف، والعادات والقيم والمشاعر والأذواق والمفاهيم، أما العناصر المادية فهي المتمثلة في الحرف والمكاسب والصناعات العديدة، ومجموعة الوسائل والأساليب.

---

٧ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون علي سبيل المثال ج-١, ص-١٢٩

٨ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون علي سبيل المثال ج-١, ص-١٣١

الحضارة في المفهوم الإسلامي:

يستعمل بعض المفكرين مصطلح الحضارة بالمعنى القيمي فقط، ولا يستعمله بالمعنى الوصفي، وهو يرى أن المعنى القيمي: لا يمكن أن يوجد إلا في الحضارة الاسلامية، التي تتميز عن كل الحضارات، في مفهومها، ومصدرها، ومقوماتها، وخط سيرها. ومن ثم فالحضارة الإسلامية في مفهومها تعني: الحضارة التي تقوم على القيم الإسلامية، وليست هي كل تقدم صناعي، أو اقتصادي، أو علمي، مع تخلف القيم عنها. أما هذه القيم الاسلامية فهي:

العبودية لله وحده، والتجمع على آصرة العقيدة، واستعلاء إنسانية الإنسان على المادة، وسيادة القيم الإنسانية التي تنمي إنسانية الإنسان، لا حيوانيته، وحرمة الأسرة، والخلافة في الأرض على عهد الله وشرطه، وتحكيم منهج الله وشريعته وحدها، في شؤون هذه الخلافة[٩].

مكونات الحضارة:

عرفنا فيما سبق أن للحضارة مفهومين: وصفي وقيمي. والحديث عن مكونات الحضارة، لا بد أن يأخذ -هذين المفهومين- بالاعتبار:

مقومات الحضارة الإسلامية:

يرى بعض المفكرين المعاصرين: أن الإسلام هو الحضارة، وهو يريد بذلك أن الحضارة الحقة الجديرة بهذه التسمية: هي التي تقوم على القيم الإسلامية، وأن الحضارات الأخرى: غير جديرة بهذه التسمية، وذلك للبون الشاسع، بين قيم الإسلام الموحى بها، من خالق الوجود، وبين القيم التي تحكم تلك الحضارات، والتي لا تعدو في أحسن التقديرات: أن تكون قيماً بشرية قاصرة، أو قيماً دينية سماوية محرفة. وفي كل الأحوال: إنما ينطبق هذا الكلام على "الحضارة" بمعناها القيمي، وليس بمعناها التاريخي، كما أشرنا إلى ذلك من قبل.

القيم التي تحكم الحضارة الإسلامية:

يمكن أن نجمل القيم التي تحكم الحضارة الإسلامية، بالنقاط التالية:

١- تحرير الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، ذلك أن المسافة هائلة بين حياة بشرية، تقوم على أساس العبودية لله وحده، وحياة أخرى تقوم على أساس العبودية للعباد.

٢- المسافة هائلة في التصور الاعتقادي: الذي يفسر حقيقة العلاقات، بين الإنسان وخالق هذا الكون. وبين الإنسان، وكل ما في هذا الكون.

---

٩ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون علي سبيل المثال ج-١، ص-١٣٨

٣- المسافة هائلة في المشاعر، والأخلاق، التي تنبثق من تصور-الألوهية: فيه الله وحده- وتصورات شتى، تؤلّه شتى القيم، وشتى الأشخاص، وشتى الأصنام المختلفة.

٤- المسافة هائلة -في أوضاع الحياة الإنسانية- التي تنبثق من تصور: الألوهية فيه الله وحده، وتصورات شتى، تقيم آلهة من البشر، لهم الحاكمية، بإرادتهم، وأهوائهم. في شتى الصور[١٠]

أصول الحضارة الإسلامية:

من المعلوم أن أصول الحضارة الإسلامية ترجع إلى الوحي الإلهي، المتمثل في القرآن الكريم، وإلى السنة النبوية المبينة له، والمفصلة لما أجمل منه. كما يمكن أن ترجع مصادر الشريعة الاجتهادية -من قياس، وإجماع، واستحسان، واستصلاح، وعرف، وسد للذرائع- باعتبار مشروعيتها: إلى الوحي الإلهي، وإلى مقاصده العامة، الممثلة لروح التشريع.

ومن ثم فسوف نتحدث عن أصول الحضارة الإسلامية في القرآن الكريم، وربما نستشهد بالحديث النبوي، عند الحاجة إلى ذلك. أما الاجتهاد في ميدان الحضارة، فإنما يكون: بالاقتباس، من الحضارات الأخرى. وهو ما سنتحدث عنه ضمن خصائص الحضارة الإسلامية.

القرآن الكريم:

هو آخر الكتب الإلهية نزولا، وقد ضمنه الله تعالى كل أنواع الهداية، التي يحتاجها الإنسان في حياته على هذه الأرض، كما ضمنه الثوابت التي نزلت بها الكتب السابقة، والتي لا تتغير بتغير الزمان. كما أشار القرآن إلى ذلك: بقوله تعالى ـ في سورة الشورى[١١]: "**شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۭ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۭ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ**".

وكما قال في سورة المائدة[١٢] : "**وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَهُمْ عَمَّا جَاۗءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۭ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۭ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ**".

---

١٠ سيد قطب، في ظلال القران. (ط- ٢ ج-٢ ,ص-٢٣٢)

١١ القران الكريم ، سورة الشوري،١٣

١٢ القران الكريم ، سورة الماءدة،٤٨

وقال أيضا[১৩]: "اَمۡ لَمۡ يُنَبَّاۡ بِمَا فِىۡ صُحُفِ مُوۡسٰى ۙ وَاِبۡرٰهِيۡمَ الَّذِىۡ وَفّٰٓى ۙ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰى ۙ وَاَنۡ لَّيۡسَ لِلۡاِنۡسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۙ وَاَنَّ سَعۡيَهٗ سَوۡفَ يُرٰى ۙ ثُمَّ يُجۡزٰىهُ الۡجَزَآءَ الۡاَوۡفٰى".

وقال في سورة الأعلى[১৪] "بَلۡ تُؤۡثِرُوۡنَ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا". أما الشرائع الإلهية فأصولها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، ولكن فروعها هي التي تتغير مراعاة لمصالح العباد، بحسب الزمان والمكان.

حاجة الإنسان إلى هداية القرآن:

خلق الله الإنسان متميزا عن غيره من المخلوقات، وذلك بما أودعه من الطاقات، والقدرات، وبما منحه من الملكات، والخصائص. فكان بحق مخلوقا متفردا، عن الملائكة. مختلفا عن الحيوانات والجمادات. فقد وهبه الله عقلا مفكرا، وإرادة حرة، واختيارا بين سبيل الخير، وسبيل الشر. كما أعطاه وسائل تحصيل العلم، والمعرفة -من سمع، وبصر، وغيرها من الحواس- والتي تعتبر النوافذ التي يطل منها العقل على الوجود، وعن طريقها: يدرك، ويحكم[১৫]. وقد أشار القرآن إلى هذه الحقائق بقوله تعالى[১৬]: "وَ اللّٰهُ اَخۡرَجَكُمۡ مِّنۡۢ بُطُوۡنِ اُمَّهٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ شَيۡـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمۡعَ وَالۡاَبۡصَارَ وَالۡاَفۡـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ".

فاذا حاجة البشرية الي هداية القران حاجة حقيقية و هداية التي هي أقوم: إن هداية القرآن تمتاز -عن كل أنواع الهدايات الأخرى- بأنها: الأقوم، والأفضل. كما وصفها الله تعالى بقوله[১৭]: "اِنَّ هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ يَهۡدِىۡ لِلَّتِىۡ هِىَ اَقۡوَمُ وَيُبَشِّرُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ الَّذِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ اَجۡرًا كَبِيۡرًا".

وقال أيضا[১৮]: "وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ اِنَّ السَّمۡعَ وَالۡبَصَرَ وَالۡفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔوۡلًا".

ويلاحظ أن مجال الحواس: محصور في عالم الشهادة. ذلك أن هذه الحواس: ليس باستطاعتها الوصول إلى عالم الغيب -الذي ينفرد الخالق بعلمه- ومن ثم فحدود العقل البشري: لا تمكنه من أن يحكم في عالم الغيب.

وحتى في حدود عالم الشهادة: لا يستطيع العقل، والحواس: أن يصلا دائما، إلى الرؤية الصحيحة، والأحكام الصائبة، دون استعانة بهداية خارجية. ذلك أن حاسة البصر-مثلا-: لا

---

১৩ القران الكريم ، سورة النجم، ٣٦-٤١

১৪ القران الكريم ، سورة الأعلى،١٦

১৫ ابن الفارس ، المعجم المقائس ، المرجع السابق, ص-٢٦٣

১৬ القران الكريم ، سورة النحل،٧٨

১৭ القران الكريم ، سورة الاسراء،٩

১৮ القران الكريم ، سورة الاسراء،٣٦

يمكنها الرؤية في الظلام الدامس، والليل البهيم، إلا إذا استعانت بمصباح، ينير لها الظلمة، ويكشف لها الطريق.

ومن ثم فقد جعل الله كتبه الإلهية: هي النور -الذي يضيء للعقل-: سبيل الهداية، ويرفع عن الأعين غاشية الأبصار، فتبدو الحقيقة: جلية واضحة، كالشمس في رابعة النهار.

وهكذا وصف الله القرآن بأنه[١٩]: "هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ".

كما وصفه بأنه نور في قوله تعالى[٢٠]: "فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ".

وقوله[٢١] "يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۗءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا".

وقوله[٢٢] "الٓرٰ ۣ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ"

فإذا حاجة البشرية إلى هداية القرآن: حاجة حقيقية ملحة. وقد تفضل الله على خلقه، بهذه النعمة العظيمة، وبين أثرها عليهم بقوله تعالى[٢٣]: "يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۗءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاۗءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ".

نشأة الحضارة الإسلامية:

إن الإنسان -بمجرد انتمائه الجاد إلى الإسلام- يكون قد وضع نفسه وقدراته، في سياق واحد، وتوجه واحد، ومجرى واحد مع خلائق الله كافة، وسننه المذخورة، في الطبيعة، ونواميسه العاملة، في الكون، وإنه سيتجاوز مواقع الارتطام، التي تفتت الطاقة، وتضعف فاعليتها، إلى الانسجام والتناغم، مع السنن، والنواميس. وبذلك يتحول الإنسان المؤمن: إلى طاقة فذة، في ميدان الفعل، والإنجاز، وإلى قدرة مذهلة، في مجال العطاء، والإبداع. ويومها ينطلق المسلم –فردًا وجماعة- بقوة اختزال مدهشة -لمواصفات الزمان والمكان والتراب- وصولاً إلى الأهداف المرتجاة.[٢٤]

---

١٩ القران الكريم ، سورة البقرة،١٨٥

٢٠ القران الكريم ، سورة التغابن،٨

٢١ القران الكريم ، سورة النساء،١٧٤

٢٢ القران الكريم ، سورة إبراهيم،١

٢٣ القران الكريم ، سورة يونس،٥٧

٢٤ محمد سعيد رمضان البوطي، منهج الحضارة الانسانية في القران (دار الفكر: دمشق ،١٩٨٢)ص ١٢٠

نقلة عقلية:

وهكذا كان. فقد حرر الإسلام العقل وكرمه، وسار بالتوجه الإنساني، من التعدد إلى الوحدة، ومن عبادة العباد، إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان، إلى عدل الإسلام. حيث وجد العقل نفسه -وقد أعيد تشكيله- قادراً على الفعل، بتأثير العقيدة الإسلامية، المتضمنة لقيم: الربانية، والشمول، والتوازن، والثبات، والتوحيد، والحركية، والإيجابية، والواقعية، والتي شكلت بتكاملها: نسقًا عقيديًا متفردًا كان له أكبر الأثر في انطلاقة المسلم، نحو صناعة التاريخ، وبناء الحضارة.[٢٥]

نقلة معرفية:

وكما الإسلام شكّل العقل الفعال، فقد نقل المسلم نقلة معرفية بعيدة المدى، وذلك من أول آية نزلت في كتاب الله: "اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم". فانطلقت المسيرة العلمية بتوجيهات القرآن تمحو آثار الأمية والجهل، وتعطي ثمارها يانعة في كل مجال من مجالات العلم والمعرفة.

نقلة منهجية:

أما النقلة الثالثة فقد كانت نقلة منهجية، تمثلت في توجيهات القرآن نحو التأمل والنظر في الكون من جانب، والانتفاع بما فيه من خيرات، واعتماد قانون الأسباب والمسببات، مما جعل البحث العلمي يسير في اتجاه علمي، بعد أن كان فلسفيًا نظريًا عند الإغريق، وهو بذلك أرسى منهج البحث التجريبي الذي أخذه الغرب بعد ذلك عن المسلمين. وبنوا عليه اكتشافاتهم العلمية الحديثة. كذلك كان للقرآن الأثر البالغ في لفت النظر إلى سنن التاريخ التي تحكم الحركة البشرية، وتستخلص قوانين الاجتماع، وخط سير الأمم في ارتقائها وانحطاطها، مما جعل ابن خلدون بعد ذلك أول من التفت إلى أهمية العمران والحضارة، وكتب كتابه الشهير "مقدمة ابن خلدون"، والذي اعتبر بحق أول كتاب حول هذا الموضوع.[٢٦]

خصائص الحضارة الإسلامية:

تتميز الحضارة الإسلامية بنشأتها وتكوينها وبطابَعها وشكلها وبنظامها، وبالإجراءات التنفيذية لهذا النظام، وتكون كل ملامحها مستقلة، ومن ثم فلا ينبغي أن تعالج بمفهومات اجتماعية أجنبية

---

٢٥ محمد سعيد رمضان البوطي, المرجع السابق ،١٢٢

٢٦ محمد سعيد رمضان البوطي, المرجع السابق ،١٢٢

عنها، ولا تدرس وفق منهج غريب عن طبيعتها، ولا تنفذ بإجراءات مستندة من نظام آخر، وفيما يلي بيان لأهم خصائص الحضارة الإسلامية:

١- وحدانية في بنيتها:

ذلك أن أهمية الحضارة تقوم على عقيدة التوحيد الخالص، من شوائب الشرك، والوثنية، ومن لوثات الكهانة، والعرافة، ومن تحريفات الرسالات التوحيدية السابقة، حينما تعلن كلمة التوحيد الخالدة: "لا اله إلا الله". والتي أشارت إليها النصوص القرآنية الكثيرة كما قال الله تعالى:[٢٧] "**قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ**".

ومن ثم فلا تكون العبادة إلا لله مثلا يقول الله تعالى[٢٨]: "**اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ**".

ولا حاكمية في التشريع إلا لله حيث قال خل وعلى[٢٩]: "**اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ**".

ومنهج القرآن فى ذالك هو منهج الفطرة فى النظرة فى النظرة والتأمل كما قال الله تعالى[٣٠]

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

ويأمر الإسلام بالتعرف على نعم الله ، ويحث على استعمالها في مرضاته كما ذكر فى التنزيل[٣١]

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وقال أيضا[٣٢] **اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۚ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۚ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۚ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۚ**

ويستقصى القرآن الكريم الموانع التي تعطل العقل وتحول دون التفكير والتأمل فيندد بالتقليد ، ويحذر من الحدس والظن ، وبهذا كان الإسلام من أقوى عوامل الرقى الحضاري في ميادين العلوم المختلفة

ومنهج البحث في الإسلام يعتمد على التحقيق والتثبت ، ثم على الفهم واستنباط النتائج ، وعلم مصطلح الحديث يعبر عن منهجية البحث العلمي لدى المسلمين أصدق تعبير فالنص لا يؤخذ مأخذ

٢٧ القران الكريم ،سورة الإخلاص:١-٤

٢٨ القران الكريم ،سورة الفاتحة،٥

٢٩ القران الكريم ،سورة الأنعام،٥٨

٣٠ القران الكريم ،سورة البقرة ، ١٦٤

٣١ القران الكريم ،سورة الأعراف ،١٨٥

٣٢ القران الكريم ،سورة الغشية ،١٧-٢٠

الاعتبار حتى يبحث عن رواته ، وتعرف درجة كل واحد في العدالة والضبط، ويتضح اتصال السند ، ويخلو من الشذوذ والعلة القادحة فإن سلم هذا كان النظر في النص لفهم معناه ، واستنباط ما يستفاد منه بوجه من الدلالة ، بالنص أو الفحوى

وتوصل المسلمون إلى وضع القاعدة الأساسية في المنهج العلمي ، أو ما يسمونه بالمنهج التجريبي ، الذي يقضي بأن يتوخى الباحث دراسة ظاهرة طبيعية كما هي موجودة بالفعل في عالم الواقع ، عن طريق ملاحظتها وإجراء التجارب عليها ، ثم التوصل من ذلك إلى وضع قانون عام [٣٣]

لقد ظهر هذا المنهج التجريبي الذي يعتمـاء على الملاحظة والتجربة والاستقراء لأول مرة في تاريخ الحضارة البشرية على يد المسلمين في العهود الإسلامية الزاهرة بالعلوم التجريبية : الكيمياء والفيزياء والطب ، وبعد جابر بن حيان المتوفى سنة (٢٠٠ هـ- ٨١٥م) من أوائل الذين أدخلوا هذا المنهج في المجاثهم[٣٤]

لقد كان جابر أعظم كيميائى ، عمل صيدلائياً في الكوفة ، وضع عدداً . المصنفات في الكيمياء منها : كتاب السبعين ، وكتاب الخواص ، وكتاب السموم ، وكتب كثيرة أخرى مشهورة

وأبو بكـر محمد بن زكريا الرازي المتوفى سنة (٣٢١ هـ- ٩٢٤م) أول مـن استحضر حامض الكبريتيك ، كما أنه رفض السحر ، وقال ببطلان إمكانية تحويل المعادن إلى الذهب[٣٥]

وتمكن العلماء المسلمون أنذاك من استحضار عدد من المركبات الكيميائية منها : ماء الذهب ، وحامض النتريك ، وملح النشادر ، ونترات الفضـة ، والصـودا ، وكربونات البوتاسيوم وحامض الكبريتيك

٢. ربانية في مصدرها:

ونعني بذلك أنها كانت نتيجة للوحي الإلهي، المتمثل بالقران الكريم، والسنة النبوية المبينة له، ذلك أن القران الكريم هو الذي أرسى دعائم هذه الحضارة، بنظرتها الكلية إلى الوجود: "الإله، والكون، والحياة، والإنسان".

٣- إنسانيّة في نزعتها، عالميّة في رسالتها:

ذلك أن الحضارة الإسلامية جاءت لخير البشرية، ولم تقتصر في عطائها على المسالمين، بل إن غير المسلمين الذين يعيشون في كنفها، يتمتعون وينعمون، بما يتمتع به المسلمون وينعمون، فلهم ما

---

٣٣ محمد عماره الصحوة الإسلامية والتحدي الحضارة (بيروت: دار الشروق-١٩٩١) ص-١٢٠

٣٤ مناع خليل القطان، الحديث والثقافة الاسلامية ، (مكة : المملكة العربية السعودية- ١٩٧٩م) ط.٢ , ص.٢٣٤

٣٥ محمد قطب , منهج التربية الإسلامية (مكة : المملكة العربية السعودية- ١٩٦٧) ص.١٧

للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين. كما أن غير المسلمين الذين لا يعيشون في الدولة الإسلامية مستهدفون بخيرية الدعوة الإسلامية طبقا لقوله تعالى[٣٦]: " **وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ** ".

٤- عربية في خطابها:

لقد كانت الحضارة الإسلامية عربية في خطابها، حيث جاء القرآن الكريم، بلسانٍ عربي مبين. وكذلك السنة النبوية المبينة للقرآن كانت عربية أيضا، وذلك مصداقا لقوله تعالى[٣٧]: **وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ** ".

وهكذا فقد اختار الله العربية لتكون لغة كتابه ولغة نبيه كما قال الله تعالى كما قال الله تعالىء[٣٨]: **اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ**"

٥- عقلية في احتجاجها:

يعتبر العقل أساس التكليف في الشريعة الإسلامية كما يعتبر وسيلة الإدراك لفهم القرآن واستنباط أحكامه وتوجيهاته، ومن ثم فقد حفلت آيات القران بالإشادة به، والإشارة إليه في كثير من الآيات، حيث يعبر عنه مرة بالفؤاد، ومرة بالقلب، وأخرى بالنهى، ورابعة باللّب. وكلها مراتب في سلم الإدراك، وقوله[٣٩]: "**اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى**".

وقوله تعالى[٤٠]: "**اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِى الصُّدُوْرِ**".

وقوله تعالى[٤١]: "**هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ**".

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، المبثوثة في ثنايا الكتاب العزيز، والتي تدعو إلى الفهم والفقه، والتفكر، والتذكر، والعلم. وفي ميدان المحاجة والجدال يعمد القرآن إلى الأدلة العقلية، ولكن على طريقة القرآن لا على طريقة منطق اليونان، ذلك أن القرآن يخاطب جميع المستويات في جميع الأوقات. بينما منطق اليونان يخاطب خاصة من الناس، دون جمهرتهم.

---

٣٦ القران الكريم ، سورة ال عمران، ١٠٤

٣٧ القران الكريم ،سورة إبراهيم ،٤

٣٨ القران الكريم ،سورة الأنعام ،١٢٤

٣٩ القران الكريم، سورة طه، ٥٤

٤٠ القران الكريم ،سورة الحج، ٤٦

٤١ القران الكريم ،سورة الفجر،٥

٦- علمية في نهجها:

لقد عُرف العرب قبل الإسلام بأنهم أمة أمية، وكما عبر عن ذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "إنا أمة لا تكتب ولا تحسب". كما أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة التاريخية، بقوله[٤٢]: "هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ ".

ثم غدت هذه الأمة بفعل الإسلام ومنهجه وتوجيهاته أمة علمية من الطراز الأول، وتم ذلك كله خلال فترة زمنية قياسية، واستطاعت هذه الأمة أن تخرج أجيالًا من العلماء يندر وجود مثلهم في أمة من الأمم – كمًّا ونوعًا- كما استطاعت أن تستوعب علوم السابقين الأولين، وأن تتقدم بالعلم والمعرفة، خطوات الى الأمام، وأن تضع ميسمها على كل علم وفن، وأن تشيع المنهج العلمي في كل مكان وصلت إليه، وأن توظف ذلك كله لخير الإنسانية، والبشرية، فكانت بحق خير أمة أخرجت للناس.[٤٣]

٧- أخلاقية في مبادئها:

فقد جعلت الحضارة الإسلامية للمبادئ الأخلاقية المحل الأول في كل نظمها، ومختلف ميادين نشاطها، وهي لم تتخل عن هذه المبادئ قط، ولم تجعلها وسيلة لمنفعة دولة، أو جماعة، أو أفراد في الحكم، وفي العلم وفي التشريع، وفي الحرب، وفي السلم، وفي الاقتصاد، وفي الأسرة.[٤٤]

روعيت المبادئ الأخلاقية تشريعا وتطبيقا، وبلغت في ذلك شأنًا ساميا بعيدا، لم تبلغه حضارة في القديم والحديث. ولقد تركت الحضارة الإسلامية في ذلك آثارًا تستحق الإعجاب، وتجعلها وحدها من بين الحضارات، التي كفلت سعادة الإنسانية سعادة خالصة، لا يشوبها شقاء.

٨- متسامحة مع غيرها:

وآخر ما نذكر من خصائص حضارتنا هذا التسامح الديني العجيب الذي لم تعرفه حضارة مثلها، قامت على الدين. إن الذي لا يؤمن بدين ولا بإله، لا يبدو عجيبًا إذا نظر إلى الأديان كلها على حدٍ سواء، وإذا عامل أتباعها بالقسطاس المستقيم، ولكن صاحب الدين الذي يؤمن بأن دينه حق، وأن عقيدته أقوم العقائد، وأصحها، ثم يتاح له أن يحمل السيف، ويفتح المدن، ويستولي على الحكم، ويجلس على منصة القضاء، ثم لا يحمله إيمانه بدينه، واعتزازه بعقيدته، علي أن يجور في الحكم، أو أن ينحرف عن سنن العدالة، أو يحمل الناس على اتباع دينه، إن رجلا مثل هذا لعجيب أن يكون في

---

٤٢ القران الكريم ،سورة الجمعة ،٢

٤٣ خالد بن عثمان السبت، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر(لندن: المنتدي الإسلامي- ١٩٨٥) صفحة:٦٠

٤٤ د. احمد حسن فرحات،الاسلام والحضارة

التاريخ، فكيف إذا وجد في التاريخ حضارة قامت على الدين، وشادت قواعدها علي مبادئه، ثم هي من أشد ما عرف التاريخ تسامحا، وعدالة، ورحمة، وإنسانية

حين نحن ننظر الى العالم نجد ألواناً من الحضارات في القديم والحديث ولم يشهد حضارة مثلى لبناء مجتمع أفضل كحضارة الإسلام . فالحضارة في مفهومها الأخص : هي مجموعة العلوم والمعارف والأنظمة التي تساعد الإنسان على الرقى والتقدم ، وهذا يشمل جوانب المعارف المختلفة التي تسهم في بناء الحياة الإنسانية ، كالثقافة الدينية والعلوم الكونية والنظم السياسية والاقتصادية ، والاجتماعية.

والحضارة بهذا المعنى ولدت بميلاد الإنسان الأول ، حيث أحس بحاجته إلى المطعم والمشرب والمأوى ، واستشعر ضرورة ما يستر به عورته ، وضرورة تفاهمه مع غيره وأخذت هذه الحاجات تنمو في حسه وتستيقظ في شعوره حتى تطورت أساليبها ووسائلها من طور إلى طور[٤٥].

وقد أودع الله في الإنسان غريزة حب الاستطلاع ، وهذه الغريزة تبعث في نفسه روح المعرفة وتحمله على البحث تطلعاً إلى إدراك المجهول ، وكلما أدرك شيئاً بحث فيا وراءه ، وهكذا تزداد خبراته وتجاربه ، ثم يستخدم هذه التجارب وتلك الخبرات فيها يحقق له مزيداً من الراحة والمتعمة والرفاء

وهذه الحضارة تتوارثها الأجيال يرثها اللاحق عن السابق ، وما من أمة من الأمم في عصر من العصور إلا ولها تأثيرها على هذا المد الحضاري المتوارث ، تارة بالنماء والازدهار ، وتارة بالجمود والتوقف ، وأخرى بالانحراف وسوء التوجيه[٤٦]

وإذا نظرنا في الحضارات القديمة والحديثة أدركنا قصورها وانحرافها وسوء توجيهها.

فالحضارة الصينية والهندية ترتكز دعائمها على تعاليم كونفوشيوس ، ثم التعاليم البوذية ، وليس في أي نحلة منها وميض الهدى الساوي الذي تستقيم به الفطرة الإنسانية ، ولذا كانت مقرونة بمظاهر الوثنية في صور شتى ولا سيما بعد أن جاءت

البرهمية فتردت الاخلاق وانحرف سكول الناس وستت نظام الطبقات الجائر شملهم[٤٧]

وكانت الحضارة الفارسية تدين بمذهب "زرادشت" وهو مذهب ثانوى، يعتقد بوجود الهين إله الخير واله الخير واله الشر وبنهما صراع دائم ويرموا الى اله الخير بالنور واله الشر بالظلمة ثم جاء

٤٥ مناع خليل القطان، الحديث والثقافة الاسلامية ،المرجع السابق ،ص:٢٣٥

٤٦ الدكتور مصطفى السباعي،ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

٤٧ مناع خليل القطان، الحديث والثقافة الاسلامية ،المرجع السابق ،ص ٢٣٦

"مانى "قدعا الى حياة غزوية لحسم مادة الفساد والفساد والشر فوم النكاح استعلاجا للفناء وانتصاراً للنور على الظلمة[৪৮]

وكانت الحضارة اليونانية ثم الرومانية غنية بفلسفتها وعلـومها العقلية وآدابها ولكنها حضارة مادية عجزت فلسفتها عن معرفة الله معرفة لائقة بجلاله ووحدانيته واستغلت الامبراطورية الرومانية الأمم لمصلحة الوطن الرومي وحده ، وأسرفت في الترف والبذخ والاستبداد

وتعتبر الحضارة الغربية الحديثة الوريث الوحيد للحضارة اليونانية والحضـارة الرومانية بما فيها من خصائص مع عوامل الرقى الزمنى ، ولم تكن النصرانية كافية في إصلاح الحال ، فابتدعت الرهبانية التي تدعو إلى تعذيب النفس بالحرمان الشديد ، واتسع نفوذ الكنيسة ، واستبدوا بالأمر كله

أن يحمل السيف، ويفتح المدن، ويستولي على الحكم، ويجلس على منصة القضاء، ثم لا يحمله إيمانه بدينه، واعتزازه بعقيدته، علي أن يجور في الحكم، أو أن ينحرف عن سنن العدالة، أو يحمل الناس على اتباع دينه، إن رجلا مثل هذا لعجيب أن يكون في التاريخ، فكيف إذا وجد في التاريخ حضارة قامت على الدين، وشادت قواعدها علي مبادئه، ثم هي من أشد ما عرف التاريخ تسامحا، وعدالة، ورحمة، وإنسانية[৪৯]

أثر الحضارة الإسلامية في أوروبا:

إن أوروبا مدينة للمسلمين بتحررها من طغيان الكنيسة، ومدينة لهم بتحرير عقولهم من الخرافة والدجل، ولولا جهود المسلمين لظلت أوروبا ترزخ في الظلام حتى يومنا هذا كما يعترف بذلك كثير من المؤرخين للحضارة الإنسانية.

فالمسلمون في الأندلس قدموا منجزاتهم العلمية للمسيحيين، ولم يصدهم شنآن قومٍ ومحاربتهم للمسلمين من أن يبذلوا لهم العلم. بل فتحوا صدورهم ومعاهدهم لكل طالب علم أيًا كانت الجهة التي قدم منها، ووضعوا كشوفهم ومعطياتهم أمام الجميع. وكان للتسامح الذي تحلى به خلفاء المسلمين في الأندلس أثره في إقبال العلماء النصارى من أبعد الأقطار على تلقي العلوم من المدن الإسلامية آنذاك[৫০].

---

৪৮ مناع خليل القطان

৪৯ ابوالحسن على الندوي، رجال الفكر والدعوة في الإسلام (كويت: دار القلم،١٩٦٩) ص- ١٦٢

৫০ ابو الحسن على الندوي، رجال الفكر والدعوة في الإسلام , المرجع السابق

وظهر أثر الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي في ميادين عدّة، نشير إلى بعض منها فيما يلي:

١- في ميدان العقيدة والدين:

فقد كان لمبادئ الحضارة الإسلامية أثر كبير في حركات الإصلاح الدينية، التي قامت في أوروبا منذ القرن السابع، حتى عصر النهضة الحديثة إذ قام في القرن السابع من ينكر عبادة الصور، ثم قام من ينكر الوساطة بين الله وعباده، ويدعو إلى الاستقلال في فهم الكتب المقدسة. بل إن لوثر في حركته الإصلاحية كان متأثرًا بما قرأه للفلاسفة العرب، والعلماء المسلمين من آراء في الدين والعقيدة والوحي، ولا شكّ بأن ذلك كله كان نتيجة لعقيدة التوحيد التي عرفها الغرب عن طريق الصلة بينهم وبين المسلمين.[٥١]

٢- في ميدان الفلسفة والعلوم:

لقد أفاقت أوروبا على صوت علمائنا وفلاسفتنا، يُدرّسون علوم الطب والرياضيات والكيمياء والجغرافيا والفلك في مساجد إشبيليّة وقرطبة وغرناطة وغيرها، وكان رواد الغربيّين الأُوَل إلى مدارسنا شديدي الأعجابِ، والشّغفِ بكل ما يستمعون إليه من هذه العلوم. ومن ثم ابتدأت عند الغربيّين حركة الترجمة من العربيّة إلى اللّاتينيّة، وغدت كتب علمائنا تدرّس في الجامعات الغربيّة.

٣- في ميدان اللغة والأدب:

لقد تأثر الغربيون وبخاصة شعراء الإسبان بالأدب العربي تأثرًا كبيرًا، فقد دخل أدب الفروسية والحماسة والمجاز والخيال الراقي البديع إلى الآداب الغربية عن طريق الأدب العربي في الأندلس على الخصوص. يقول الكاتب الإسباني الفارو: "إن أرباب الفطنة والتذوق سحرهم رنين الأدب العربي، فاحتقروا اللّاتينيّة، وجعلوا يكتبون بلغة قاهريهم دون غيرها". وساء ذلك معاصرًا كان على نصيب من النخوة الوطنية أوفى من نصيب معاصريه[٥٢]

٤- في ميدان التشريع:

كان لاتصال الطلاب الغربيّين بالمدارس الإسلاميّة في الأندلس وغيرها أثر كبير في نقل مجموعة من الأحكام الفقهيّة والتشريعية إلى لغاتهم، وكان قدوم نابليون إلى مصر فرصة لترجمة أشهر كتب الفقه المالكي إلى اللغة الفرنسية، ومن أوائل هذه الكتب الذي كان نواة القانون المدني الفرنسي،

---

٥١ مناع خليل القطان، الحديث والثقافة الاسلامية ،المرجع السابق ،ص٢٣٦

٥٢ مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا (شركة كتاب، 1999) ص 86

وعهدت الحكومة الفرنسية إلى الدكتور "بيرون" ترجمته هو كتاب "المختصر في الفقه" للخليل بن إسحاق بن يعقوب، المتوفى سنة ٧٧٦ه-١٤٢٢م.[٥٣]

٥- في مفهوم الدولة والفكر السياسي:

كان لما أعلنته الحضارة الإسلامية من مبادئ تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم أثر بالغ في الشعوب المجاورة للمجتمع الإسلامي، حيث جاء الغربيون إلى بلاد الشّام في الحروب الصليبيّة، ورأوا من قبل في ممالك الخلافة الإسلاميّة الأندلسيّة أن الشعوب تراقب حكامها وتناصحها، ولا تخضع لإشراف أحد غير شعبها، فأثّر كل ذلك في سلوك الشعوب الأوروبيّة تجاه حكّامها. وكانت الثورة الفرنسيّة بعد ذلك، فلم تعلن من المبادئ أكثر ممّا أعلنته حضارتنا قبل اثني عشر قرنًا.

٦- في مفهوم الدولة والفكر السياسي:

كان لما أعلنته الحضارة الإسلامية من مبادئ تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم أثر بالغ في الشعوب المجاورة للمجتمع الإسلامي، حيث جاء الغربيون إلى بلاد الشّام في الحروب الصليبيّة، ورأوا من قبل في ممالك الخلافة الإسلاميّة الأندلسيّة أن الشعوب تراقب حكامها وتناصحها، ولا تخضع لإشراف أحد غير شعبها، فأثّر كل ذلك في سلوك الشعوب الأوروبيّة تجاه حكّامها. وكانت الثورة الفرنسيّة بعد ذلك، فلم تعلن من المبادئ أكثر ممّا أعلنته حضارتنا قبل اثني عشر قرنًا.

بين الحضارة الإسلاميّة والحضارة الغربيّة:

يرى العلامة سعيد النورسي أن الحضارة الغربية قامت على أربع أسسٍ سلبيّة:

١- نقطة استنادها هي القوّة، والقوة شأنها الاعتداء.

٢- هدفها وقصدها هو المنفعة، والمنفعة شأنها التّزاحم.

٣- دستورها في الحياة إنما هو الجدال والصّراع، وهذا شأنه التنازع.

٤- الرابطة التي تربط المجموعات البشرية –في الحضارة الغربيّة- إنما هي العنصرية والقومية والسلبية، التي تنمو على حساب الآخرين. وهذه شأنها التصادم –كما نراه- وتطمين رغباتها وتسهيل مطالبها، وهذا الهوى شأنه إسقاط الإنسان من درجة الملائكية إلى دَرَك الحيوانية. وبهذا تكون سببًا لمسخ الإنسان معنويًّا[٥٤].

ولأجل هذا فقد دفعت هذه المدينة الحاضرة ثمانين بالمئة من البشريّة إلى أحضان الشقاء، وأخرجت عشرة بالمئة منها إلى سعادة مموهة زائفة، وظلت العشرة الباقية بين هؤلاء وأولئك. علمًا أن

---

٥٣ بن خدة حمزة، أثر الفقه المالكي في القانون المدني الفرنسي (تلمسان, الجزائر 2017) ص- 178

٥٤ مناع خليل القطان، الحديث والثقافة الاسلامية ،المرجع السابق ،ص ٢٣٧

السعادة تكون سعادة عندما تصبح عامة كاملة للكل أو للأكثريّة، بيد أن سعادة هذه المدينة لأقل القليل من الناس.

ثم إنه بتحكم الهوى الطليق من عقاله، تحولت الحاجات غير الضروريّة، إلى ما يشبه الضروريّة، فبينما كان الإنسان محتاجًا إلى أربعة أشياء في حالة البداوة، إذ به –في هذه المدينة- يحتاج إلى مئة حاجة، وهكذا أردته المدينة فقيرًا مدقعًا.

ثم لأن السعي والعمل لا يكفيان لمواجهة المصاريف المتزايدة، انساق الإنسان إلى مزاولة الخداع والحيلة وأكل الحرام، وهكذا فسد أساس الأخلاق. وبينما تعطي هذه المدينة –للجماعة والنوع- ثروة وغنى وبهرجة، إذا بها تجعل الفرد فقيرًا محتاجًا، فاسدَ الأخلاق.

أمّا الحضارة الإسلامية فهي تقوم على خمسِ أسسٍ إيجابيّة، وهي:[٥٥]

١- نقطة استنادها هي الحقّ بدلًا من القوة. والحق من شأنه العدالة والتوازن.

٢- هدفها الفضيلة بدل المنفعة. والفضيلة من شأنها المحبة والتجاذب.

٣- وجهة الوحدة فيها والرابطة التي تربط بها المجموعات البشريّة، هي الرابطة الدينيّة والوطنيّة والمهنيّة بدلًا من العنصرية. وهذه شأنها: الأخوة الخالصة والسلام والوئام والذّود عن البلاد عند اعتداء الأجانب.

٤- دستورها في الحياة التعاون بدل الصراع والجدال، والتعاون من شأنه التساند والاتحاد.

٥- تضع الهدى بدل الهوى، ليكون حاكمًا على الخدمات التي تقدم للبشر. وشأن الهدى رفع الإنسانيّة إلى مراقي الكمالات، فهي إذ تحُدُّ الهوى وتحُدُّ من النّزعات النفسانيّة تطمئن الرّوح وتسوقها إلى المعالي.

حضارة الإسلام والمستقبل:

من خلال ما تقدم: ظهرت مميزات الحضارة الإسلاميّة عن غيرها من الحضارات، ويرجع ذلك إلى القيم العظيمة التي قامت عليها الحضارة الإسلامية، ذلك أن هذه القيم مستوحاة من الوحي الإلهيّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن ثمّ فهي قيم خالدة يمكن لها أن تعيد بناء الحضارة –في أي زمان ومكان- إذا ما توافرت لها الشروط المناسبة.[٥٦]

غير أن هذه القيم لا تعمل تلقائيًا، وإنما تعمل من خلال جهدٍ بشريّ يقوم به المؤمنون بهذه القيم ويعملون على تمثّلها في أنفسهم وسلوكهم. وبمقدار نجاحهم في هذا الجانب يكونون قد قطعوا

---

٥٥ مناع خليل القطان، الحديث والثقافة الاسلامية ،المرجع السابق

٥٦ المرجع السابق

خطوات في الطريق الطويل الذي لا بد فيه من التضحية والعناء والكد والعمل المتواصل –على كل الجبهات وفي جميع ميادين الحياة- وبذلك تكون الأمة قد وضعت نفسها على الجادة في سبيل إقلاعٍ حضاريّ جديد.

إنّ الأمة بحاجة ماسّة إلى مجموعة من الشروط، لا بد من توفرها كي تساعدها في نهضتها الحضاريّة المرتقبة:

١- لا بدّ لهذه الأمّة: من أن تفرز طليعة – من علمائها وأهل الرأي والحكمة فيها- تأخذ على عاتقها ترشيد صحوتها وتحديد مسارها –بقوة وصدق وعزم وحزم- وقد طلب الله إلى الأمة المسلمة أن تعمل على ذلك دائمًا، وفي كل الظروف. كما قال الله تعالى[٥٧]: "**وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ**". آل عمران ١٠٤.

٢- لا بدّ لهذه الأمّة: من أن تطرح جانبًا ما رانَ على قيمها ومفهوماتها الإسلاميّة من تصوراتٍ خاطئة وتقاليد بالية كانت سببًا في ركودها وانحطاطها. وبذلك تعيد لهذه القيم: فاعليتها، وتأثيرها، ووهجها، وإشعاعها.

٣- لا بدّ لهذه الأمّة: من أن تعتمد -في نهضتها- على كتابها الخالد، فهو الذي ينير لها الطريق، ويهديها للتي هي أقوم، ولا بدّ لها من أن تأخذه بقوّة، وأن تستلهمهُ في كلّ حاجاتها، وألّا تركن إلى غيره من الطروحات والأفكارِ التي تبغي الانحراف والاعوجاج، عملًا بقوله تعالى[٥٨]: "**وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ**".

٤- لا بدّ لهذه الأمّة: من أن تعرف واقعها، وما يحيط به، معرفةً تفصيليّة، فتتعرّف على نشأتهِ وتطوّره، وعلى العوامل المكونة له، وعلى مواطن الضعفِ والقوة فيه، لأنها لا تستطيع أن تتجاهله –وهي تعيش فيه وتتأثر به سلبًا وإيجابًا-. فمعرفة هذا الواقع: تساعدها كثيرًا في تجنب الأخطاء الكثيرة التي يقع فيها من يتعامل مع هذا الواقع، بغير فهمٍ له، ووعي وإدراكٍ لما يجري خلاله.

٥- لا بدّ لهذه الأمّة: من أن تعرف أن العمل المجدي لاستئنافِ الحضارة الإسلاميّة ينبغي أن يتوافقَ مع السننِ الإلهيّة، التي جعلها الله سببًا للنّجاح في هذه الحياة. وأنّ العمل خارجَ دائرة السّنن لا يمكن أن يُكتب له النّجاح: حيث قال تعالى[٥٩] "**سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا**".

---

٥٧ القران الكريم ، سورة ال عمران،١٠٤

٥٨ القران الكريم ، سورة الأنعام،١٥٣

٥٩ القران الكريم ، سورة الفتح، ٢٣

٦- لا بدّ لهذه الأمّة: من أن تسير نحو غايتها بخطىً ثابتة، وببرامج محدّدة، واثقة من نصر الله الذي تكفّل بنصر عبادهِ وجندهِ، مستبشرةً بما وعدها الله من التمكين في الأرض. حيث قال[٦٠]: "وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا" وقال ايضا[٦١] "وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ"

كذلك بتشريح الجسم ، وهو أساس علم التشريح ولعلماء الإسلام سبق كذلك في الرياضيات من أمثال محمد بن جابر البتاني المتوفى سنة (٣١٧ هـ ٩٢٩ م) ، وموسى بن شاكر المتوفى سنة (٢١٨ هـ ٨٣٣ م) وأولاده الذين اشتهروا بأولاد شاكر ، وأبو الريحان محمد بن أحمد البرونى المتوفى سنة (٤٤٠ هـ ١٠٤٨ م) .

وفى الوقت الذي كانت فيه أوربه تغط في سبات الجهل ، وترسف في أغلال الظلم ، وكانت تنصب المشانق لقتل العلماء الذين يخرجون على سلطان الكنيسة ، في هذا الوقت الذي يسمى بالقرون الوسطى كانت الحضارة الإسلامية في أوج عظمتها ، تزهو بعلومها ، ويشع منها نور المعرفة في كل مصر . وما كان للغرب أن ينهض من كبوته ، ويستيقظ من لولا احتكاكه بالحضارة الإسلامية عن طريق القسطنطينية وصقلية والحروب الصليبية شرقاً، وعن طريق بلاد الأندلس غرباً[٦٢]

وأى ابتكار علمي في فرع من فروع العلم كان السبق فيه للمسلمين الذين نبغوا في الرياضيات والكيمياء ، والفيزياء والطب ، والاجتماع ، وشئون الحكم ، وقد ترجمت مؤلفات كثيرة لعلمائنا ، واتخذها الغرب أساساً للدراسات في جامعاته قرونا عديدة إلى بداية القرن التاسع عشر الميلادي ، ثم بنى عليها وجدد[٦٣]

ويقف المسلمون اليوم على بوادر وعى جديد في أنحاء العالم الإسلامي لتفجير طاقاتنا الهائلة التي نملكها ، والاستفادة من ثرواتنا الطائلة ، لبناء الحياة الإسلامية على مبادىء الإسلام وهدى شريعته.

وبلادنا الفتية التي خصها الله بمكانتها الدينية ، وحباها بخيراته الكثيرة ، هي البلد الأم التي يتطلع إليها الإسلامي

لتكون قبلته في بناء الحضارة الإسلامية الجديدة ، كا أنها قبلته في الصلاة.

---

٦٠ القران الكريم ، سورة النور،٥٥

٦١ القران الكريم ، سورة يوسف، ٢١

٦٢ مناع خليل القطان، الحديث والثقافة الاسلامية ،المرجع السابق ، ص٢٣٩

٦٣ مناع خليل القطان، الحديث والثقافة الاسلامية ،المرجع السابق

خلاصة الكلام:

والأمل ـ بعد الله ـ معقود في شبابنا المسلم ، أن يقدر المسئولية ، وأن ينهج نهج الأسلاف فيعمل ويجدد ويبتكر، ويتابع البناء ، والله من وراء القصد إن الإنسان اجتماعي بفطرته، فهو يسعى الى تكون حياة اجتماعية، يسود فيها التعاون وتتحقق فيها المصالح المتبادلة لجميع أفراد المجتمع، وبمقدار ما تكون الأسس التي تبنى عليها تلك الحياة صالحة عادلة فاضلة، يكون تحقيق السعادة للأفراد الذين يتعايشون في هذا المجتمع اقوى وافضل .والاسلام كان ومازال، وسيبقى المعين الثر الصافي للمعاني والقيم العليا التي تشاد عليها الحضارة الانسانية، وذلك لانه يقصد الى تحقيق سعادة الانسان في الدنيا والآخرة، على اساس من الحق والعدل، والمساواة، والسلم العزيز .فالاسلام نظام كامل محكم في مختلف جوانبه الروحية والخلقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية .اما الضعف والتخلف والتأخر الذي كانت عليه حالة المسلمين في عهود الظلام والانحطاط، فهو في تلك العقول التي سرحت في متاهات الخيال بتأخير الوهم والحذر، فأخذت تفسر مفاهيم الاسلام تفسيرا منحرفا بعيدا عن روح هذا الدين، ومقاصده العامة، وتكاسلت عن البحث العلمي الصحيح فغدت تفسيراتهم المنحرفة مادة طيعة لاستغلال المستعمرين في سبيل اغراضهم السياسية والاقتصادية في البلاد المستعمرة، بما اوهم بعض الناس ان الدين هو الذي كان السبب في التخلف .اننا في هذا البحث العلمي الموضوعي المجرد سنكشف الستار عن حقائق الدين الاسلامي، ومصادره، ومبادئه الانسانية، ونظرته الى الحياة، تلك الامور التي انتجت حضارة انسانية عريقة، ومازال العالم يقطف ثمارها الانسانية والعلمية حتى يومنا هذا والى ان يرث الله الارض ومن عليها.

৬২ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা • জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ • মোহাররম-জমাঃ সানি ১৪৪৫ • শ্রাবণ-পৌষ ১৪৩০

সূচিপত্র

- আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের সু-সংবাদ : একটি পর্যালোচনা/৭
  মাসরূরুল হাসান
- সাহাবাদের সম্পর্কে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আকীদা/৩২
  ড. মুহাম্মদ মানজুরুর রহমান
- ইসলামি ঐক্যদর্শন ও মুসলিম উম্মাহ : পর্যালোচনা/৬৩
  ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল
- ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচার ও আর্থিক সহায়তাদান/৮২
  ড. আ. ম. কাজী হারুন উর রশীদ
- প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শারীরিক সুস্থতা ও চিকিৎসার অধিকার : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি/১০৫
  ড. মোঃ নজরুল ইসলাম
  ফারজানা আক্তার ডালিয়া
- ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা/১২৪
  ড. মুহাম্মদ রেজাউল করীম
  মাহমুদুল হাসান
- আধুনিক বাংলা কাব্যে রাসূল (সা) প্রশস্তি : একটি পর্যালোচনা/১৬৬
  ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান
- মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা/১৮২
  ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা
  জহিরুল ইসলাম
- ঐতিহ্যবাহী বড় মসজিদ-চুয়াডাঙ্গা: ইতিহাস ঐতিহ্য ও ভূমিকা/২০০
  মোঃ আরিফুল ইসলাম
- The Perspective of Islam concerning Violence and Terrorism/২২০
  Mohammad Zafar Ullah
  Mohammad Moniruzzaman
- دور اللغة العربية في فهم الشريعة الإسلامية/২৩৬
  د. عبد الله المعروف محمد شاه عالم
- الإسلام سبيل الحضارة المثلى والمجتمع الأفضل/২৫০
  الدكتور محمد خير الإسلام
  تنوير حسين

গবেষণা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]